শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি

ডক্টর দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়
এম এ., পি-এইচ. ডি.
অধ্যাপক, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও বিদ্যাসাগর কলেজ (সিউড়ি)

শিক্ষক সমবায় প্রতিষ্ঠান
প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা
৬।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৩৬১

৬/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯, শিক্ষক সমবায় প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রীহৃষীকেশ বারিক কর্তৃক প্রকাশিত এবং ২০৯-এ, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬, দি অশোক প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ থেকে শ্রীরতিকান্ত ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

স্বামী মাধবানন্দ

চরণারবিন্দ অনুধ্যানে

ভূমিকা

ভূমিকার স্থান যদিও গ্রন্থের আদিতে তথাপি এটির রচনা গ্রন্থসৃষ্টির অন্তে। সেই কারণে ভূমিকায় গ্রন্থরচনার প্রেরণার সূচনা ও তার রূপায়ণের ইতিহাস সন্নিবেশিত হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য এই ইতিহাসও পরিপূর্ণ নয়। কারণ যিনি জীবনের সমস্ত 'অকৃতকার্য্য অকথিত বাণী অগীত গান বিফল বাসনা-রাশিকে' কৃতকর্ম্মের সঙ্গে গ্রন্থিবদ্ধ করে একটি পূর্ণবৃত্তের সৃষ্টি করেন একমাত্র সেই মহাদেবীই কর্ম্মপ্রেরণার উৎস ও তার অভিব্যক্তির সামগ্রিকতার সন্ধান দিতে পারেন।

সাধক কালীপ্রসাদের উত্তরপুরুষহিসাবে শৈশবাবধি শক্তিসাধনার রহস্য জানার আমার কৌতূহল ছিল। শ্রীমদ্ভাগবতে সুপণ্ডিত জ্ঞানযোগী পিতা শ্রীঅমিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মশায়ের কাছে সযত্নে সংরক্ষিত সাধকপ্রবরের প্রকাণ্ড পুঁথি—তাঁর সাধনভূমি, যেখানে আমার মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া আমাকে সম্পন্ন করতে হয়—তাঁর কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে মুখে মুখে শোনা অনেক কাহিনী—সব কিছুই আমার শিশুকল্পনাকে নির্জ্জন চিন্তার মুক্ত আকাশে অবাধ সঞ্চরণে প্রেরণা দিত। সাধকপ্রবরের পুত্রপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে অমাবস্যার বিজন প্রহরে যখন ৺চারুচন্দ্র রায়চৌধুরী, ৺থাকরাম চট্টোপাধ্যায় ও শিবরাম মুখোপাধ্যায় গম্ভীর কণ্ঠে মহাদেবীর ধ্যানমন্ত্র পাঠ করতেন তখন মন্দিরসংলগ্ন তরুশ্রেণীর আকম্পিত ঘনপল্লববিতানে আমি যেন সেই সুরলহরীকেই মর্ম্মরিত প্রত্যক্ষ করতাম। চক্ষু মুদ্রিত করে অনুভব করতাম বুকের মধ্যেও সেই একই স্পন্দন—

'মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্ত-মুণ্ডালী-গলদ্রুধির-চর্চ্চিতাম্ ॥'

কৈশোরে পিতার এক শ্রদ্ধেয় বন্ধু ৺প্রফুল্লকুমার মুখোপাধ্যায় মশায় তাঁর অগাধ তন্ত্রজ্ঞান ও শক্তিসাধনানুরাগ নিয়ে আমার কাছে এক আকাঙ্ক্ষিত লোকের সন্ধান দিয়েছিলেন। তন্ত্র ও শৈবাগমের প্রতি তাঁর আকর্ষণ এত প্রবল ছিল যে তিনি নিজব্যয়ে পরিণত বয়সেও দৈহিক দুর্গতি সহ্য করে কাশীধামে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ মশায়ের কাছে

বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করতে যেতেন। 'বড় হয়ে তন্ত্র পড়বে' তাঁর এই আশীর্ব্বাণী আজও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি।

শৈশবকল্পনা ও কৈশোরপ্রেরণার বৃন্তে কখন যে শাস্ত্রচিন্তার শতদল বিকশিত হ'ল তা আর মনে নাই। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ-গ্রহণকালে ডঃ সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় মশায়ের সান্নিধ্যসৌভাগ্য যখন লাভ করি তখন সেই জ্ঞানতপস্বীর মহনীয় জীবনচর্য্যা আমাকে শাস্ত্রানুশীলনে উদ্বুদ্ধ করে।

পরবর্ত্তী কালে আমার পুঁথিপত্র ও রচনা দেখে আমার ছোটো ভাই ডঃ রমারঞ্জন মুখোপাধ্যায় (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতের অধ্যক্ষ) আমাকে বলেন, 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত', অর্থাৎ কিনা রচনা সম্পূর্ণ করে আমি সেটিকে যেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণানিবন্ধ হিসাবে দাখিল করি। সৌভ্রাত্রের সঙ্গে যুক্ত হ'ল পিতা শ্রীযুক্ত অমিতারঞ্জন মুখোপাধ্যায় মশায়ের কঠোর স্নেহশাসন। তারই ফলশ্রুতি আমার আলস্যনির্মোকের অপসৃতি ও এই গ্রন্থের উৎপত্তি।

গ্রন্থে আমি শক্তিসাধনার ক্রম সম্বন্ধে কোন কথাই আলোচনা করি নাই। কারণ এ বিষয়ে আমি অনধিকারী। তন্ত্র ও শৈবাগমের গ্রন্থরাজির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে যা পাওয়া যায় তারই একদিক আমি উপস্থাপিত করেছি।

তন্ত্র ও শৈবাগমবর্ণিত শক্তিদর্শনকে অন্যান্য দর্শনের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করে বাংলাসাহিত্যে তার কাব্যময় প্রকাশকে আমি এই গ্রন্থে অভিব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছি। গৌণভাবে শাক্তকাব্যের মূল্যায়নও করা হয়েছে। আমার পূর্ব্বসূরিগণ তাঁদের আলোচনায় শক্তিদর্শনের উপর প্রাধান্য দিয়ে শাক্তসাহিত্যে তার প্রতিফলন দেখাতে ইচ্ছা করেছেন বলে মনে হয় না।

গ্রন্থে চারটি পরিচ্ছেদ—'মাশব্দ মমতাযুত', 'খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে', 'কে জানে কালী কেমন' এবং 'সে যে ভোলা ত্রিপুরারি'। প্রথম পরিচ্ছেদে মাতৃ-সাধনার স্বরূপ, তন্ত্রের প্রতিপাদ্য ত্রিতত্ত্ব ও বিশিষ্ট জীবনদর্শন সাহিত্যে তার প্রতিফলনসহ বিবৃত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের মূল্যায়নও আছে। এই দিক দিয়ে প্রথম পরিচ্ছেদটিকে বাকী তিনটি পরিচ্ছেদের উপোদ্ঘাত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে ক্রমশঃ তন্ত্র ও শৈবাগমে প্রতিপাদিত আত্মতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই তিনটি প্রসিদ্ধ তত্ত্বের

বিচারণা সুরু হয়েছে। দ্বিতীয়ে আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটির অন্যান্য দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে তুলনামূলকভাবে আলোচনা করেছি। সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যধারায় ক্রমবিকাশের উপর তার ছায়াপাতেরও সন্ধান আছে। তৃতীয়ে শক্তিতত্ত্বের সামগ্রিক আলোচনায় তন্ত্র ও শৈবাগমের বিশিষ্ট যুক্তি-তর্কগুলির উপস্থাপনা ও তুলনামূলক মূল্যায়ন দেখা যাবে। শক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও তার সাহিত্যচিত্রের অবতারণাও করা হয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে শিবতত্ত্বের স্বরূপবিচারেও অনুরূপ পন্থা অনুসরণের প্রয়াস পেয়েছি। পরিচ্ছেদ তিনটিতে প্রতিটি তত্ত্বের ধারণার ক্রমবিকাশের ধারাটিও যথাশক্তি বিবৃত করেছি।

সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের বাংলা-বিভাগ পরিচালনার দায়িত্ব আপনাদের মধ্যে বণ্টন করে নিয়ে আমাকে কর্ম্মবন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আমি যে তন্ত্রধ্যানের অখণ্ড অবসর পেয়েছি তার জন্য আমার তিনজন ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও সাম্প্রতিক কালের সুযোগ্য সহকর্ম্মী শ্রীগোপাল সরকার, শ্রীঅমল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীঅজিত সরকারকে তাঁদের স্নেহঋণের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি জানাই। স্বর্গত অধ্যাপক মণীন্দ্রকিশোর চক্রবর্ত্তী মশায় তাঁর পরলোকগমনের পূর্ব্বে আমার গ্রন্থমুদ্রণের ব্যবস্থা করে দিয়ে আমার মনে একটি ব্যথাতুর স্মৃতির স্থান করে নিয়েছেন। আমার কিশোরী কন্যা মালবিকা ও শিশুপুত্র পার্থসারথি তাদের 'অনিমিত্তহাসৈঃ' যে আমার গ্রন্থ রচনার ক্লান্তি দূরীভূত করেছে তার জন্যও আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। বিবিধভাবে উৎসাহিত করার জন্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের সহকর্ম্মীবৃন্দকে, বিশেষ করে শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক শ্রীননীগোপাল সেন ও অধ্যাপক শ্রীমনীন্দ্রনাথ ঘোষ মশায়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

তন্ত্রসম্বন্ধে অনেক অমূল্য উপদেশ দেওয়ার জন্য সিউড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সঙ্ঘগুরু স্বামী সত্যানন্দের শ্রীচরণে প্রণতি জানাই। ইতি

ফলহারিণী অমাবস্যা
কালীবাড়ী
সিউড়ি, বীরভূম

দেবরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বিষয়-সূচী

শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি

প্রথম পরিচ্ছেদ

মাশব্দ মমতাযুত

'আপনারে আপনি দেখ যেয়ো না মন কারু ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥'

এই বাণীই ভারতের সনাতন বাণী। উপনিষদের ঋষি সন্ধান করেছিলেন সেই মহান্ত পুরুষকে যাঁকে জানতে পারলে মানুষ সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্বাতীত হয়ে অমৃতত্ব পায়। এই পুরুষ পরিদৃশ্যমান জগতের মধ্যে বিরাজিত থাকলেও গুহাহিত গহ্বরেষ্ট, অন্তর্লোকে অধিষ্ঠিত। এই আত্মজ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের নামান্তর মাত্র।

ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য

ভারত চিরকালই আত্মজ্ঞানকে মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছে। 'আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ' এই বাণীর সুরেই ভারতীয় মনোবীণার সব কটি তারই বাঁধা আছে। আত্মাকে জেনেই ভারতীয় ঋষি জেনেছেন ব্রহ্মকে যিনি কূটস্থ অচল সচ্চিদানন্দস্বরূপ। ব্রহ্মলাভে জীবাত্মা পরমাত্মার ভেদ পরিলুপ্ত হয়ে যায়। অধ্যাত্ম দৃষ্টির এরূপ সমুন্নতি যে-কোন দেশের দর্শনের ইতিহাসের বিরাট বিস্ময়।

অধ্যাত্ম উন্নতি সহজলভ্য হয়, সাধনাগম্য। অবশ্য সাধনাতেই যে আত্ম-জ্ঞান সাধক লাভ করবেন এমন কথা জোর করে বলা যায় না। কারণ, আত্মা যাকে বরণ করে আত্মাকে সেই পায়, 'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্'। এই সাধনামার্গ সুদুর্গম, 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'। ব্রহ্ম বাচাতীত মনের অগম্য। এই অবাঙ্‌মনসোঽগোচর তত্ত্ব কিভাবে সাধক ধারণা করবেন! জ্ঞানী নেতি নেতি করে বিচার আরম্ভ করেন, কূট বিচারণাশেষে দেহেন্দ্রিয় ব্যতিরিক্ত আত্মার স্বরূপ জেনে কৃতনিশ্চয় হন, 'চিদানন্দরূপো শিবোঽহং শিবোঽহং'। তাঁর সাধনা নির্জ্জন আত্মচিন্তার গুহাতেই সম্পন্ন হয়। তিনি গন্ধবিধুর ধূপের মতো আপনাতে আপনিই দগ্ধ হন। তাঁর ইষ্ট যেমন গুণাতীত তিনিও তেমনি গুণাতীত। তিনি কর্ম্ম-সন্ন্যাসী জ্ঞানযোগী। ভজন কীর্ত্তন বা গন্ধ-পুষ্প-দীপে সুপ্রকাশ যে উপাসনা তা তাঁর নয়।

আধ্যাত্মিক উন্নতি ও উপাসনা

যিনি উপাসক, ব্রহ্ম তাঁর কাছে সগুণ, সাকার, বাক্য মনঃ বুদ্ধির গোচরীভূত। গুণক্রিয়ানুসারে তিনি ব্রহ্মের রূপ কল্পনা করে থাকেন ব্রহ্ম তাঁর কাছে সোপাধিক। সত্ত্বরজস্তমোগুণান্বিত সাধক যেমন নানাবিধ উপকরণ-সমন্বিত উপাসনাকর্ম্মে মানসিক তৃপ্তি খুঁজে পান, ব্রহ্ম গুণান্বিত হয়ে তেমনি বিচিত্র জগৎ-প্রপঞ্চে প্রকাশমান ও সাধকের আস্বাদ্য হয়ে থাকেন। সাধকের কাছে নিত্যের চেয়ে লীলার কদর বেশী।

অবশ্য সব পথের লক্ষ্য সেই অখণ্ড চিৎসমুদ্র যেখানে সমস্ত ভেদাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চ নিমেষে নিমেষে প্রকাশ ও বিলীন হচ্ছে। তবে জ্ঞানমার্গে ক্লেশ অধিকতর। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার মত প্রণিধানযোগ্য।[১] ভক্তিমার্গ অপেক্ষাকৃত সহজ।[২]

ভক্তি দুই' প্রকার—রাগানুগা ও বৈধী। মনের সহজ প্রবণতাকে অবলম্বন করে যে ভক্তি জাগে, তাকে রাগানুগা এবং শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দৃঢ়শ্রদ্ধারূপী যে ভক্তি মনে উদিত হয়, তাকে বৈধী ভক্তি বলা হয়ে থাকে। রাগমার্গের ভক্তি যুক্তিনিষ্ঠ মনের কর্ম্মানুষ্ঠানের সাক্ষাৎ ফল নয়, বৃন্তহীন পুষ্পসম সে আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠে। নারদের ও হনুমানের রামের প্রতি ভক্তি, শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গলের কৃষ্ণের সহিত সখ্য, যশোদার বালগোপালের প্রতি স্নেহ ও শ্রীমতী রাধিকা বা চন্দ্রাবলীর কৃষ্ণ বিষয়ক রতি রাগানুগা ভক্তির নির্যাস মাত্র। চৈতন্যদেবের সম্বন্ধে বৈষ্ণব কবির এই উক্তি 'রা কহি ধা পুনঃ কহই না পারয়ে ধারা বহি বহে লোর' রাগভক্তির মূর্ত্তবিগ্রহকেই পাঠকের মনশ্চক্ষে উপস্থাপিত করে। চৈতন্য-চরিতামৃত-রচয়িতা কবিরাজ কৃষ্ণদাস সেই ভক্তিপথের পথিক মহাসাধকের মানসিক অবস্থাকে সুস্পষ্ট করেছেন।[৩] শক্তিসাধক রামপ্রসাদের ভক্তি ও

১। ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাং অব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥—গীতা ১২।৫

২। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥—গীতা ৯।৩১

৩। মহাভাগবত দেখে স্থাবর জঙ্গম। সর্ব্বত্র হয় তাঁর শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ॥
স্থাবরজঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তাঁর ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥—চৈতন্যচরিতামৃত

নিত্যসিদ্ধ, বৈধী ভক্তিলাভের স্তরপরম্পরার মতো কোন কার্যাক্রম-অনুসরণ-সাপেক্ষ নয়। বৈধী ভক্তি রাগানুগা ভক্তির ন্যায় শ্রবণ কীর্ত্তন স্মরণ বন্দন ইত্যাদি মনের সহজাত প্রবৃত্তিকে আশ্রয় করে আবির্ভূত হয় না। বৈধী ভক্তি লাভ করতে গেলে প্রথমে কাম্যকর্ম্ম ত্যাগ করতে হয়, পরে সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমতাপ্রাপ্ত হয়ে কর্ম্মফল ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানরূপ কর্ম্মযোগের সাহায্যে চিত্ত শুদ্ধ করতে হয়। পরের স্তরে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগাশ্রয়ে সাধকের ভক্তিলাভ হয়। শাক্ত কবি প্রকৃত রাগানুগামার্গের সাধকের মতো, নিষ্কাম কর্ম্মযোগকে প্রাধান্য দেন নি, ভক্তহৃদয়ের সহজাত আকুতিকেই বড় করে দেখেছেন। তাই তাঁর কাছে অন্তর-বাহির শক্তিময়।

'আমি যেভাবে সেভাবে থাকি, নামটি কভু নাহি ভুলি।
নয়ন মুদিলে হেরি অন্তরেতে মুণ্ডমালী॥'

আবার,

'শ্রীরামপ্রসাদ রটে, মা বিরাজে সর্ব্ব ঘটে।
ওরে অন্ধ আঁখি দেখনা মাকে, তিমিরে তিমিরহরা॥'

এই রাগাত্মিকা ভক্তির বীজ থেকে সন্তানভাবের মূল আবির্ভূত হয়ে ক্রমে ক্রমে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাববিকারের পল্লবপুষ্পে পরিণতি লাভ করে। সাধকের মনে যখন রাগভক্তির উদয় হয়, তখন তাঁর পক্ষে জগতের সৃষ্টিস্থিতিবিনাশের মূলীভূত শক্তির সঙ্গে নিজের মা ও ছেলের স্নেহমধুর সম্পর্ক-স্থাপনা অনায়াসেই সম্ভব হয়।

সন্তানভাব

সাধারণ মানুষ হয়তো সাধকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে আদ্যাশক্তিকে মাতৃসম্বোধনে অভিহিত করে। কিন্তু প্রাকৃত জগতে অসহায় শিশু যেমন অনন্যমনা হয়ে গর্ভধারিণী মাকে অবলম্বন করে, মানুষ আদ্যাশক্তিকে তেমন ব্যাকুলভাবে আশ্রয় করতে পারে না, তার শরণাগতি যতটা মৌখিক ততটা আন্তরিক হয় না। অবশ্য সন্তানভাবের স্থূল অনুশীলনও ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয় না, তা থেকেই বৈধী ভক্তির আবির্ভাব হয়ে থাকে। তাই প্রাকৃত জীব, যাদের কোটি কোটি পূর্ব্বজন্মের সুকৃতিলভ্য রাগভক্তির উদয় হয় নাই, সন্তান-ভাবের সক্রিয় অনুশীলন করে বৈধী ভক্তিলাভ করবে ও মহামায়ার স্বরূপ

সাক্ষাৎকারে কৃতকৃত্য হবে। সেই হেতু সন্তানভাব শাক্ত কবির মতে সাধ্য, শুধু সাধ্য-কেন, সর্ব্বসাধ্যসার।

বৈষ্ণব সাধনার মহাবারিধি তথা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ চৈতন্য মহাপ্রভু রামানন্দ রায়ের সঙ্গে সাধ্যনির্ণয় প্রসঙ্গে বাৎসল্য প্রেম সম্বন্ধে উক্তি করেছেন 'এহোত্তম'। শ্রীমদ্‌ভাগবতে কৃষ্ণ যে গোপরাজ নন্দ ও তৎপত্নী যশোদার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে তাঁদিগে মহাসৌভাগ্যে ভূষিত করেছেন, সে কথার উল্লেখ আছে। অশেষ সুকৃতিবলে কনখল ভূপতি দক্ষ ও তদীয় পত্নী প্রসূতি অথবা গিরিরাজ হিমালয় ও গিরিরাণী মেনকা বা সাধকপ্রবর রামপ্রসাদ যে আদ্যাশক্তিকে কন্যারূপে লাভ করেছেন তাতেও সন্দেহ নাই। সাধককবি কমলাকান্তের মন্তব্য এই বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য।

'অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়াছলে, ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে।
কমলাকান্তের বাণী, ধন্য ধন্য গিরিরাণি, তব পুণ্য কে কহিতে পারে॥'

—ক. বি. শা. প.: আগমনী—প্রথম স্তবক

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এই সন্তানভাব কেবল সাধকনিষ্ঠ নয়, এটি আদ্যাশক্তিতেও স্ফুরিত। কারণ, মা ও সন্তানের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রয়োগক্ষেত্র অনন্ত। একই ব্যক্তি একাধারে মাতা ও কন্যা, এইরূপ পরিস্থিতি বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফল। সেই হেতু আদ্যাশক্তি সাধারণতঃ সাধকের কাছে মা—কিন্তু দক্ষ-প্রসূতি বা হিমালয়-মেনকা বা ক্ষেত্রবিশেষে সাধকের কাছেও কন্যা। যাঁকে লক্ষ্য করে রামপ্রসাদ আক্ষেপ করেন 'মা আমায় ঘুরাবি কত। কলুর চোখ-বাঁধা বলদের মতো', তাঁকেই আবার কন্যারূপে বেড়া বাঁধতে দেখে রামপ্রসাদ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলে উঠেন 'যেই ভাবে একমনে সেই পায় মা তোমায় তারা, বের হয়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া'। এই আদ্যাশক্তি আবার গিরিকন্যা-মূর্তিতে জননী মেনকাকে সম্বোধন করে গিরিশচন্দ্রের লেখনীতে স্ফুরিত ভাষায় অভিমানের সুরে বলেন,

'তুমি তো মা ছিলে ভুলে,
আমি পাগল নিয়ে সারা হই।
হাসে কাঁদে সদাই ভোলা, জানে না মা আমা বই॥'

—ক. বি. শা. প.: আগমনী—দ্বিতীয় স্তবক

আদ্যাশক্তির এই কন্যারূপ পরিগ্রহ সংস্কৃত পুরাণাদিতে বিবৃত হয়েছে। দক্ষপ্রজাপতির ঔরসে ও তৎপত্নী প্রসূতির গর্ভে সতীরূপে মহাশক্তির জন্ম সর্ব্বজনবিদিত পৌরাণিক কাহিনী। দক্ষযজ্ঞে অনিমন্ত্রিত হয়ে সতীর দক্ষালয় গমন, তথায় পতিনিন্দা শ্রবণে দেহ-ত্যাগ এবং বিষ্ণুচক্রচ্ছিন্ন সতীদেহের ভূপতিত হয়ে মহাপীঠ সৃষ্টি করার উপাখ্যান বাঙ্গালীর স্মৃতিকোঠায় স্থান পেয়েছে। শাক্ত কবিও এই কাহিনীকে তাঁর কাব্য বা পদাবলীর ভিতরে রূপ দিয়েছেন। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের শিবায়ন খণ্ডে শিব-সতীর বৃত্তান্ত বিবৃত হয়েছে।[১] শাক্ত কবিও তাঁর পদাবলীতে এই প্রাচীন কাহিনীর ইঙ্গিত দিয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে রাম বসুর পদ প্রণিধানযোগ্য।

বাল্যলীলা

'শুনি পুরাণ চণ্ডীতে, পূর্ব্বজন্মেতে উমা ছিল
দক্ষের মেয়ে, প্রসূতির মেয়ে,
শিব নিন্দা শুনে, সেই অভিমানে,
প্রাণ ত্যজিলেন দক্ষালয়ে।'

—ক. বি. শা. প.ঃ আগমনী—প্রথম স্তবক

কিন্তু আদ্যাশক্তির সতীরূপ পরিগ্রহ বৃত্তান্তের চেয়ে তাঁর উমারূপ পরিগ্রহ বৃত্তান্তই শাক্ত কবির কল্পনা-শক্তিকে অধিকতর উত্তেজিত করেছে। হয়তো জগন্মাতার উমালীলার কোন গূঢ় মাধুর্য্য আছে। তা না হ'লে মহাকবি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যে হরপার্ব্বতী লীলার এত প্রাধান্য দিতেন না। মহামায়ার সতীলীলাকে কবি কালিদাসও ইঙ্গিত মাত্রে উল্লিখিত করেছেন।[২] চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের শিবায়ন খণ্ডে হরপার্ব্বতী বৃত্তান্তই প্রধান আকর্ষণীয় বিষয়। শাক্ত কবিও লীলাবর্ণনায় উমা-মহেশ্বরের কাহিনীকেই উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

১। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য বা রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য দ্রষ্টব্য।

২। অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা দক্ষস্য কন্যা ভবপূর্ব্বপত্নী।
সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে॥

—কুমারসম্ভবঃ প্রথম সর্গ—২১ শ্লোক

পার্ব্বতী পরমেশ্বরের লীলার প্রথমাংশে পার্ব্বতী অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা। তত্ত্বের দিক থেকে 'অর্থহীন পশুপতি তাঁর সর্ব্বস্ব পার্ব্বতী' এ-কথা সত্য হ'লেও লীলাবর্ণনায় কুমারী অবস্থায় লৌকিক নিয়মমতো পার্ব্বতীর পশুপতি থেকে বিচ্ছেদ শাক্ত কবি কল্পনা করে নিয়েছেন। কারণ এখানে ভক্তসাধক লীলাশুক, লীলাস্বাদনের জন্যই পরতত্ত্বে তাঁর মানবিকতার ধর্ম্ম আরোপ। জগন্মাতার এই কুমারী লীলাই তাঁর বাল্যলীলা।

শিশু বয়সে উমার চাঁদ ধরার বায়না ও স্নেহাতুর গিরিরাজের দর্পণে প্রতিবিম্বিত উমা মুখ দেখিয়ে সেই বায়নার উপশমের বৃত্তান্ত সাধককবি রামপ্রসাদের লেখনীতে চমৎকার ফুটেছে।

'অতি অবশেষ নিশি, গগনে উদয় শশী, বলে উমা, ধরে দে উহারে।

* * * *

আমি কহিলাম তায়, চাঁদ কি রে ধরা যায়, ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে।

—মেনকার উক্তি

গিরিরাজ সানন্দে কহিছে হাসি, ধর মা, এই লও শশী, মুকুর লইয়া দিল করে।
মুকুরে হেরিয়া মুখ, উপজিল মহাসুখ, বিনিন্দিত কোটি শশধরে॥'

—ক. বি. শা প.: বাল্যলীলা

শিশু উমার পাদসঞ্চারের বর্ণনা শাক্ত কবির মানবিকতাস্ফুরণ-শক্তির অভ্রান্ত নিদর্শন।

'চঞ্চল চরণে চলে অচলনন্দিনী
তরুণ অরুণ যেন চরণ দুখানি।'—কালিদাস চট্টোপাধ্যায়

এই জাতীয় বর্ণনায় বৈষ্ণব পদাবলীর বাল্যলীলার পদের প্রতিচ্ছায়া লক্ষ্য করা যায়। যথা-

'চিত্র বিচিত্র নাট চরণে চাঁদের হাট
চলে যেন খঞ্জনিয়া পাখী।' —যাদবেন্দ্র দাসের পদ

সমবয়সী সখীদের সঙ্গে ক্রীড়া কিশোরীর লীলার অন্তর্গত। এই ক্রীড়া বর্ণনার পথপ্রদর্শক মহাকবি কালিদাস নিজে। ক্রীড়ারতা উমার বর্ণনায় কবি তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যের প্রথম সর্গে বলেছেন:

'মন্দাকিনীসৈকতবেদিকাভিঃ সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিমপুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুর্মধ্যগতা সখীনাং ক্রীড়ারসং নির্ব্বিশতীব বাল্যে॥'—২৯ শ্লোক

তিনি (উমা) সখীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কখনো গঙ্গাতীরে বালির বেদী নির্ম্মাণ করে কখনো ঘুঁটি বা পুতুল নিয়ে খেলা করে বাল্যে লৌকিক কুমারীর মতো ক্রীড়ার আনন্দ আস্বাদন করতেন।

শাক্ত কবিও উমার সখীসঙ্গ ও লীলারঙ্গ বর্ণনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন :

'উমার সঙ্গে জয়া করবি যদি খেলা।
খেল্‌বি গো জয়া জাগিলে মঙ্গলা॥'

—রাধিকাপ্রসন্ন : ক. বি. শা. প.—বাল্যলীলা

কিন্তু এই কাব্যগঙ্গার মূল উৎস যে সেই অধ্যাত্ম অনুভূতির উত্তুঙ্গ হিমাদ্রি তা শাক্ত কবি কোথাও বিস্মৃত হন নাই। তাই বাল্যলীলার বর্ণনায় উমাজননী মেনকার মুখ দিয়ে কবি বলিয়েছেন,

'কাল উমা আমার এল সন্ধ্যাকালে,
কি জানি কিরূপে ছিল বিল্বমূলে,
বিল্বমূলে স্থিতি করিয়ে পার্ব্বতী
জাগিয়ে যামিনী পোহাল।'

—রাধিকাপ্রসন্ন : ক. বি. শা. প.—বাল্যলীলা

তাই কবির কাছে কিশোরী উমা আসলে পরব্রহ্ম সনাতনী।

'সব সখী সঙ্গে খেলে, কালী কালী বলে,
কালিকে গিরি বালিকে হয়েছেন আপনি॥'

—কালিদাস চট্টোপাধ্যায় : ক. বি. শা. প.—বাল্যলীলা

মদনভস্ম : হর-পার্ব্বতী পরিণয়

বাল্যলীলা ও পৌগণ্ডলীলার পরেই উমা-মহেশ্বরের শুভ পরিণয়। অবশ্য শিবশক্তি আসলে একই সত্তা। তবে লীলারস ভক্তকে আস্বাদন করাবার জন্যই 'একাত্মানৌ অপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতো তৌ'। তাই উমা-মহেশ্বরের লৌকিক নরনারীর বিবাহের মতো বিবাহ-বর্ণনায় কবির এত অনুরাগ।

শাক্ত মঙ্গলকাব্যগুলির শিবায়ন খণ্ডে হরপার্ব্বতীর বিবাহের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। তবে এই বিবাহের পূর্ব্বে আছে শিব কর্ত্তৃক মদন ভস্ম, কামনার আত্যন্তিক বিলুপ্তি এবং পর পর্য্যায়ে পার্ব্বতীর দিক থেকে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের ইতিহাস, দুশ্চর তপশ্চর্য্যার ইতিকথা।

শিবের দ্বারা মদনের ভস্মীভবন এবং শিবকে পাবার জন্য শক্তির এই তপস্যা শাক্ত মঙ্গলকাব্যের কবি কেন বর্ণনা করলেন তা বুঝতে গেলে বিষয়টির উৎস অনুসন্ধান করতে হবে।

শাক্ত মঙ্গলকবির এরূপ বর্ণনার প্রেরণাস্থল যে মহাকবি কালিদাসের অমর কাব্য কুমারসম্ভব তাতে কোন সন্দেহ নাই। কবিদের কালিদাসের অনুসরণ-প্রবৃত্তি এত প্রবল যে, সময়ে সময়ে কালিদাসের ছত্রের আক্ষরিক অনুবাদ আমরা শাক্ত মঙ্গলকাব্যগুলিতে প্রত্যক্ষ করি। কুমারসম্ভব কাব্যের পঞ্চম সর্গে উমার নাম কেন অপর্ণা হ'ল তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কবি কালিদাস বলেছেন :

"স্বয়ংবিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ॥"

তপস্যার চরম সীমায় তপস্বী বৃক্ষ থেকে স্বয়ংচ্যুত পত্রভোজনে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে থাকেন। উমা এইরূপ পত্রভোজনও ত্যাগ করলেন। তাই তাঁর নাম অপর্ণা হ'ল।

মুকুন্দরামের 'তেজিলা বৃক্ষের পত্র ছাড়িলা অনুপান। সেই হইতে অপর্ণা ধরিলা অভিধান॥' এই উক্তি কালিদাসের প্রতিধ্বনি বলা চলে।

কালিদাসের কুমারসম্ভবের পঞ্চম সর্গে গৌরীর তপস্যা বিবৃত হয়েছে। এই তপস্যার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত হচ্ছে শিব কর্তৃক মদনভস্ম। মদনভস্মের বর্ণনায় আমরা দেখি যে 'পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী' পার্ব্বতী শিবের পরিচর্য্যা করতে এসেছেন। তখন পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিতে অকাল বসন্তের আবির্ভাব। দেবাদিদেব কিন্তু 'নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্' সমাধিস্থ। পরে উমা যখন প্রণামাবসরে 'মন্দাকিনী-পুষ্করবীজমালা' শিবকে অর্পণ করতে গেলেন, তখন মদন 'পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ' শিবের উপর সম্মোহন নামক অমোঘ বাণ নিক্ষেপ করলেন। শিবের কামজ চিত্ত-চাঞ্চল্যের বর্ণনায় কালিদাস এরূপ ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তি করেছেন :

'হরস্তু কিঞ্চিৎ পরিবৃত্তধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভ ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি॥'

চন্দ্রোদয়ে সমুদ্রের জলের মতো শিবের অন্তঃকরণ কিছু অধীর হ'ল। তিনি উমার কুঁচফলের মতো রক্তিম অধরোষ্ঠে ও মুখে দৃষ্টি ক্ষেপণ করলেন।

উমামুখে শিবের এই 'ঈক্ষণ' উমার দেহে ও মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো, তার কালিদাস-কৃত বর্ণনাও লক্ষ্য করবার বিষয় :

'বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্য্যস্ত-বিলোচনেন॥'

হিমাচল-তনয়ারও তখন ভাবান্তর ঘটলো। তাঁর অঙ্গে কদম্বের কোরকের মতো রোমাঞ্চ দেখা দিল। তিনি আনতনেত্রে প্রত্যাবৃত্তমুখে শিবের কাছে চিত্রার্পিতের মতো দাঁড়িয়ে থাকলেন।

শিবের 'ঈক্ষণ' ও পার্ব্বতী বা শক্তির 'চেষ্টিত' ইহাদের প্রকৃত তাৎপর্য্য কালিদাস নিজেই তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে প্রকাশ করে বলেছেন :

'ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনীম।
তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ॥'

একই স্বয়ম্ভূকে পণ্ডিতগণ পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনী প্রকৃতি ও তদ্দ্রষ্টা উদাসীন পুরুষ বলে থাকেন। শক্তি পুরুষার্থপ্রবর্ত্তিনী প্রকৃতি, কিন্তু শিব প্রকৃতিদর্শী অর্থাৎ প্রকৃতিকে ঈক্ষণকারী উদাসীন পুরুষ। শিবের ঈক্ষণমাত্রেই শক্তির জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টিস্থিতিবিনাশে ক্রিয়াশীলতা। উপনিষদেও পরব্রহ্মের 'ঈক্ষণ' উল্লিখিত হয়েছে।

'তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত' —ছান্দোগ্য ৬।২।৩

তিনি ঈক্ষণ করলেন, বহুভাবে বিস্তৃত হবার কামনায় তেজ সৃষ্টি করলেন।

'স ঐক্ষত লোকানসৃজা ইতি। স ইমাঁল্লোকানসৃজত' —ঐতরেয় ১।১।১

তিনি ঈক্ষণ করলেন, এই ঈক্ষণই লোকসৃষ্টির ইচ্ছা। তিনি এই লোকসংঘকে সৃষ্টি করলেন।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে ঈক্ষণকে ইচ্ছানামে অভিহিত করা হয়েছে। পরব্রহ্ম অর্থাৎ নির্গুণ সদাশিব সম্বন্ধে আলোচনা করে শক্তির স্বরূপ ও কার্য্যকারিতা বর্ণনা করতে গিয়ে মহানির্ব্বাণতন্ত্রকার বলেছেন :

'তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্॥'

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র : চতুর্থ উল্লাস, ২৯ শ্লোক

তুমি মহাযোগিনী যোগমায়া, অর্থাৎ অসীমের সঙ্গে সীমার সংযোগ-সাধিকা

পরা শক্তি, পরব্রহ্মের ইচ্ছামাত্র অবলম্বন করে এই চরাচর জগৎকে সৃষ্টি, পালন ও সংহার করছ।

কালিদাসের কাছে যা শিবের 'ঈক্ষণ' তাই তন্ত্রে পরব্রহ্মস্বরূপ সদাশিবের ইচ্ছা, কালিদাসের নিকট যা উমার ভাব-বিকার তা তন্ত্রকারের কাছে মহা-শক্তির সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কর্ম।

কালিদাস কিন্তু শিবশক্তির স্বরূপ ও ভাব-বিকার বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি শক্তিরূপিণী উমাকে দিয়ে তপস্যা করিয়ে তাঁকে শিবের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কুমারসম্ভব কাব্যের হরপার্বতী-পরিণয় প্রসঙ্গ শিবশক্তি-তত্ত্বদ্বয়ের ঐক্যানুভূতির প্রকাশের লৌকিক মাধ্যম মাত্র। উমার দুশ্চর তপশ্চর্য্যার বর্ণনা কাব্যাংশে উপাদেয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বর্ণনার প্রকৃত ব্যঞ্জনা শিবশক্তির স্বরূপ। শিববিরহিণী উমা নিদ্রিতাবস্থায় হঠাৎ নেত্র নিমীলন করে যখন বলে উঠেন—'ক নীলকণ্ঠ ব্রজসি', তখন তিনি পাঠককে শুধু বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারের রসে আপ্লুত করেন না, শক্তিতত্ত্বের সঙ্গে শিবতত্ত্বের একাত্মা-ব্যঞ্জনাতেও মগ্ন করেন। উমার এই তপস্যা শিবতত্ত্বের সহিত শক্তিতত্ত্বের একাত্মবোধের প্রকাশ মাত্র। আসলে এক সত্তা কখনো শক্তিরূপে, কখনো বা শিবরূপে প্রকাশিত। যামলতন্ত্রে কথিত হয়েছে :

> 'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণত্রয়মুদাহৃতম্।
> সাম্যাবস্থিতিমেতেষাং অব্যক্তং প্রকৃতিং বিদুঃ॥
> সৈব মূলপ্রকৃতিঃ স্যাৎ প্রধানং পুরুষোঽপি চ।'

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটিকে গুণ বলা হয়। এদের সাম্যাবস্থাকে অব্যক্ত প্রকৃতি, মূল প্রকৃতি বা প্রধান বলে। এই সাম্যাবস্থাই আবার পুরুষ-সংজ্ঞক।

> 'সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণানাং ত্রিতয়ং প্রিয়ে।
> যদা সা পরমা শক্তিগু ণাধিষ্ঠানমাচরেৎ॥
> প্রকৃতিত্বং ভবেৎ তস্যাঃ পুরুষঃ স্যাৎ সদাশিবঃ॥'

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণ। পরমা শক্তিই গুণান্বিত অবস্থায় প্রকৃতি ও গুণরহিত অবস্থায় পুরুষ হয়।

প্রপঞ্চসারতন্ত্রের টীকাকার পদ্মপাদাচার্য্য এইরূপ মন্তব্য করেছেন, 'একের

শক্তিঃ অন্তর্মুখতয়া বিকসন্তী বিদ্যাদিতত্ত্বরূপিণী বহির্মুখতয়া সঙ্কুচন্তী মায়াদি-তত্ত্বরূপিণী'। একই শক্তির অন্তর্মুখ-পরিণাম থেকে বিদ্যা, সদাশিব ইত্যাদি তত্ত্বের প্রকাশ এবং সীমাবদ্ধ বহির্মুখ-পরিণাম থেকে মায়াদিতত্ত্বের স্ফুরণ।

কালিদাস-বর্ণিত উমা-তপস্যা এই মহাশক্তির বহির্মুখ-পরিণাম থেকে অন্তর্মুখ-পরিণামে যাত্রা মাত্র। যখন মহাশক্তি বহির্মুখপরিণত, তখন তিনি নানা মায়িকতত্ত্বরূপে প্রকাশিত। এই মায়াদিতত্ত্বরূপিণী শক্তিই কুমারসম্ভব কাব্যের তৃতীয় সর্গে বর্ণিতা স্থাবররাজকন্যা উমা যিনি

'অশোক-নির্ভৎসিত-পদ্মরাগমাকৃষ্ট-হেমদ্যুতি-কর্ণিকারম্।
মুক্তাকলাপী-কৃতসিন্ধুবারং বসন্তপুষ্পাভরণং বহন্তী॥'

উমা বসন্তকালীন পুষ্পের আভরণ ধারণ করেছিলেন। আভরণরূপে ব্যবহৃত অশোক, কর্ণিকার ও সিন্ধুবার যথাক্রমে পদ্মরাগ, স্বর্ণ ও মুক্তাকে দীপ্তিতে পরাজিত করেছিল এবং বিদ্যাদিতত্ত্বরূপিণী শক্তি পঞ্চমসর্গ-বর্ণিতা তাপসী অপর্ণা যিনি

'শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাং শুচিস্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্রপ্রতিঘাতিনীং প্রভামনন্যদৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত॥'

প্রবল গ্রীষ্মে চারিটি অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে হাসিমুখে উপবেশন করে চোখ-ঝলসানো সৌর কিরণকে উপেক্ষা করেও সূর্য্যমণ্ডলে একাগ্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করে উমা পঞ্চাগ্নিসাধ্য তপস্যা করেছিলেন।

যখন 'বাসো বসানা তরুণার্করাগম্' উমা 'অপাস্যাভরণানি যৌবনে' বল্কল-ধারিণী অপর্ণায় পরিণত হলেন, তখন প্রার্থিতবর সদাশিব তাঁকে স্বরূপে ধরা দিলেন।

'স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ সমাললম্বে বৃষরাজকেতনঃ॥'

তখন হাসিমুখে শিব নিজ মূর্ত্তিতে দেখা দিলেন।

তাত্ত্বিক দিক থেকে এ বৃত্তান্ত, মায়াদিতত্ত্বরূপিণী শক্তির বিদ্যাদিতত্ত্বরূপিণী শক্তিতে বিলোমগতিক পরিবর্ত্তনেই শিবতত্ত্বের উন্মেষ ছাড়া আর কিছুই নয়।

সাধনার ইতিহাসে যে ষট্‌চক্রভেদ কথিত হয়েছে, তার সঙ্গে এই উমা-তপস্যা বৃত্তান্তের ভাবগত যোগাযোগ সুস্পষ্ট। মূলাধারচক্রে অবস্থিতা প্রসুপ্তভুজগাকারা কুলকুণ্ডলিনী গিরিকন্যা উমা। কুলকুণ্ডলিনীর উত্থান সম্ভব

তখনই যখন জীবের কামনা বিনষ্ট হয়। এই কামের উপস্থিতিতেই জীবের বদ্ধদশা। কামকে জয় করার উপদেশ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও পাওয়া যায়ঃ 'জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্।' কামনার ত্যাগই মদনভস্ম। সমস্ত কাম বিদূরিত হবার পর কুলকুণ্ডলিনীর জাগরণ সম্ভব হয় এবং কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রতা হয়ে মূলাধার-স্বাধিষ্ঠান-মণিপুর-অনাহত-বিশুদ্ধ-আজ্ঞা চক্র ভেদ করে সহস্রারে গমন করেন ও তথায় পরমশিবের সঙ্গে মিলিত হন। কুলকুণ্ডলিনীর এই ঊর্দ্ধ গতিই উমাকৃত দুশ্চর তপশ্চর্য্যা। তপস্যার অন্তে হরের সঙ্গে পার্ব্বতীর মিলন, ষট্‌চক্রভেদে ও পরমশিবের সঙ্গে কুলকুণ্ডলিনীর যোজনা।

মদনভস্ম ও হরপার্ব্বতী পরিণয়ের পর হরপার্ব্বতীর সম্ভোগ-শৃঙ্গার বর্ণনা

বিপরীত রতি

করতে গিয়ে কবি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব কাব্যে হরপার্ব্বতীর বিপরীত রতি আভাসিত করেছেন।

'চুম্বনাদলকচূর্ণদূষিতং শঙ্করোঽপি নয়নং ললাটজম্।
উচ্ছ্বসৎকমলগন্ধায় দদৌ পার্ব্বতীবদনগন্ধবাহিনে ॥'
—কুমারসম্ভব: অষ্টম সর্গ, ১৯ শ্লোক

চুম্বনকালে শিবের তৃতীয় নেত্র উমার অলকস্থিত গন্ধচূর্ণে আচ্ছন্ন হ'ত। তখন উমা পদ্মসুরভি ফুৎকারে সেই ধূলি অপনোদিত করতেন।

এই শ্লোকের টীকায় আচার্য্য মল্লিনাথ মন্তব্য করেছেন—'অত্র হরচক্ষুষি অলকচূর্ণপাতকথনাৎ দেব্যাঃ উপরিভাবঃ সূচিতঃ'।

হরপার্ব্বতীর এই বিপরীত রতির গভীর তাৎপর্য্য আছে। জগৎ-সৃষ্টিতে পরমশিবের প্রাধান্য তন্ত্র স্বীকার করেন নাই, করেছেন শক্তিরই প্রাধান্য। মহা-নির্ব্বাণতন্ত্রকার সদাশিবের মুখ দিয়ে মহাশক্তিকে বলিয়েছেনঃ

'সৃষ্টেরাদৌ ত্বমেকাসীস্তমোরূপমগোচরম্।
ত্বত্তো জাতং জগৎ সর্ব্বং পরব্রহ্মসিসৃক্ষয়া ॥
মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তং ত্বয়া সৃষ্টমিদং জগৎ।
নিমিত্তমাত্রং তদ্‌ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণম ॥
সদ্রূপং সর্ব্বতোব্যাপি সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সদৈকরূপং চিন্মাত্রং নির্লিপ্তং সর্ব্ববস্তুষু ॥

ন করোতি ন চাশ্নাতি ন গচ্ছতি ন তিষ্ঠতি।
সত্যং জ্ঞানমনাদ্যন্তমবাঙ্মানসগোচরম্ ॥
তস্যেচ্ছামাত্রমালম্ব্য ত্বং মহাযোগিনী পরা।
করোষি পাসি হংস্যন্তে জগদেতচ্চরাচরম্ ॥'

—মহানির্বাণতন্ত্র : চতুর্থ উল্লাস, ২৫—২৯ শ্লোক

সৃষ্টির প্রথমে ইন্দ্রিয়াদির অগোচর অপ্রকাশ অবস্থায় একমাত্র তুমিই ছিলে। পরব্রহ্মের সৃষ্টির ইচ্ছায় তোমা থেকে সমস্ত জগতের উদ্ভব হয়েছে। মহত্তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে পঞ্চ মহাভূত পর্যন্ত এই চরাচর তোমার দ্বারাই সৃষ্ট। সর্ব্বকারণের কারণ অর্থাৎ পরমকারণ সেই পরব্রহ্ম এক্ষেত্রে কেবল নিমিত্ত। সল্লক্ষণ ব্রহ্ম সর্ব্বানুসন্ধী অথচ সর্ব্বাতিশায়ী, একমাত্র পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট, চিন্ময় ও সর্ব্ব বিষয়ে অসঙ্গ। ব্রহ্ম কর্ম্মকরণ, ভোজন, গমন বা অধিষ্ঠান অর্থাৎ যাবতীয় ক্রিয়াশক্তিশূন্য। ব্রহ্ম কালত্রয়ে অবাধিত পারমার্থিক সত্য, সচ্চিন্ময়, আদিহীন, অন্তরহিত এবং বাক ও মনের অগোচর তত্ত্ব। মহাযোগিনী সীমা ও অসীমের যোগ-সাধিকা, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়ার সংযোগকারিণী পরা অর্থাৎ চরমা ও পরমা শক্তিরূপা তুমি চরাচর জগতের সৃষ্টি, পালন ও সংহার সাধন করছ।—মহাদেবীর প্রতি সদাশিবের উক্তি।

জগৎ-সৃষ্টিতে শক্তির এই প্রাধান্যই কালিদাস-বর্ণিত বিপরীত রতির ব্যঙ্গার্থ। কালীর ধ্যানে আছে 'মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্'। ছিন্নমস্তার ধ্যানেও দেখি দেবীর পাদপীঠে রতিকাম বিপরীত রতিতে মগ্ন, 'বিপরীতমৈথুনরত প্রদ্যুম্নতৎকামিনী'। মহারাজ মহাতাব চাঁদ জগজ্জননীর ছিন্নমস্তা রূপ-বর্ণনায় এইরূপ উক্তি করেছেন :

'কমল কর্ণিকোপরি, যোনিরূপা যন্ত্র হেরি।
বিপরীতরতিকারী রতিকাম তদুপরি ॥
তদূর্দ্ধে বিরাজমানা প্রত্যালীঢ়-চরণা।
মুণ্ডমালা-বিভূষণা, ত্রিনয়না, শঙ্করী ॥'

—ক. বি. শা. প. : জগজ্জননীর রূপ

ছিন্নমস্তার পাদপীঠে বিপরীত মৈথুনরত কাম ও রতি বিপরীত রতিমগ্না শিবশক্তির জীবজাগতিক প্রকাশ মাত্র। তন্ত্রোক্ত চিন্তাধারানুযায়ী কাম অর্থাৎ

সৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা জীবজগতে পুরুষ ও প্রকৃতি এই দ্বিবিধ ধারায় অভিব্যক্ত। একই সত্তা যেমন একরূপে শিব ও অন্যরূপে শক্তি, তেমনি সৃষ্টিমূল কাম জীবজগতে কখনো পুরুষীয় আবেগ, কখনো বা প্রকৃতিনিষ্ঠা উন্মাদনা। আধ্যাত্মিক শিবশক্তি-সম্বন্ধে যেমন সৃষ্টিকারিণী শক্তির প্রাধান্য, জাগতিক পুরুষ-প্রকৃতি সম্পর্কেও তেমনি সৃষ্ট অবয়বের পালনপোষণের দিক দিয়ে প্রকৃতিরই প্রাধান্য। জৈব পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে প্রকৃতি-প্রাধান্য সূচনার উদ্দেশ্যেই জগজ্জননীর ছিন্নমস্তা-রূপ-কল্পনায় রতিকামকে বিপরীত রতিকারী বলা হয়েছে।

ষট্‌চক্রভেদের অনুভূতিতে আত্মার সঙ্গে আত্মার বিপরীত-রমণ অধ্যাত্ম উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয়। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলেছেন যে—'এই অবস্থা যখন হ'ল ঠিক আমার মত একজন এসে ঈড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না নাড়ী সব ঝেড়ে দিয়ে গেল। ষট্‌চক্রের এক-একটি পদ্মে জিহ্বা দিয়ে রমণ করে, আর অধোমুখ পদ্ম ঊর্দ্ধমুখ হয়ে উঠে। শেষে সহস্রার পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়ে গেল।'

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : চতুর্থ ভাগ—৩১শ খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ

সমাধিভূমিতে আরোহণের সময় তিনি অনুভব করলেন যে, অধোমুখে অবস্থিত পদ্মগুলি বিকশিত হয়ে ঊর্দ্ধমুখ হ'ল ও আত্মার রমণ সংঘটিত হ'ল। দেহচক্রস্থিত পদ্মগুলির এই ঊর্দ্ধমুখীনতাই রতিবৈপরীত্যের ইঙ্গিত বহন করছে।

সুতরাং কুমারসম্ভব কাব্যের আদ্যন্ত আলোচনা করলেই এই অনুমান অতীব সঙ্গত বলে বোধ হবে যে, কবির কল্পনালতা 'বৃন্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি' বিকশিত হয়ে উঠে নাই, তন্ত্রের তত্ত্বসমীক্ষার বাস্তব ভূমি থেকেই তার উদ্ভব হয়েছে। কবি কালিদাসের কল্পনাবরণ মোচন করলেই দেখা যাবে, তাঁর হৃদয়ে রয়েছে প্রকৃত শক্তি সাধকের অকৃপণ আবেগ। তাই তিনি তাঁর অপর অমর মহাকাব্য রঘুবংশের আদিতে 'বাগর্থপ্রতিপত্তয়ে' ভক্তিনম্রচিত্তে পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা করেছেন :

'জগতঃ পিতরৌ বন্দে পার্ব্বতীপরমেশ্বরৌ।'

জগতের মাতা ও পিতা শক্তি ও শিবের আমি বন্দনা করি।

কবি কালিদাসের কাব্য-গঙ্গোত্রী থেকে যে গাঙ্গেয় ধারা বাংলা সাহিত্যের মর্ত্যভূমিতে নেমে এসেছে, সেই ধারাতেও আমরা উৎসলোকের তাত্ত্বিকতা অনুভব করতে পারি।

হরতপস্যা ভঙ্গ ও মদনভস্মের বর্ণনায় কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম এইরূপ উক্তি করেছেন :

'ধ্যানেতে আছেন হর অজিন আসনে।
ঝারি হাতে পার্ব্বতী আছেন সন্নিধানে॥
আকর্ণ পুরিয়া ধনু বীর এড়ে শরে।
ঈষৎ চঞ্চল শিব হইলা অন্তরে॥
ধ্যানভঙ্গ হৈলা হর চারিদিকে চান।
সম্মুখে দেখিলা চাপধারী পাঁচবান॥'

—ক. বি. কবিকঙ্কণ চণ্ডী : হিমালয়ের প্রতি নারদোপদেশ ও মদনভস্ম অংশ।

এখানে শিবের 'ঈক্ষণ' চতুর্দ্দিকে, অর্থাৎ মহত্তত্ত্বাদিভূতান্ত জগতে।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গল কাব্যে অনুরূপভাবেই হরধ্যান-ভঙ্গ ও মদনভস্মের বর্ণনা দিয়েছেন :

'কিবা করে ধ্যান কিবা করে জ্ঞান
যে করে কামের শর।
শিহরিল অঙ্গ ধ্যান হইল ভঙ্গ
নয়ন মেলিলা হর॥
কামশরে ত্রস্ত নারী লাগি ব্যস্ত
নেহারেন চারিপাশে।
সম্মুখে মদন হাতে শরাসন
মুচকি মুচকি হাসে॥'

—বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী : শিবের ধ্যানভঙ্গ ও কামভস্ম অংশ।

এখানে 'নারী লাগি ব্যস্ত' এই উক্তিতে জগৎ-সৃষ্টি বিষয়ে পরমশিবের শক্তি সাপেক্ষত্ব সূচিত হয়েছে। মুকুন্দরামের মতো ভারতচন্দ্রও শিবের 'ঈক্ষণ' যে মহত্তত্ত্বাদিভূতান্তে সে-কথা 'নেহারেন চারিপাশে' এই অংশে আভাসিত করেছেন।

মদনভস্মের পর গৌরীর তপস্যা ও শঙ্করের ছলনার কালিদাস-কৃত বর্ণনা

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে অনুসরণ করেছেন। যেমন গৌরীর তপস্যা-বর্ণনাংশে মুকুন্দরামের উক্তি :

'একপদে কৃতাঞ্জলি দিবসক্ষেপণ।
রজনী সময়ে করেন কুশেতে শয়ন ॥
পঞ্চ তপ সাধেন জ্বালিয়া পঞ্চানলে।
ঊর্দ্ধ মুখে দৃষ্টি দেন অরুণমণ্ডলে ॥'

—কবিকঙ্কণ চণ্ডী : গৌরীর তপস্যা

কিন্তু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রক্তবাসা পিঙ্গলকেশা অরুণমূরতি গৌরীকে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। গৌরীর তপোবৃত্তান্ত ভারতচন্দ্র তাঁর অন্নদামঙ্গলে সন্নিবেশিত করেননি।

কিন্তু রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র হরপার্ব্বতী-পরিণয়-বর্ণনার একাংশে যে তাত্ত্বিকতার সমাবেশ করেছেন তা তাঁর তন্ত্রোক্ত তত্ত্বদিদৃক্ষারই পরিচায়ক। স্ত্রী-আচারের সময় যখন হর অঙ্গনা-সমাজে উলঙ্গ হয়ে পড়লেন, তখন মেনকার মাতৃহৃদয়ে স্বতঃই এই আশঙ্কা জাগল :

'উমার কেশ চামরছটা, তামার শলা বুড়ার জটা।
তায় বেড়িয়া ফোঁপায় ফণী দেখে আসে জ্বর লো ॥
উমার গলে মণির হার, বুড়ার গলে হাড়ের ভার।
কেমন করে ও মা উমা করিবে বুড়ার ঘর লো।
আমার উমা মেয়ের চূড়া
ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে পাগল নহে ওই ভুবনেশ্বর লো ॥'

—বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী : কোন্দল ও শিবনিন্দা।

ভণিতায় আভাসিত তাত্ত্বিকতা ভারতচন্দ্র পরিস্ফুট করেছেন উমার মুখের নিজস্ব উক্তিতে অমঙ্গল আশঙ্কার করাল ছায়াপাতে :

'শিবনিন্দা করিয়া মেনকা যত কহে।
দক্ষেরে হইল মনে উমারে না সহে ॥

যে তুঃখে দক্ষের ঘরে ত্যজিলাম কায়।
এখানে মেনকা বুঝি ফেলে সেই দায়॥
হর লয়ে নরলীলা করিবারে চাই।
তাহে হয় শিবনিন্দা এ বড় বালাই॥'

—বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের
গ্রন্থাবলী : শিবের মোহনবেশ।

উদ্ধৃতি থেকেই বোঝা যায় যে, হরপার্ব্বতীরূপে লৌকিক জীবন-প্রণালীর অনুসরণ শিবশক্তির নরলীলামাত্র। এই সিদ্ধান্ত তন্ত্রসম্মত। কারণ—

'জন্মকালে চ জননী স্নেহকালে চ কন্যকা।
ভার্য্যা ভোগায় সম্পৃক্তা, অন্তকালে চ কালিকা॥'

অতএব, একই কালী জগতে গর্ভধারিণীরূপে জন্ম দেন, কন্যারূপে স্নেহ গ্রহণ করেন, ভার্য্যারূপে ভোগের বিষয়ীভূতা হন ও দেহান্তর সংক্রমণকালে কালকলন-কর্ত্রীরূপে দেখা দেন।

এই সুরে সুর মিলিয়ে পরবর্ত্তী কালের শাক্ত কবিও গেয়ে উঠলেন :

'মা বিরাজে ঘরে ঘরে
জননী তনয়া জায়া সহোদরা কি অপরে!'

অথবা,

'ও মা সর্ব্বজীবে তুমি শিবে মাতৃরূপা হয়ে পাল।
আবার ভার্য্যারূপে ব্রহ্মময়ী, তুমি প্রণয়ের খেলা খেল।'

—ক. বি. শা. প. : মা কি ও কেমন—গোবিন্দ চৌধুরী

হরপার্ব্বতী-পরিণয়ের পর হরপার্ব্বতীর দাম্পত্য জীবন লৌকিক নরনারীর দাম্পত্য জীবনের মতোই। শ্মশানচারী ভিক্ষাজীবী শিবের ঘরণী হয়েছে স্নেহের তুলালী রাজনন্দিনী উমা, এ বৃত্তান্ত নিয়ে গিরিজায়া মেনকার তুশ্চিন্তার অবধি নাই। শাক্ত কবির লেখনীতে মাতৃহৃদয়ের সেই আর্ত্তি ফুটেছে :

'ও মা, কেমন করে হরের ঘরে,
ছিলি উমা, বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে, শুনে ভেবে মরে যাই।

মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে,
জামাই নাকি ভিক্ষা করে।
এবার নিতে এলে, বলবো—হরে,
উমা আমার ঘরে নাই ॥'

—গিরিশচন্দ্র : ক. বি. শা. প.—আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক

কন্যার জন্য মাতৃহৃদয়ের এই উচ্ছ্বসিত স্নেহব্যাকুলতা 'আগমনী' ও 'বিজয়া' বিষয়ক শাক্ত পদাবলীর প্রধান উপজীব্য। এই জাতীয় পদাবলীর তাত্ত্বিকতার দিক দিয়ে তন্ত্রানুগত্য বুঝতে গেলে এগুলির প্রকৃত পটভূমিকা কি তা জানতে হবে। সাধারণ দৃষ্টিতে আগমনী ও বিজয়ার পদগুলি স্নেহার্ত্ত মাতৃহৃদয়ের উচ্ছ্বসিত অশ্রুর দ্বারা রচিত হার। কিন্তু সাধনপথে প্রবর্ত্তকের দৃষ্টিতে এগুলি বাৎসল্য-সাধন-প্রক্রিয়ার মুদ্রাঙ্কিত। হিমালয়পুরীতে যখন গিরিবর হরজায়া উমাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন, তখন যে নগর কোলাহল উত্থিত হ'ল তার শ্রুতিমাত্রেই কন্যা-বিরহিণী মেনকা উমাকে প্রত্যুদ্গমন করে আনবার জন্য ধাবিত হলেন। এই দৃশ্য বর্ণনায় শাক্ত কবি উক্তি করেছেন :

আগমনী ও বিজয়া

'অমনি উঠিয়ে পুলকিত হৈয়ে, ধাইল যেন পাগলিনী!
চলিতে চঞ্চল, খসিল কুন্তল, অঞ্চল লোটায়ে ধরণী ॥'

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য : ক. বি. শা. প.—আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক

এখানে উমাজননী মেনকা ও গোপালজননী যশোমতীর মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কারণ দু'জনেই বাৎসল্যরসে পরমসত্তাকে অভিসিঞ্চিত করেছেন। দু'জনেরই অনুসৃত পথ শুদ্ধভক্তি-মার্গ। পরমা প্রকৃতি বা পরম পুরুষ শুদ্ধভক্তিরই অধিগম্য তত্ত্ব।

'মোর পুত্র, মোর সখা, মোর প্রাণপতি।
এই ভাবে যেই মোরে করে শুদ্ধ ভক্তি ॥
আপনারে বড় মানে, আমারে সম, হীন।
সেই ভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥'

—শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত : আদিলীলা—চতুর্থ পরিচ্ছেদ

শাক্ত কবির আলেখ্যে উমাজননী মেনকা বাৎসল্যভাবের উপাসিকা।

দরিদ্র বসনভূষণহীন শ্মশানচারী হরের ঘরে প্রাণের দুলালীকে পাঠিয়ে মেনকার রাত্রি দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত হচ্ছে। ইষ্টচিন্তায় বিভোরা উপাসিকা যেমন জাগরণে ও স্বপ্নে ইষ্ট প্রত্যক্ষ করেন, মেনকাও তেমনি উমা-চিন্তায় জাগ্রৎ দশায় দৃঢ় সঙ্কল্প প্রকাশ করেন,

'গিরি এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনবো না॥'

—রামপ্রসাদ : ক. বি. শ. প.—আগমনী, প্রথম স্তবক

আবার স্বপ্নে উমাকে প্রত্যক্ষ করে তাঁর অনুভূতির অভিব্যক্তি দেন :

'কাল স্বপনে শঙ্করীমুখ হেরি কি আনন্দ আমার।
হিমগিরি হে, জিনি অকলঙ্ক বিধু, বদন উমার॥'

—ক. বি. শা. প. : আগমনী, প্রথম স্তবক

শিবের বসন বাঘছাল, ভূষণ হাড়মাল, তার জটায় কালফণীর সমাবেশ, ধুতুরার ফলে তার পরমা প্রীতি, উমা-সপত্নী সুরধুনী শিবের সোহাগিনী প্রেয়সী, শিবের প্রিয় যোগস্থান শ্মশান—এই সব চিন্তায় মেনকার মন আচ্ছন্ন। তথাপি শিবের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে মেনকার স্বচ্ছদৃষ্টি কখনো আবিল হয় নাই। তাঁর কাছে শিব

'নাহি মানে ধর্ম্মাধর্ম্ম, নাহি করে কোনো কর্ম্ম,
নিজ ভাবে নিজ মর্ম্ম, নিজে করে গান॥
লোকে বলে মহাযোগী, অথচ বিষয়ভোগী।
সমভাবে যোগভোগ করে সমাধান॥'

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : ক. বি. শা. প.—আগমনী, প্রথম স্তবক

শাক্ত কবির এই আলেখ্য তন্ত্রোক্ত সদাশিবের চিত্র ছাড়া আর কিছুই নয়। তন্ত্রের মতে পাশবদ্ধ জীব, পাশমুক্ত শিব। পাশের লক্ষণ সম্বন্ধে কথিত আছে :

'ঘৃণা, লজ্জা, ভয়ং শঙ্কা জুগুপ্‌সা চেতি পঞ্চমী।
কুলং শীলং তথা জাতিরষ্টৌ পাশা প্রকীর্ত্তিতাঃ॥'

ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, শঙ্কা (শোক), জুগুপ্‌সা (কুকার্য্য গোপন করবার প্রবৃত্তি), কুল, শীল (বিধিবদ্ধ আচার-আচরণ) ও জাতি—এই আটটি পাশ।

পাশমুক্ত হওয়ার জন্যই সদাশিব ধর্ম্ম অধর্ম্ম, পাপ পুণ্য, জ্ঞান অজ্ঞান,

সুখ দুঃখ, জয় পরাজয় ইত্যাদি দ্বন্দ্বজ্ঞান থেকে মুক্ত। যার ধর্ম্ম, পুণ্য, জ্ঞান সুখ, জয় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে, তার অধর্ম্ম, পাপ, অজ্ঞান, দুঃখ, পরাজয় ইত্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে। শিব দ্বিতীয়-রহিত অদ্বৈত, তাই তিনি যাবতীয় দ্বন্দ্বজ্ঞানেরও অতীত। একই শক্তি কখনো পুরুষরূপা কখনো প্রকৃতিরূপা। তাই সৃষ্টিস্থিতিসংহার কার্য্যে গুণোপহিত হ'লেও পরম শিবের এই অদ্বৈতসত্তার পারমার্থিক দ্বৈততত্ত্বসিদ্ধি হয় না।

পরম শিব সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্বজ্ঞানের ঊর্দ্ধে বলে তাঁর কোন প্রবৃত্তি নাই। কর্ম্ম দুই প্রকার—সকাম ও নিষ্কাম। শিব সর্ব্বপ্রকার বাসনা-বিবর্জ্জিত বলে তাঁর সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি সম্ভব নহে। ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কামনারহিত হয়ে যে কর্ম্ম নিষ্পন্ন করা হয়, তাই নিষ্কাম কর্ম্ম। যিনি স্বয়ং ঈশ্বর, 'যস্মিন্নীশ্বর ইত্যনন্যবিষয়ঃ শব্দো যথার্থাক্ষরঃ' তিনি অন্য কোন ঈশ্বরের প্রীতির জন্য কর্ম্ম করবেন তাও সম্ভব নয়। তাই তিনি আত্মারাম, আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, গীতার ভাষায় 'আত্ম-নৈবাত্মনা তুষ্টঃ'। তিনি আপন ভাবে আপনি বিভোর। কালিদাসের ভাষায়ঃ

'মনো নবদ্বারনিষিদ্ধবৃত্তি হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্॥'

—কুমারসম্ভবঃ তৃতীয় সর্গ—৫০ শ্লোক

শিব তখন সমাধিস্থ অবস্থায় দেহের নবদ্বারে সঞ্চরণশীল মনকে নিরুদ্ধ করে হৃদয়ে অনাহতচক্রে সংস্থাপিত করে সিদ্ধপুরুষদের উপলব্ধিগম্য আত্মাকে স্বীয় আত্মায় প্রত্যক্ষ করছিলেন।

কবির 'নিজ ভাবে নিজ মর্ম্ম' এই কথাটির আরও গভীর তাৎপর্য্য আছে। সাধককবি রামপ্রসাদ সেন প্রবর্ত্তককে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ

'ডুব দে রে মন কালী বলে
হৃদিরত্নাকরের অগাধজলে।'—ক. বি. শা. প.ঃ মনোদীক্ষা

আত্মানুসন্ধানই কবির লক্ষ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি সাধনের প্রথম স্তরে বিবেক-বৈরাগ্যের সাহায্যে মনের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্য্যকে দূর করার ও পরিণত স্তরে মূলাধারস্থিতা কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সাধনের শেষ স্তরে আত্মৈশ্বর্য্যে তৃপ্ত হয়ে সাধক পরমানন্দ ও পরমা গতি প্রাপ্ত হন, সে-কথাও সাধককবির কথায় ফুটে উঠেছে।

'রতন মাণিক্য কত পড়ে আছে সেই জলে।
রামপ্রসাদ বলে, ঝম্প দিলে মন মিলবে রতন ফলে ফলে ॥'

—ক. বি. শা. প.ঃ মনোদীক্ষা

সাধনার এই শেষ স্তরে উপনীত সাধক ও পরমশিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কারণ দু'জনেই পাশমুক্ত, অতএব অভিন্ন।

'পাশযুক্তো ভবেৎ জীবঃ পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ।'

একই সত্তা পাশযুক্ত অবস্থায় জীব এবং পাশমুক্ত অবস্থায় শিব আখ্যা প্রাপ্ত হন।

সাধক ও শিব দু'জনেই তখন আত্মরতির প্রকাশে আনন্দ পান। শিবের আত্মরতির প্রকাশ হয় শক্ত্যুপহিত হয়ে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টিস্থিতিসংহার কার্য্যে প্রবৃত্তিতে। নিত্যস্তর থেকে আসে লীলার স্তর। আবার লীলাস্তর থেকে বিলোম গতিতে নিত্যস্তর। যখন নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হয়, তখন মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর উদ্ভূত হয়, তুরীয় অবস্থা থেকে জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি সব অবস্থাই আবির্ভূত হয়। আবার যখন লীলা নিত্যে লয়প্রাপ্ত হয় তখন স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ মহাকারণে লীন হয়, জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা তুরীয় অবস্থায় মিশিয়ে যায়। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ওঁকারের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নিত্যলীলা যোগ সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন ঃ

"শ্রীরামকৃষ্ণ—(মহিমের প্রতি) ওঁকারের ব্যাখ্যা তোমরা কেবল বল অকার উকার মকার। ... ...

মহিমাচরণ—অকার, উকার, মকার—কিনা সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ—আমি উপমা দিই ঘণ্টার টং শব্দ। ট—অ—অ—ম—ম।

লীলা থেকে নিত্যে লয়,—স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয়। জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়। আবার ঘণ্টা বাজলো যেন মহাসমুদ্রে একটা গুরু জিনিস পড়লো আর ঢেউ আরম্ভ হ'ল। নিত্য থেকে লীলা আরম্ভ হ'ল, মহাকারণ থেকে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ শরীর দেখা দিল—সেই তুরীয় থেকেই জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি সব অবস্থা এসে পড়লো। আবার মহাসমুদ্রের ঢেউ মহাসমুদ্রেই লয় হ'ল। নিত্য ধরে ধরে লীলা, আবার লীলা ধরে ধরে নিত্য। আমি টং শব্দ উপমা দিই। আমি ঠিক এই সব দেখেছি। আমায় দেখিয়ে

দিয়েছে চিৎসমুদ্র, অন্ত নাই। তাই থেকে এই সব লীলা উঠলো, আর ঐতেই লয় হ'য়ে গেল। চিদাকাশে কোটি ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি, আর ঐতেই লয় হয়, তোমাদের বইয়ে কি আছে, অত আমি জানি না।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : প্রথম ভাগ—ত্রয়োদশ খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরমশিবের আত্মরতির প্রকাশ যেমন নিত্যলীলা যোগে, সাধকের আত্মরতির প্রকাশ তেমনি জীবে প্রেমদানে ও সমাধির গুহায় সুনিবিড় চিৎবিলাসে। এই অবস্থায় সাধক সর্ব্বভূতে আপনাকে ও নিজের মধ্যে সর্ব্বভূতকে দর্শন করেন। এই 'সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি' দর্শন করার ফলে জীব ও পরমসত্তার মধ্যে ভেদ তাঁর কাছে পরিলুপ্ত হয়ে যায়। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই অধ্যাত্ম অনুভূতিকে নরেন্দ্রাদি ভক্তসঙ্গে আলোচনার অবসরে স্পষ্টভাবে রূপ দিয়েছেন :

'কালীঘরে পূজা করতাম। হঠাৎ দেখিয়ে দিলে, সব চিন্ময়—কোষাকুষি, বেদী, ঘরের চৌকাঠ—সব চিন্ময়। মানুষ, জীব, জন্তু—সব চিন্ময়। তখন উন্মত্তের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পুষ্প বর্ষণ করতে লাগলাম।—যা দেখি তাই পূজা করি।

একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে এই বিরাট মূর্ত্তিই শিব। তখন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হ'ল। ফুল তুলছি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটি ফুলের তোড়া।

... ...

দেখিয়ে দিলে যেন এক একটি ফুল গাছ এক একটি তোড়া,—সেই বিরাট মূর্ত্তির উপর শোভা করছে। সেই দিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল। মানুষকেও আমি ঠিক সেইরূপ দেখি। তিনিই যেন মানুষ শরীরটাকে লয়ে হেলে দুলে বেড়াচ্ছেন,—যেমন ঢেউয়ের উপর একটা বালিশ ভাসছে,—বালিশটা এদিক ওদিক নড়তে নড়তে চলে যাচ্ছে, কিন্তু ঢেউ লেগে একবার উঁচু হচ্ছে আবার ঢেউয়ের সঙ্গে নীচে এসে পড়ছে।'

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : তৃতীয় ভাগ—অষ্টম খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ

দিয়েছে ...মদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও এই সিদ্ধাবস্থার কথা বলা হয়েছে।

পরমা ...সুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।' এই অবস্থায় সাধারণ নিয়মেই

জীবে প্রেম আছে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব তাই আচণ্ডালে কোল দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব পদকর্তার ভাষায় 'তিনি অবিরত প্রেমরতনফলবিতরণে অখিলমনোরথ-পুর', প্রেমরূপ রত্নফল দিয়ে ব্রহ্মাণ্ডবাসীর মনোবাঞ্ছা তিনি পূর্ণ করেছেন। কিন্তু অন্তর্দশায় চৈতন্যদেব চিদানন্দে বিভোর, তাঁর অঙ্গে অষ্ট সাত্ত্বিক ভাববিকার স্ফুরিত, বৈষ্ণব মহাজনের ভাষায় 'বিপুল-পুলককুল-আকুল-কলেবর গরগর অন্তর প্রেমভরে' অর্থাৎ অঙ্গে তাঁর পুলক। অন্তরে কৃষ্ণপ্রেমের বন্যা।

অতএব আত্মরতির প্রকাশদ্বৈবিধ্যে সিদ্ধ সাধক ও সদাশিবের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

অন্য দিক দিয়েও সাধক ও শিবের একাত্মতা অনুভব করা যায়। শিব যোগীর আদর্শ যোগীশ্বর, 'মহাদেব মহাত্রাণ মহাযোগী মহেশ্বর'। তাই বলে তিনি ভোগবিরহিত নন। শক্ত্যুপহিত হয়ে তিনি জগৎ-প্রপঞ্চ সৃষ্টি করে তো ভোগ করছেন। ঊর্ণনাভ যেমন স্বশরীর-নিঃসৃত রস থেকে জাল তৈরি করে ও ঐ জাল আশ্রয় করে বিরাজ করে, সদাশিবও তেমনি স্বস্বরূপা শক্তি অবলম্বনে একাধারে জগৎ-প্রপঞ্চের স্রষ্টা ও ভোক্তা।

যোগ ও ভোগ

শিবের তন্ত্রোক্ত যোগ ও ভোগের অধীশ্বরত্ব শাক্ত কবির লেখনীতে অন্যত্র গিরিরাজের প্রতি মেনকার উক্তিতে পরম ইঙ্গিতময়তায় রূপায়িত হয়েছে :

'সুখে রাখিতে সংসার, উমা প্রতি দিয়া ভার,
সার করি যোগাচার, শিব নাকি আছেন শ্মশানে।'

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : ক. বি. শা. প.—আগমনী, প্রথম স্তবক

এইভাবে শিবের যোগীরূপ চিত্রিত করে পর পংক্তিতে শিববৈভব শক্তির আশ্রয়ে জগৎ-প্রপঞ্চের সৃষ্টির মাধ্যমে শিবের ভোগীরূপও ব্যঞ্জিত হয়েছে :

'যোগাচারী হেরে হরে, সকলেতে যোগ করে,
শিবের বৈভব হরে লয়ে গেছে স্থানে স্থানে,
ঐ দেখ শশী গগনমণ্ডলে, সুরধুনী ধরাতলে,
ফণিগণ গেছে পাতালে, অনল নিবিড় বনে।'

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : ক. বি. শা. প.—আগমনী, প্রথম স্তবক

শিবের বৈভব অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি মহত্তত্ত্বাদিভূতান্ত জীবজগতে পরিণত হয়েছে, অথচ শিব জগদ্ব্যতিরিক্ত সত্তা জগৎ-প্রপঞ্চের ভোক্তা।

অতএব শিবের দুই-ই আছে,—যোগও আছে ভোগও আছে। যোগ ও ভোগকে তিনি সমান নির্ব্বিকারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন।

শিবের মানুষী লীলার শাক্ত কবি-বর্ণিত চিত্রটি আলোচনা করলে আমরা এই বিষয়েও সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক ও সদাশিবের মধ্যে একাত্মতা অনুভব করতে পারব।

কৈলাসেশ্বর উমাপতি যে দৈন্যদশায় শ্মশানে বাস করেন, তা জনশ্রুতিমাত্র। মেনকার প্রতি উমার উক্তিতে শিবের ঐশ্বর্য্য-বর্ণনা শাক্ত কবির লেখনীর মাধ্যমে পাঠকের কাছে এইরূপে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে :

'ছিলাম ভাল জননি গো হরেরি ঘরে।
কে বলে জামাই তব শ্মশানেতে বাস করে॥
যে ঘরেতে বাস করি, বর্ণিতে নারি মাধুরী।
নীলকান্ত আদি করি, কত রত্ন শোভা করে॥'
—অম্বিকাচরণ গুপ্ত : ক. বি. শা. প.—আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক

শুধু তাই নয়, শঙ্কর যে কাশীধামে রাজরাজেশ্বর ও উমা যে অন্নপূর্ণা সেই আনন্দ সমাচারে উল্লাস মেনকার মাতৃহৃদয়কে গর্ব্বে আলোড়িত করে তুলেছে :

'এলি গো কৈলাসেশ্বরী আমার অন্নপূর্ণ।
তুই নাকি মা কাশীধামে জীবকে বিলাস অন্ন।
গিরি বলছেন আসি,
মোক্ষময়ী শিবের কাশী,
কাশীর গতি উমাশশী, নাই নাকি মা তোমা ভিন্ন।'
—রসিকচন্দ্র রায় : ক. বি. শা. প.—আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক

শিবের এই ভোগীরূপের পাশেই আছে তাঁর যোগীরূপ। বিষয়ভোগী হ'লেও তিনি মহাযোগী।

'ভালমন্দ নাহি চায়, সুখ দুঃখ ঠেলে পায়,
ধুতুরার ফল খায় অমৃত সমান॥

শ্রীফল পাইলে হায়, আর তারে কেবা পায়,
মহানন্দে নাচে গায়, বাজায়ে বিষাণ ॥'

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত : ক. বি. শা. প.—আগমনী, প্রথম স্তবক

শিব ভোগী হয়েও যোগী, আবার যোগী হয়েও ভোগী। এই দিক থেকে সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক ও সদাশিবে কোন ভেদ নাই। সিদ্ধিপ্রাপ্ত সাধক একাধারে যোগী ও ভোগী। প্রচলিত নিয়মে যে-স্থলে ভোগ সে-স্থলে যোগ নাই, যেখানে যোগ সেখানে ভোগ থাকতে পারে না। কিন্তু তন্ত্রোক্ত সিদ্ধ সাধকের ক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

'যত্রাস্তি ভোগবাহুল্যং তত্র যোগস্য কা কথা।
যোগেঽপি ভোগবিরহঃ কৌলস্তুভয়মশ্নুতে ॥'

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র : চতুর্থোল্লাস—৩৯ শ্লোক

যেখানে ভোগের অস্তিত্ব সেখানে যোগ সম্ভব নয়, যোগপরায়ণ ব্যক্তিও ভোগ করতে পারেন না, কুলাচারী সাধক কিন্তু যুগপৎ যোগ ও ভোগ উভয়কেই আশ্রয় করতে পারেন।

কৌল অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত মার্গের সিদ্ধপুরুষের বীরাচারে এই যোগ ও ভোগের বিস্ময়কর সম্মিলন তন্ত্রে সুস্পষ্টরূপে বিবৃত হয়েছে :

'বামে বামা রমণকুশলা দক্ষিণে পানপাত্র
মগ্রে ন্যস্তং মরিচসহিতশূকরস্যোষ্ণমাংসম্।
স্কন্ধে বীণা ললিতসুভগা সদ্‌গুরূণাং প্রপঞ্চঃ
কৌলো ধর্ম্মঃ পরগো গহনো যোগিনামপ্যগম্যঃ ॥'

—কুলার্ণবতন্ত্র : আনন্দস্তোত্র

বামভাগে রমণদক্ষা নারী, দক্ষিণে সুরাপাত্র, সম্মুখে মরিচসহযোগে সদ্য পক্ক মাংস, স্কন্ধে মধুরনাদিনী বীণা, সমীপে সদ্‌গুরুদের সংঘ—এইরূপ পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত কুলাচারমূলক ধর্ম্ম অতি দুরূহই, যোগীদেরও অপ্রাপ্য।

মেনকার বাৎসল্য প্রেম ও উমার রূপবৈচিত্র্য

মেনকা বাৎসল্য প্রেমের সাধিকা। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বাৎসল্য প্রেমকে বলেছেন 'এহোত্তম' অর্থাৎ ইহাই অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই ভাবের উদয় হওয়ার পর আত্মসম্বন্ধীয় সমস্ত চিন্তার নিরসন হয় এবং ইষ্টসুখসাধনচিন্তাই এক ও অদ্বিতীয় রূপে সাধকের চিত্তে বিরাজিত থাকে। এই বিশুদ্ধ ইষ্টসুখসাধনচিন্তাপরায়ণতা সখ্য,

বাৎসল্য ও কান্তাভাবেই সম্ভব। এখানে নন্দরাণী যশোমতীর সঙ্গে গিরিরাণী মেনকার কোন পার্থক্য নাই।

যশোমতীর পরতত্ত্বের গর্ভধারিণীত্বের কথা লক্ষ্য করে শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতকে বলছেন :

'নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥'

—শ্রীমদ্‌ভাগবত ১০।৯।২০

গোপী যশোমতী মুক্তিপ্রদ শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে যে অনুগ্রহ পেয়েছিলেন, তা কৃষ্ণপুত্র বিরিঞ্চ বা কৃষ্ণমিত্র মহাদেব বা কৃষ্ণপ্রিয়া লক্ষ্মীও পান নাই। অর্থাৎ কৃষ্ণ যশোমতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তাঁকে অশেষ অনুগ্রহে ধন্য করেছেন।

জগজ্জননীও সেরূপ কন্যা উমারূপে আবির্ভূতা হয়ে গিরিরাণী মেনকাকে মাতৃত্বপদে বরণ করে অশেষ সৌভাগ্যে ভূষিত করেছেন।

'জগতের মা, মা বলিস মা
এর চেয়ে কি ভাগ্য উমা,
আমার মত কার আছে মা, কপাল প্রসন্ন।'

—রসিকচন্দ্র রায় : ক. বি. শা. প.—আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক

কিন্তু জগতের মা মেনকাকে মা বললেও তাঁকে আবার নানা রূপ দেখিয়ে বিভ্রান্ত করতে ক্ষান্ত হন নাই। কারণ জগজ্জননীই তো মহামায়া। শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণীর রচয়িতা মহামায়া শব্দের অর্থ এইরূপে নির্ণীত করেছেন :

'মহতী চাসৌ মায়া চেতি মহামায়া।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিনাং মোহজনকত্বাৎ মহামায়া।'

এই মহামায়ার দুই রূপ। এক রূপে তিনি জীবকে সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ করেন, তখন তিনি অবিদ্যা। অন্য রূপে তিনি জীবকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্তি দেন, তখন তিনি বিদ্যারূপিণী। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীতে উক্ত হয়েছে :

'সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী॥'

সেই নিত্যা পরা বিদ্যা মোক্ষের কারণ, আবার সেই বিদ্যাই সংসার সংঘটন করে থাকেন, একমাত্র তিনিই সর্ব্ব ঈশ্বরের প্রধানা।

উমারূপিণী জগজ্জননী মেনকাকে মাতৃত্বে বরণ করে তাঁকে অবিদ্যা মায়ায় বদ্ধ করেছেন, আবার তাঁর কাছে স্বীয় রূপবৈচিত্র্য প্রকাশিত করে তাঁকে বিদ্যামায়ার সাহায্যে বন্ধনমুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাই মেনকার কাছে জগজ্জননী কখনো কন্যা উমা, কখনো শবাসনা কালী, কখনো বা দশভুজা দুর্গা।

এই দিক দিয়েও শক্তিলীলা ও কৃষ্ণলীলার মধ্যে গভীর ঐক্য পরিলক্ষিত হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে কথিত আছে যে, একদা মৃত্তিকাভক্ষণরত বালগোপালের মুখ থেকে মৃত্তিকা-নিষ্কাশনরতা স্নেহব্যাকুলা যশোমতীর চোখে ধরা পড়েছিল বালগোপালের বিরাট ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বিশ্বরূপ। কিন্তু গর্ভধারিণীকে বিরাট রূপ দেখাবার পরক্ষণেই কৃষ্ণ তাঁকে দেখান শান্ত বালগোপালরূপ। এই প্রসঙ্গে পুণ্যশ্লোক শ্রীমদ্‌ভাগবতকার স্বকীয় অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন :

'ব্যতনোৎ বৈষ্ণবীং মায়াং পুত্রস্নেহময়ীং বিভুঃ।'

শ্রীহরি সন্তানবাৎসল্যরূপ বিষ্ণুমায়াকে বিস্তৃত করলেন।

পুত্রস্নেহময়ী বৈষ্ণবী মায়াই অবিদ্যামায়া। এই অবিদ্যামায়ার প্রভাবেই মেনকার চিত্তে বিদ্যামায়ার ক্রিয়াশীলতা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। তাই বিদ্যামায়ার প্রভাবে কন্যা উমার শবাসনা কালীরূপ বা দশভুজা দুর্গারূপ সাময়িকভাবে প্রত্যক্ষ করলেও, পরক্ষণেই অবিদ্যামায়ার উদ্ভবজনিত বাৎসল্যপ্রভাবে ঐ ঐ রূপ সম্বন্ধে মেনকার স্থিরবিশ্বাস উদিত হ'তে পারে নাই।

জননী মেনকার উপর বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়ার যুগপৎ কার্য্যকারিতা শাক্ত কবির লেখনীতে তন্ত্রাচার্য্যদের প্রদর্শিত তত্ত্বমার্গ অনুসরণ করেই অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

মেনকা স্বপ্নে বিদ্যামায়ার প্রভাবে উমার শবাসনা কালীরূপ ও রণরঙ্গিণী সিংহবাহিনীরূপ প্রত্যক্ষ করে বলেছেন :

'কুস্বপন দেখেছি গিরি, উমা আমার শ্মশানবাসী।
অসিতবরণা উমা, মুখে অট্ট অট্ট হাসি।
এলোকেশী বিবসনা, উমা আমার শবাসনা।
ঘোরাননা ত্রিনয়না, ভালে শোভে বালশশী।

যোগিনী দল সঙ্গিনী, ভ্রমিছে সিংহবাহিনী,
হেরিয়া রণরঙ্গিণী, মনে বড় ভয় বাসি।'

—গিরিশচন্দ্র ঃ ক. বি. শা. প.—আগমনী, প্রথম স্তবক

এখানে কনকচম্পকদামা অতসীকুসুমোপমা উমা হরগৃহিণী হ'লেও হর-গৃহচারিণী নন, তিনি শ্মশানবাসী, তন্ত্রের ধ্যানের ভাষায় শ্মশানালয়বাসিনী। তাঁর অতসীবর্ণ অসিতবর্ণে পরিণত হয়েছে, তাই তিনি মহামেঘপ্রভা শ্যামা। তাঁর মুখে সংহারের বার্ত্তাবহ অট্টহাস্য, তিনি তন্ত্রোক্ত উগ্রতারার ধ্যানের ভাষায় ঘোরাট্টহাসা। এখন আর উমার নীলালকমধ্যে নবকর্ণিকার শোভা পায় না, এখন তিনি এলোকেশী, ধ্যানবর্ণিতা 'মুক্তালম্বিকচোচ্চয়া' বিমুক্তকেশনিচয়া দেবী কালিকা। তিনি তরুণারুণবর্ণবসনপরিহিতা নন, তিনি দিগম্বরী শ্যামা। তাঁর আসন শবরূপ শিব, তিনি সাধকের ধ্যানের ভাষায় 'শবরূপমহাদেব-হৃদয়োপরি সংস্থিতা', সদাশিবমহাপ্রেতপদ্মাসনই তো শ্যামাজননীর পীঠ। তিনি করালাস্যা, তাঁর তিনটি নয়ন—চন্দ্র, সূর্য্য আর হুতাশন। অমৃতত্ত্বের দ্যোতক শশিচিহ্ন তাঁর ললাটে, মহানির্ব্বাণতন্ত্রকারের ধ্যান অনুযায়ী তিনি 'মেঘাঙ্গী শশিশেখরা ত্রিনয়না'।

জননী মেনকার স্বপ্নে উমার শ্যামারূপের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে উমার সিংহবাহিনীরূপ। উমা যেন চৌষট্টি যোগিনীর সঙ্গে সিংহারূঢ়া হয়ে রণে প্রবৃত্তা। এই বর্ণনা মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীবিবৃত মহিষমর্দ্দিনী বা শুম্ভ-নিশুম্ভনাশিনী মহাশক্তিকে লক্ষ্য করে রচিত হয়েছে।

চণ্ডীতে পাওয়া যায় যে, অসুরাধিপ মহিষাসুর ও দেবরাজ ইন্দ্রের মধ্যে একশতবর্ষব্যাপী যুদ্ধে মহিষাসুর ইন্দ্রকে পরাজিত করে ইন্দ্রত্ব গ্রহণ করেন। তখন পরাজিত নৈরাশ্যপীড়িত দেবগণ পদ্মযোনি প্রজাপতিকে অগ্রণী করে শিব ও বিষ্ণুর নিকট গমন করেন এবং তাঁদিগে নিজেদের চরম দুর্দ্দশার কথা বিবৃত করেন। কিভাবে সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, অনিল, ইন্দু, বরুণ ও অন্য সকলের অধিকারে মহিষাসুর নিজেই অধিষ্ঠিত রয়েছে এবং কিভাবে স্বর্গচ্যুত দেবগণ পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের মতো হীনাবস্থায় বিচরণ করছেন—আনুপূর্ব্বিক এই সব ঘটনা দেবগণ শিব ও বিষ্ণুকে নিবেদন করে মহিষাসুরের বধোপায় চিন্তা করতে তাঁদিগে

অনুরোধ করলেন। তখন কিভাবে বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব ও অন্যান্য দেবগণের তেজ থেকে মহাশক্তির উদ্ভব হ'ল, তার বিবৃতি প্রসঙ্গে মেধা ঋষি বলছেন :

'ইত্থং নিশম্য দেবানাং বচাংসি মধুসূদনঃ।
চকার কোপং শম্ভুশ্চ ভ্রূকুটীকুটিলাননৌ॥
ততোঽতিকোপপূর্ণস্য চক্রিণো বদনাৎ ততঃ।
নিশ্চক্রাম মহৎ তেজো ব্রহ্মণঃ শঙ্করস্য চ॥
অন্যেষাঞ্চৈব দেবানাং শক্রাদীনাং শরীরতঃ।
নির্গতং সুমহৎ তেজস্তচ্চৈক্যং সমগচ্ছত॥
অতীব তেজসঃ কূটং জ্বলন্তমিব পর্ব্বতম্।
দদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্যাপ্তদিগন্তরম্॥
অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্ব্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী : মধ্যম চরিত্র—দ্বিতীয় অধ্যায়, ৯—১৩ শ্লোক

ব্রহ্মা প্রমুখ দেবগণের এই কথা শুনে বিষ্ণু ও মহাদেব অতীব কুপিত হলেন এবং তাঁদের মুখ ভ্রূকুঞ্চনের ফলে ভীষণাকার ধারণ করলো। তখন অতিশয় কুপিত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শঙ্করের মুখ থেকে মহৎ দীপ্তি নিঃসৃত হ'ল। ইন্দ্রাদি অন্য দেবগণের দেহ থেকেও বিপুল তেজোরাশি বিচ্ছুরিত হয়ে উক্ত দীপ্তি-মণ্ডলের সঙ্গে মিলিত হ'ল। তখন চতুর্দ্দিকে প্রভাবিচ্ছুরণকারী সেই বিপুল তেজঃসম্ভারকে দেবগণ প্রজ্বলিত পর্ব্বতের মতো প্রত্যক্ষ করলেন। তখন সকল দেবশরীর থেকে উৎপন্ন ত্রিলোকব্যাপী সেই অনুপম তেজঃপিণ্ড সংহত হয়ে এক নারী মূর্ত্তির সৃষ্টি করলো।

নারীরূপধারিণী সেই মহাশক্তিকে সমস্ত দেবতা আয়ুধ ও অন্যান্য উপকরণ প্রদান করলেন। দেবীবাহন মহাসিংহ গিরিরাজ হিমালয়-দত্ত অন্যতম উপহারমাত্র।

'হিমবান্ বাহনং সিংহং রত্নানি বিবিধানি চ।
দদাবশূন্যং সুরয়া পানপাত্রং ধনাধিপঃ॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী : ২৯-৩০ শ্লোক

গিরিরাজ হিমালয় সেই মহিমান্বিতা নারীকে বাহন সিংহ ও বিবিধ রত্ন এবং কুবের তাঁকে সদাসুরাপূর্ণ একটি পানপাত্র দান করলেন।

এইভাবে সুসজ্জিতা হয়ে নারীরূপা মহাশক্তি মহিষাসুরের সঙ্গে সমরে প্রবৃত্ত হলেন। কিন্তু এই রণরঙ্গিণী শক্তি যোগিনীদলসঙ্গিনী কিনা, সে সম্বন্ধে কোন উল্লেখ শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহিষাসুরবধ-বর্ণনায় পাওয়া যায় না। তবে দেবী কৌশিকী কর্তৃক অসুরসৈন্যনিধন-বর্ণনায় এইরূপ কথিত হয়েছে :

'ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণূনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী : উত্তর চরিত্র—অষ্টম অধ্যায়, ১৩ শ্লোক

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতাদের শক্তি তাঁদের শরীর থেকে নির্গত হয়ে সেই সেই দেবতাদের অনুরূপ দেবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে চণ্ডিকাদেবীর সমীপে গমন করলেন। এই শক্তিময়ী দেবীসমূহের মধ্যে হংসযুক্তবিমানে আরূঢ়া, জপমালা ও কমণ্ডলুধারিণী ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মাণী, বৃষারূঢ়া ত্রিশূলধারিণী ললাটে অর্দ্ধ-চন্দ্রবিশিষ্টা শিবশক্তি মাহেশ্বরী, ময়ূরাসনা কার্ত্তিকেয়-শক্তি কৌমারী, গরুড়াসনা শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গখড়্গধারিণী বিষ্ণুশক্তি বৈষ্ণবী, শ্রীহরির যজ্ঞবরাহমূর্ত্তিধারিণী অপরা বিষ্ণুশক্তি বারাহী, কেশরকম্পনে নক্ষত্রপুঞ্জ-কম্পনকারিণী নরসিংহাবতারের সদৃশবপুধারিণী তৃতীয়া বিষ্ণুশক্তি নারসিংহী এবং গজরাজে সংস্থিতা বজ্রহস্তা সহস্রনয়না ইন্দ্রশক্তি ঐন্দ্রী—এই সপ্ত শক্তির উল্লেখ দেখা যায়। এই দৈবী শক্তিসমূহে পরিবেষ্টিত হয়ে মহাদেব চণ্ডিকাকে বললেন, 'আমার প্রতি প্রীতিবশতঃ শীঘ্রই আপনি অসুরদিগে হত্যা করুন।' এইভাবেই শক্তিপরিবৃতা কৌশিকীদেবী শুম্ভ-নিশুম্ভের সৈন্যদের সঙ্গে মহারণে প্রবৃত্ত হলেন।

শুধু স্বপ্নে নয়, জাগ্রদ্দশাতেও এই বিশ্বমায়ার প্রভাব থেকে মেনকার নিস্তার নাই। স্বপ্ন-সংস্কারের ক্ষীণ সূত্র আলম্বনে কালীরূপ ও মহিষমর্দ্দিনীরূপ মেনকার জাগ্রদ্দশাতে উদ্ভূত হয়েছে। এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। কারণ মেনকা যে রাণী যশোমতীর মতো বাৎসল্য রসের উপাসিকা। স্বপ্ন ও জাগরণ কোন অবস্থাতেই ইষ্টস্মরণের বিরাম নাই। তিনি মহামায়াকে কন্যারূপে ভাবনা করছেন। প্রীতা মহামায়া তাই তাঁর কাছে আপন গূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটিত করছেন।

পিত্রালয়ে পদার্পণ করেই উমা শবাসনা কালীরূপের রহস্য-সম্ভার মা মেনকার নিকটে উন্মুক্ত করছেন। শাক্ত কবি বনোয়ারীলাল রায় কালীরূপ দর্শনে বিহ্বলা মেনকার বিস্ময়াবিষ্ট মনোভাব এইরূপে ফুটিয়ে তুলেছেন।

'লোলজিহ্বা শবাসনা, শব কর্ণে সুশোভনা,
ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না, মেঘবরণা—
বামা বাম দ্বিকরে নৃমুণ্ড কৃপাণ ধরে,
বরাভয় দান করে, দক্ষিণ করে যতনে।'

—ক. বি. শা. প.ঃ আগমনী, প্রথম স্তবক

উমা এখন ইন্দুনিভাননী দ্বিভুজা বালিকা নয়, উমা এখন লোলরসনা চতুর্ভুজা কালী। কালীর সংহর্ত্রী রূপ সম্বন্ধে মহানির্ব্বাণতন্ত্রে এরূপ উক্ত আছেঃ

'তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা॥
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাৎ আদ্যা কালীতি গীয়তে॥'

—মহানির্ব্বাণতন্ত্রঃ চতুর্থ উল্লাস, ৩০—৩২ শ্লোক

শ্রীসদাশিব শ্রীদেবীকে বলছেন, 'জগতের ধ্বংসকারক মহাকাল তোমারই রূপ। মহাপ্রলয়ের সময়ে মহাকাল সকল চেতনাচেতন পদার্থকেই গ্রাস করবেন। সর্ব্বভূতকে কলন অর্থাৎ গ্রাস করেন বলেই তাঁর নাম মহাকাল। তুমি মহাকালকে গ্রাস কর, এই হেতু তোমার নাম কালী; পদার্থ সৃষ্টির প্রাক্কালে অস্তিত্বের জন্য তোমাকে আদ্যা কালী নামে অভিহিত করা হয়।'

কালীর লোলজিহ্বা শক্তির এই সংহাররূপের দ্যোতক। সর্ব্বসংহারক কাল যে কালীর দন্তস্বরূপ অর্থাৎ কালরূপ দন্তসহযোগেই যে কালী সর্ব্ব সৃষ্ট পদার্থকে সংহারসময়ে চর্ব্বণ করেন, এইরূপ উক্তি মহানির্ব্বাণতন্ত্রের অন্যত্রও পাওয়া যায়।

'গ্রসনাৎ সর্ব্বসত্ত্বানাং কালদন্তেন চর্ব্বণাৎ।
তদ্রক্তসংঘো দেবেশ্যা বাসোরূপেণ ভাবিতম্॥'

—মহানির্ব্বাণতন্ত্রঃ ত্রয়োদশ উল্লাস, ৯ শ্লোক

কালী প্রলয়সময়ে সর্ব্বপ্রাণীকে গ্রাস ও কালরূপ দন্তে চর্ব্বণ করেন বলে প্রাণীদের রুধির-সংঘাতই সেই দেবেশ্বরী কালীর রক্তবস্ত্র—এইরূপ বলা হ'য়ে থাকে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও দেখা যায় যে, অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শনসময়ে সমস্ত যোদ্ধসংঘকে বিশ্বব্যাপী ঈশ্বরের করালদন্তবিশিষ্ট বক্ত্রমধ্যে প্রবেশ করতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

'অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ॥
বক্ত্রাণি তে তরমাণা বিশন্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ॥'

—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা : একাদশ অধ্যায়, ২৬-২৭ শ্লোক

ঐ সব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সমস্ত রাজসম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়ে এবং ভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ, আমাদের পক্ষীয় যোদ্ধপ্রধানগণসহযোগে তোমার করালদন্তবিশিষ্ট ভয়ানক মুখবিবরগুলির মধ্যে প্রবেশ করছে। কেউ কেউ চূর্ণিত-মস্তক অবস্থায় দন্তসন্ধির অন্তরালবর্ত্তী স্থানসমূহে যে বিলগ্ন রয়েছে, তাও পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কালী শবাসনা। পূর্ব্বে বলা হয়েছে যে, শব হচ্ছেন সদাশিব, যিনি কালীর মহাপ্রেত-পদ্মাসন। শুধু কালী কেন, তারার পদতলেও শবরূপী শিব বিরাজিত। তারাকে ধ্যানের ভাষায় বলা হয় 'প্রত্যালীঢ়পদার্পিতাঙ্ঘ্রিশবহৃদ্', যিনি শবরূপী শিবের বুকের উপর বাম পদকে পুরোবর্ত্তী ও দক্ষিণ পদকে পশ্চাদ্বর্ত্তী করে অবস্থিতা। শিবকে শবরূপে চিত্রিত করার তাৎপর্য্য শিবশক্তির মধ্যে শক্তির প্রাধান্য সূচনা। আনন্দলহরী গ্রন্থের আদিশ্লোকে শঙ্করাচার্য্য এইরূপ উক্তি করেছেন :

'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তো প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।' ইত্যাদি

—আনন্দলহরী : প্রথম স্তবক

শিব যদি শক্তির সহিত যুক্ত হন, তবেই তিনি জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম, নচেৎ অর্থাৎ যদি শক্তির সহিত যুক্ত না হন, তবে তিনি সামান্য স্পন্দন-চলন ক্রিয়াতেও অসমর্থ হন।

কালী শব কর্ণে সুশোভনা, অর্থাৎ তাঁর কর্ণে শবের অস্তিত্বহেতু তিনি মনোরম। শবের অস্তিত্বের সঙ্গে শোভনত্বের বিরোধ। তন্ত্রকার ধ্যানে শবকে মহাদেবীর কর্ণভূষণরূপে চিত্রিত করে এই বিরোধের অবসান ঘটিয়েছেন। মহাদেবী কালী 'কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকা'। তাঁর দুই কর্ণে দুটি শব দেহের সৌন্দর্য্য-বৃদ্ধিকারক অবতংস অলঙ্কারের কাজ করছে। তাই তিনি 'কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মা'। শব শিবের মতো নির্ব্বিকার ও বালকের মতো নিষ্কাম সাধকের প্রতীক। আবার তিনি ভয়ানক ভয়জনক, মহাদেবীর স্বরূপে একাধাবে অভয় ও ভয়, সৃষ্টি ও সংহার, মোক্ষ ও সংসার বীজাকারে বিধৃত।

কালীর ভালে চন্দ্র। তিনি ত্রিনয়না। মহানির্ব্বাণতন্ত্রকার এই ললাটস্থিত চন্দ্র ও তিনটি নয়নের গভীর তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

'নিত্যায়াঃ কালরূপায়াঃ অব্যয়ায়াঃ শিবাত্মনঃ।
অমৃতত্বাল্ললাটেঽস্যা শশিচিহ্নং নিরূপিতম্॥
শশিসূর্য্যাগ্নিভির্নেত্রৈরখিলং কালিকং জগৎ।
সম্পশ্যতি যতস্তস্মাৎ কল্পিতং নয়নত্রয়ম্॥'

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র : ত্রয়োদশ উল্লাস, ৭-৮ শ্লোক

তিনি সনাতনী, অর্থাৎ তাঁর আদি বা অন্ত নাই এবং তিনি একভাবে সতত সংস্থিতা। তিনি কালরূপিণী, তাঁর ক্ষয় নাই, তিনি শিবাত্মিকা ও কল্যাণময়ী। তার অমৃতময় স্বরূপের নির্দ্দেশক হিসাবে তাঁর ললাটে শশিকলা কল্পিত হয়েছে। তিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি এই তিনটি নেত্রে সমস্ত কালসম্ভূত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করছেন, এই হেতু যোগিগণ তাঁর তিনটি নয়ন কল্পনায় অঙ্কিত করেছেন।

কালীর ললাটস্থিত চন্দ্রের ষট্চক্রগত দৃষ্টিভঙ্গীতে অন্যবিধ ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। ষট্চক্রের বর্ণনানুযায়ী ভ্রূমধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্র চন্দ্রস্থান। এই আজ্ঞাচক্রের উপরে চন্দ্রমার নিত্যা পঞ্চদশ কলা বিদ্যমান। যোগী স্বদেহের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী মহাদেবীর দিব্যদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বর্ণনা দিয়েছেন।

কালীর অগ্নীষোমসূর্য্যাত্মক এই তিনটি নেত্র দ্বারা কালসম্ভূত জগৎ প্রত্যক্ষ করার বৃত্তান্তটিও গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। চন্দ্র বা সোম তিথিরূপ কালের এবং সূর্য্য অহোরাত্র কালের সম্পাদক। এই চন্দ্র-সূর্য্যের গতি অনুসারে যে দিবা, রাত্রি ও সন্ধ্যার সৃষ্টি হয়, সেই দিবা সূর্য্যস্বরূপ, রাত্রি চন্দ্রস্বরূপ এবং সন্ধ্যাত্রয়

অগ্নিস্থানীয়। এই চন্দ্র, সূর্য্য ও সন্ধ্যাদ্বয় দ্বারা নিষ্পন্ন কালই পরিদৃশ্যমান জগতের উৎপত্তি, বিদ্যমানতা, বিবৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই ষড়্ ভাববিকারের হেতু। অগ্নীষোমসূর্য্য-নিষ্পাদিত কালের মাধ্যমে জগতের নিয়ন্ত্রণেই মহাদেবীর অগ্নীষোমসূর্য্যাত্মক তিনটি নেত্রের কার্য্যকারিতা।

কালী মেঘবরণা, ধ্যানের ভাষায় মহামেঘপ্রভা। মেঘের বর্ণ কৃষ্ণ, কালী কৃষ্ণবর্ণা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রকার কালীর এই কৃষ্ণরূপের সুন্দর দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন :

'শ্বেতপীতাদিকো বর্ণো যথা কৃষ্ণে বিলীয়তে।
প্রবিশন্তি তথা কাল্যাং সর্ব্বভূতানি শৈলজে॥
অতস্তস্যাঃ কালশক্তে র্নিগুর্ণায়া নিরাকৃতেঃ।
হিতায়াঃ প্রাপ্তযোগানাং বর্ণঃ কৃষ্ণো নিরূপিতঃ॥'

—মহানির্ব্বাণতন্ত্রম্ : ত্রয়োদশ উল্লাস, ৫-৬ শ্লোক

শ্রীসদাশিব মহাদেবীকে বলছেন—হে গিরিকন্যে! শ্বেত, পীত ও অন্যান্য বর্ণ যেরূপ কৃষ্ণবর্ণে বিলীন হয়, সমুদয় পদার্থ সেইরূপ কালীতে বিলীন হয়ে থাকে। অতএব সেই গুণরহিতা নিরাকারা মঙ্গলময়ী কালশক্তির বর্ণকে যোগিগণ কৃষ্ণরূপে নির্ণীত করেছেন।

কালী দুটি বাম হস্তে নরমুণ্ড ও কৃপাণ এবং দুটি দক্ষিণ হস্তে বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করে আছেন। 'খড়্গমুণ্ডধরা কালী বরদাভয়ধারিণী' প্রকৃত তন্ত্রসম্মত মহাদেবীর রূপ। খড়্গমুণ্ডধারণ মহাদেবীর অশিবনাশনের প্রতীক। কর্পূরাদি স্তোত্রে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় :

'ঊর্দ্ধে বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্নমুণ্ডং তথাধঃ
সব্যে চাভীর্ব্বরঞ্চ ত্রিজগদঘহরে দক্ষিণে কালিকে চ।
জপ্ত্বৈতন্নাম যে বা তব মনুবিভবং ভাবয়ন্ত্যেতদম্ব
তেষামষ্টৌ করস্থাঃ প্রকটিতরদনে সিদ্ধয়স্ত্র্যম্বকস্য॥'

—কর্পূরাদিস্তোত্র, চতুর্থ শ্লোক

হে ত্রিজগতের পাপনাশিনি! হে প্রকাশিতদন্তে! হে জগজ্জননি! হে দক্ষিণে অর্থাৎ নির্ব্বাণদাত্রি! যে সাধকগণ তোমার মন্ত্রৈশ্বর্য্য প্রথম তিনটি শ্লোকে বর্ণিত কালীবীজ, তারাবীজ ও ত্রিপুরাবীজ এবং কালিকে এই নামাত্মক

ত্র্যক্ষর মন্ত্র জপ করে বামভাগে ঊর্দ্ধহস্তে ধৃত খড়্গ ও অধোহস্তে শোভিত ছিন্নমুণ্ড এবং দক্ষিণভাগে ঊর্দ্ধহস্তে অভয়মুদ্রা ও অধোহস্তে বরমুদ্রা ইত্যাদি প্রকার রূপবিশিষ্ট তোমাকে ভাবনা করেন, তাঁরা অনায়াসে মহাদেবের অষ্টসিদ্ধি লাভ করে থাকেন।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বিমলানন্দ স্বামী প্রভুপাদ এইরূপ মন্তব্য করেছেন: 'স্বীয়বামোর্দ্ধহস্তেন জ্ঞানখড়্গেন নিষ্কামসাধকানাং মোহপাশং ছিত্ত্বা তদধোহস্তেন বিগতরজং তত্ত্বজ্ঞানাধারং মস্তকং দধাসি, তথা দক্ষিণোর্দ্ধহস্তেন সকামসাধকেভ্য অভয়ং তথা তদধোহস্তেন চাভীষ্টবরঞ্চ দধাসি ইতি।' মহাদেবীর খড়্গ জ্ঞানের প্রতীক, তার দ্বারা তিনি সকল নিষ্কাম সাধকের মোহপাশ ছিন্ন করেন, মুণ্ড তত্ত্বজ্ঞান, যা মোহ দূরীভূত হবার পর নিষ্কাম সাধকগণ লাভ করে থাকেন, মহাদেবী দক্ষিণ হস্তদ্বয়ের সাহায্যে সকাম সাধকদিগে অভয় ও অভীষ্ট বর প্রদান করে থাকেন।

মহাদেবীর এই বরাভয়মুদ্রাদ্বয়ের ব্যাখ্যা অনুরূপভাবেই মহানির্ব্বাণতন্ত্রকার লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর মতে

'সময়ে সময়ে জীবরক্ষণং বিপদঃ শিবে।
প্রেরণং স্বস্বকার্য্যেষু বরশ্চাভয়মীরিতম্॥'

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র: ত্রয়োদশ উল্লাস, দশম শ্লোক

হে শিবানি! তুমি বিপদ্ থেকে যথাসময়ে জীবগণকে রক্ষা ও তাদের নিজ নিজ কাজে তাদিগে প্রবৃত্ত কর বলে কালীমূর্ত্তিতে তুমি বর ও অভয় মুদ্রা ধারণ করে থাক।

কিন্তু বিদ্যামায়া লীলা-জননী মেনকাকে মহাদেবীর শুধু 'খড়্গমুণ্ডাভিরামা ত্রাসত্রাণেষ্টদাত্রী' কালীরূপ দেখিয়েই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁকে মহাদেবীর রণরঙ্গিণী দনুজদলনী মূর্ত্তিও দেখিয়েছেন। তাই গিরিমহিষী মেনকা পিত্রালয়াগতা কন্যা উমার অথচ প্রকৃতপক্ষে জগজ্জননী মহাশক্তির বিদ্যামায়া-প্রভাবে বিহ্বলা হয়ে গিরিরাজ হিমালয়কে সভয়ে প্রশ্ন করছেন:

'ওহে মহারাজ, আজ কি হেরি নয়নে।
মুক্তকেশী কে ষোড়শী হুঙ্কারে নাচিছে রণে?'

—ক. বি. শা. প.: আগমনী—প্রথম স্তবক

রণরঙ্গিণী কালীর বৃত্তান্ত মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এইরূপ পাওয়া যায়। দৈত্য-সেনাপতি ধূম্রলোচন অম্বিকা কৌশিকী দেবী কর্তৃক নিহত এবং দেবীবাহন সিংহ দ্বারা যাবতীয় দৈত্যসৈন্য ক্ষয়িত হয়েছে শ্রবণ করে দৈত্যাধিপতি শুম্ভ অতীব কুপিত হলেন এবং তাঁর অনুচর চণ্ড-মুণ্ড নামক দুই অসুরকে অম্বিকাকে কেশাকর্ষণ করে বদ্ধাবস্থায় তাঁর কাছে আনয়ন করতে আদেশ করলেন। তখন চণ্ড-মুণ্ড হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক সৈন্যযুক্ত হয়ে বিবিধ অস্ত্র উত্তোলন করে অম্বিকার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেই দৈত্যগণ হিমালয়শৃঙ্গে সিংহবাহিনী ঈষৎ হাস্যবদনা অম্বিকাকে দর্শন করে তাঁকে ধরার উদ্দেশ্যে উদ্যতাস্ত্র হয়ে তাঁর সমীপবর্তী হ'ল। তখন কিরূপে কুপিত অম্বিকাদেবীর ললাটফলক থেকে কালীর আবির্ভাব হ'ল তার বর্ণনা-প্রসঙ্গে মেধা ঋষি বলছেন:

'ততঃ কোপঞ্চকারোচ্চৈরম্বিকা তানরীন্ প্রতি।
কোপেন চাস্যা বদনং মসীবর্ণমভূৎ তদা॥
ভ্রূকুটী-কুটিলাং তস্যা ললাটফলকাদ্দ্রুতম্।
কালী করালবদনা বিনিষ্ক্রান্তাসিপাশিনী॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী: উত্তম চরিত্র—সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোক

সেই সময় অম্বিকাদেবী সেই শত্রুগণের প্রতি ক্রোধান্বিত হলেন। তখন তাঁর মুখমণ্ডল ক্রোধে মসীবর্ণ ধারণ করলো। তাঁর ভ্রূকুটী-কুটিল ললাটফলক থেকে শীঘ্র ভীষণবদনা খড়্গপাশধারিণী কালীদেবী বিনিঃসৃতা হলেন।

এই কালীর বর্ণনা মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এইরূপ পাওয়া যায়:

'বিচিত্রখট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা।
দ্বীপিচর্ম্মপরিধানা শুষ্কমাংসাতিভৈরবা॥
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনভীষণা।
নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্মুখা॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী: উত্তম চরিত্র—সপ্তম অধ্যায়, সপ্তম ও অষ্টম শ্লোক

অম্বিকাদেবীর ললাটোদ্ভূতা কালী হস্তে বিচিত্র অর্থাৎ নানা আকৃতির খট্বাঙ্গ বা নরকঙ্কাল ধারণ করে আছেন। তাঁর গলদেশে নরমুণ্ডমালা। তাঁর পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তাঁর দেহে অস্থিচর্ম্ম ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি

অতিভীষণা। তাঁর মুখবিবর অতিশয় বিস্তৃত। তিনি লোলজিহ্বা অতএব ভয়ঙ্করী। তাঁর চক্ষু ঈষৎ রক্ত ও কোটরগত। তিনি বিকট শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করছেন।

কিন্তু এই কালী, যিনি চণ্ড ও মুণ্ড উভয়ের ছিন্নমুণ্ড ধারণ করার জন্য চামুণ্ডা নামে অভিহিতা হয়েছেন, তিনি মুক্তকেশী যোড়শী কি না সে সম্বন্ধে কোন উক্তি শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পাওয়া যায় না। যোড়শী শব্দটি দেবীর বয়ঃতারুণ্যের দ্যোতক, শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরসুন্দরীর বাচক নয়। কবি মহাদেবী দক্ষিণা-কালিকার মুক্তালম্বিকচোচ্চয়া রূপটিকে সম্মুখে রেখে মুক্তকেশী এই বিশেষণ প্রয়োগ করেছেন। কবি বনোয়ারীলালের মনে যে দক্ষিণাকালিকা দেবীর রূপ জাগরূক ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায়, উমাকে লক্ষ্য করে 'লোলজিহ্বা শবাসনা শব কর্ণে সুশোভনা' ইত্যাদি বিশেষণের প্রয়োগে। এই বিশেষণগুলির গভীর তাৎপর্য্য পূর্ব্বে আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এই কাব্যচিত্র থেকে আমাদের স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত এই যে, তন্ত্রোক্ত দক্ষিণাকালিকার রূপ ও মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডী-বর্ণিত রণরঙ্গিণী কালীর রূপ তাদের তত্ত্বগত ঐক্যের জন্য সাহিত্যে পরস্পর বিমিশ্রিত অবস্থায় স্থান পেয়েছে।

শাক্ত কবি এই জাতীয় আগমনীর পদে আপনাকে মেনকার স্থলাভিষিক্ত করে মহাদেবীর লীলারস অনুভব করেছেন। কবি এখানে প্রকৃত লীলাশুক। তাই তিনি গিরিরাণী মেনকার দৃষ্টিতে জগজ্জননীর রূপ, কখনো 'কালাভ্র-শ্যামলাঙ্গী বিগলিতচিকুরা খড়্গমুণ্ডাভিরামা' দক্ষিণাকালিকারূপ, কখনো বা 'নিমগ্নারক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা' রণরঙ্গিণী কালীরূপ প্রত্যক্ষ করেছেন। জগজ্জননীর বিদ্যা-মায়াশক্তির ক্রিয়াকারিত্ব লীলাস্বাদন-রসিকের দিব্যনেত্রে বিচিত্র রূপ-সম্ভারের স্ফুরণে। তাই বাৎসল্য-প্রেমমার্গের উপাসিকা ভক্তসাধিকা তথা মানুষী তনুধারণের সহায়িকা গিরিরাণী মেনকার কাছে অতসীকুসুমোপমা কৈলাসপ্রত্যাগতা হরমনোরমা উমা কখনো 'ভালে চন্দ্র ত্রিনয়না' মেঘবরণা শবাসনা দক্ষিণা কালী, কখনো বা যোগিনীদলসঙ্গিনী রণরঙ্গিণী মুক্তকেশী যোড়শী, কখনো বা দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা দুর্গা।

চতুর্ভুজা কালীরূপের দশভুজা দুর্গারূপে পরিণতিতে গিরিরাণী মেনকার জননী হৃদয়ের বিস্ময় রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পদে সুনিপুণ কাব্যাভিব্যক্তি লাভ

করেছে। কৈলাসপ্রত্যাগতা তনয়া উমার মধ্যে মেনকারাণী ফিরে পেতে চেয়েছিলেন তাঁর কনকচম্পকদামা অতসীকুসুমোপমা কুমারী উমাকে। কিন্তু জগজ্জননী উমা মেনকার বাৎসল্য রসের সাধনায় পরিতুষ্টা হয়ে বিদ্যামায়ার অবলম্বনে তাঁর দিব্যনেত্রে প্রকটিত করলেন স্বকীয় ঐশ্বর্য্যময় দশভুজারূপ। মেনকার সন্তানবৎসল অথচ সাধনা-পরিশুদ্ধ হৃদয়ে জাগল মাতৃহৃদয়ের সহজ উচ্ছ্বাস ও অঙ্কুরিত অধ্যাত্ম-চেতনার মধ্যে দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটলো কন্যা উমার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে সংশয়িত আত্ম-জিজ্ঞাসার অবসরে গিরিরাজের প্রতি কাতরোক্তিতে :

'গিরি, উমাপ্রসঙ্গে সঙ্গে আনিলা ঘরে কার মেয়ে।
সর্ব্বদেবতেজ দেহ, জটাজুট শিরোরুহ।
আমার উমা নহে এহ, দেখ দেখি মুখ চেয়ে।
কনকচম্পকদামা, অতসীকুসুমোপমা,
এই নাকি সেই উমা, সংশয় আমার।
উমা চতুর্ভুজা ছিল, দশভুজা কবে হইল,
হিমগিরি সত্য বল, কর ছল পতি হয়ে।
দেখি একি বিপরীত, পদে জম্ভাসুরসুত,
তারে করে অস্ত্রাঘাত উমা কি আমার।
আর এক চমৎকার, পদে মহাসিংহ তার,
সঙ্গে সুর পরিবার, এল দেবকন্যা লয়ে।
রক্তজবা বিল্বদলে, পূজে স্বর্গ মহীতলে,
তারে গিরিকন্যা বলে, ভাব চমৎকার।'

—রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য : ক. বি. শা প.—আগমনী, প্রথম স্তবক

এখন আত্মজা উমা মানুষী তনুধারিণী নয়, সর্ব্বদেবতেজোময়শরীরধারিণী। শ্রীশ্রীচণ্ডীর মতানুযায়ী, শম্ভুর তেজে মহাদেবীর মুখ, যমের তেজে তাঁর কেশপাশ, বিষ্ণুর তেজে তাঁর বাহুসমূহ, চন্দ্রের তেজে তাঁর স্তনযুগল, ইন্দ্রের তেজে তাঁর দেহের মধ্যভাগ, বরুণের তেজে তাঁর জংঘা ও উরুদ্বয়, পৃথিবীর তেজে তাঁর নিতম্ব, ব্রহ্মার তেজে তাঁর পদযুগল, সৌরতেজে তাঁর পদাঙ্গুলিসমূহ, অষ্টবসুর তেজে তাঁর করাঙ্গুলিসকল, কুবেরের তেজে তাঁর নাসিকা, দক্ষাদি প্রজাপতি-

গণের তেজে তাঁর দন্তসকল, বহ্নির তেজে তাঁর তিনটি নয়ন, দুই সন্ধ্যাদেবীর তেজে তাঁর ভ্রূযুগল এবং বায়ুর তেজে তাঁর কর্ণদ্বয় উৎপন্ন হ'ল। তাই মহাদেবী 'সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবা', সমস্ত দেবতাদের সম্মিলিত তেজঃপুঞ্জ থেকে তাঁর আবির্ভাব।

উমার কুন্তল এখন ভারতচন্দ্রের ভাষায় চামরছটা নয়, কুন্তল এখন জটাকুটিল। তাই উমা এখন জটাজুটসমাযুক্তা। এই কেশ-বর্ণনার দিক দিয়ে উগ্রতারা ও ত্রিপুরসুন্দরীর সঙ্গে গিরিকন্যা উমার সাম্য পরিলক্ষিত হয়। ধ্যানের ভাষায় উগ্রতারা 'পিঙ্গলজটাজুটৈকনাগৈর্যুতা' পিঙ্গলবর্ণের জটাকলাপ ও তদুপরি একটি নাগ ধারণ করে আছেন। শঙ্করাচার্য্যের আনন্দলহরীতে ত্রিপুরসুন্দরীর বাগ্‌দেবতা-রূপ বর্ণনায় উক্ত আছে যে, মহাদেবী 'শশিযুত-জটাজুট মুকুটাম্', তিনি চন্দ্রবিভূষিতজটাজুটরূপমুকুটধারিণী।

রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের লেখনীতে মেনকার কন্যা উমা সম্বন্ধে যে অনুভূতি রূপায়িত হয়েছে, তার আলোকে আমরা দেখি উমা চতুর্ভুজা। কিন্তু দাশরথি রায় উমার মানুষী মূর্ত্তিকে কালীমূর্ত্তির ছাঁচে ঢালাই করে উমাকে চতুর্ভুজা করেননি, তাঁকে দ্বিভুজাই রেখে দিয়েছেন। তাই গিরিরাজের গৃহ-প্রাঙ্গণে রণরঙ্গিণী মহিষমর্দ্দিনীকে স্থাপিত করে দাশরথি উমাজননী মেনকার মুখ দিয়ে গিরিরাজকে বলিয়েছেন :

'কৈ হে গিরি, কৈ সে আমার প্রাণের উমা নন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী ?
দ্বিভুজা বালিকা আমার উমা ইন্দুবদনী,
কক্ষে লয়ে গজানন, গমন গজগামিনী,—
মা বলে মা ডাকে মুখে আধ আধ বাণী।
এ যে করি অরিতে করি ভর, করে করিছে রিপু সংহার,
পদ ভরে টলে মহী মহিষনাশিনী।
প্রবলা প্রখরা মেয়ে, তনু কাঁপে দরশনে,
জ্ঞান হয় ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোকজননী ॥'

—দাশরথি রায় : ক. বি. শা. প.—আগমনী, প্রথম স্তবক

অসুরনাশিনী মহাদেবীকে রামচন্দ্র করেছেন দশভুজা, দাশরথি কিন্তু তাঁর ভুজসংখ্যা সম্বন্ধে কোন মন্তব্য সুকৌশলে এড়িয়ে গিয়েছেন। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে মহাদেবীর নানা ভুজবিশিষ্টা নানা মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্রের দেবতা মহাকালী। তাঁর এরূপ ধ্যান পাওয়া যায়:

'খড়্গং চক্রগদেষুচাপপরিঘান্ শূলং ভূশুণ্ডীং শিরঃ
দশভুজা মহাকালী — শঙ্খং সন্দধতীং করৈস্ত্রিনয়নাং সর্ব্বাঙ্গভূষাবৃতাম্।
নীলাশ্মদ্যুতিমাস্যপাদদশকাং সেবে মহাকালিকাম্
যামস্তৌচ্ছয়িতে হরৌ কমলজো হন্তুং মধুং কৈটভম্॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী: মহাকালীর ধ্যান

যিনি খড়্গ, চক্র, গদা, তীর, ধনু, লগুড, ভূশুণ্ডী, নরমুণ্ড ও শঙ্খ, দশ হস্তে ধারণ করে আছেন, যিনি তিনটি নয়নবিশিষ্টা, যাঁর সর্ব্বদেহ অলঙ্কারে আবৃত, যাঁর প্রভা নীলকান্তমণির প্রভাসদৃশ, যার দশটি মুখ ও চরণ, বিষ্ণু যোগনিদ্রাগত হ'লে মধু ও কৈটভ এই দুটি দৈত্যকে হত্যা করার জন্য পদ্মযোনি ব্রহ্মা যাঁর স্তব করেছিলেন—সেই মহাকালী দেবীর বন্দনা করি।

উপরি-উল্লিখিত বর্ণনা থেকে পরিলক্ষিত হবে যে, মহাকালী দশভুজা, যে দশটি ভুজে তিনি দশ প্রহরণ ধারণ করে আছেন। তিনি জগৎপতি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা, 'হরিনেত্রকৃতালয়া'। পদ্মযোনি ব্রহ্মাকে মধু ও কৈটভ যখন হত্যা করতে উদ্যত হয়, তখন ব্রহ্মা এই যোগনিদ্রা-স্বরূপিণী মহাকালীরই স্তব করেন। মহাকালীর কৃপাতেই বিষ্ণুর প্রবোধ সম্ভব হয়, মহাকালীর মায়া-প্রভাবেই বলোদ্ধত মধুকৈটভ বিষ্ণুর প্রতি উক্তি করে, 'বরোঽস্মত্তো ব্রিয়তামিতি' আমাদের নিকট বর প্রার্থনা করুন। বিষ্ণু তখন তাদিকে বলেন:

'ভবেতামদ্য মে তুষ্টৌ মম বধ্যাবুভাবপি।
কিমন্যেন বরেণাত্র এতাবদ্ধি বৃতং মম।'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী: প্রথম চরিত্র—প্রথম অধ্যায়, ৯৭-৯৮ শ্লোক

যদি তোমরা আমার যুদ্ধে পরিতুষ্ট হয়ে থাক তাহ'লে তোমরা দুজনেই আমার বধ্য হও, এই-ই আমার একান্ত অভিপ্রায়। এই বিষয়ে অন্য বরের প্রয়োজন কি?

তখন মহামায়া-বিমোহিত মধুকৈটভ বিষ্ণুকে এইরূপ বললো, 'আবাং জহি ন যত্রোর্বী সলিলেন পরিপ্লুতা', ভূভাগের যে স্থল জল-প্লাবিত হয় নাই তথায় আমাদের দুজনকে হত্যা করুন। তারপর বিষ্ণু অসুরদ্বয়ের মস্তক জংঘাদেশে রেখে সুদর্শনচক্র দ্বারাই তা ছেদন করলেন।

মধুকৈটভবধ বৃত্তান্ত থেকে জানা যায় যে, দশভূজে দশপ্রহরণধারিণী মহাকালী স্বকীয় মায়ার সাহায্যে বিষ্ণু-নিষ্পাদিত মধুকৈটভ বধ সংঘটিত করেন, তিনি নিজে রণরঙ্গিণী নন কিন্তু রণের সংঘটয়িত্রী।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যম চরিত্রের দেবতা মহালক্ষ্মী। মহালক্ষ্মীর ধ্যান এইরূপ পাওয়া যায়ঃ

অষ্টাদশভুজা মহালক্ষ্মী

'অক্ষস্রক্‌পরশুং গদেষুকুলিশং পদ্মং ধনুঃ কুণ্ডিকাং
দণ্ডং শক্তিমসিঞ্চ চর্ম্ম জলজং ঘণ্টাং সুরাভাজনম্।
শূলং পাশসুদর্শনে চ দধতীং হস্তৈঃ প্রবালপ্রভাম্
সেবে সৈরিভমর্দ্দিনীমিহ মহালক্ষ্মীং সরোজস্থিতাম্॥'

যিনি অষ্টাদশ হস্তে রুদ্রাক্ষের জপমালা, কুঠার, গদা, বাণ, বজ্র, পদ্ম, ধনু, কমণ্ডলু, দণ্ড, শক্তি, অসি, ঢাল, শঙ্খ, ঘণ্টা, সুরাপাত্র, শূল, পাশ ও সুদর্শনচক্র ধারণ করে আছেন—এখন আমি সেই প্রবালকান্তি মহিষাসুরনাশিনী পদ্মাসীনা মহালক্ষ্মী দেবীর ধ্যানযোগে সেবা করি।

এই ধ্যানের মধ্যমণি মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজা, 'সমস্তদেবানাং তেজোরাশিসমুদ্ভবা' সকল দেবগণের তেজসমূহ থেকে জাতা। কিরূপে মহিষাসুরের দ্বারা যুদ্ধে পরাভূত দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রণী করে বিষ্ণু ও শিবের নিকট গমন করেন ও তাঁদিকে মহিষাসুরের বধোপায় চিন্তা করতে অনুনয় করেন এবং কিভাবে মহাকুপিত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের মুখ ও অন্যান্য দেবগণের শরীর হ'তে তেজ নিঃসৃত হয়ে মহিষমর্দ্দিনী মহালক্ষ্মীর আবির্ভাব সম্ভব করলো শ্রীশ্রীচণ্ডী-বর্ণিত সে বৃত্তান্ত পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

ধ্যানে মহালক্ষ্মী অষ্টাদশভুজারূপে বর্ণিত হ'লেও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে তাঁর সহস্রভুজরূপও বিবৃত দেখতে পাওয়া যায়। সমস্ত দেবগণের তেজোরাশিসমুদ্ভবা মহাদেবী 'ননাদোচ্চৈঃ সাট্টহাসং মুহুর্মুহুঃ' পুনঃপুনঃ উচ্চহাস্যসহকারে উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করতে লাগলেন। তখন

'তস্যা নাদেন ঘোরেণ কৃৎস্নমাপূরিতং নভঃ।
অমায়তাতিমহতা প্রতিশব্দো মহানভূৎ॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী : মধ্যম চরিত্র—দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩২-৩৩ শ্লোক

তাঁর অপরিমিত অতি ভীষণ ঘোর গর্জ্জনে সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ হ'ল এবং ভয়াবহ প্রতিধ্বনি উত্থিত হ'ল।

এই গর্জ্জন ও প্রতিধ্বনি শুনে সসৈন্য মহিষাসুর কিভাবে সেই শব্দ অভিমুখে ধাবিত হ'ল ও সহস্রভুজা মহাদেবীকে দর্শন করলো, তার বর্ণনা এইরূপ পাওয়া যায় :

'আঃ কিমেতদিতি ক্রোধাদাভাষ্য মহিষাসুরঃ।
অভ্যধাবত তং শব্দমশেষৈরসুরৈর্বৃতঃ॥
স দদর্শ ততো দেবীং ব্যাপ্তলোকত্রয়াং ত্বিষা।
পাদাক্রান্ত্যা নতভুবং কিরীটোল্লিখিতাম্বরাম্॥
ক্ষোভিতাশেষপাতালাং ধনুর্জ্যানিঃস্বনেন তাম্।
দিশো ভুজসহস্রেণ সমন্তাৎ ব্যাপ্য সংস্থিতাম্॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী : মধ্যম চরিত্র—দ্বিতীয় অধ্যায়, ৩৬—৩৯ শ্লোক

মহিষাসুর ক্রোধে 'আঃ এ কি!' এই কথা বলে অসংখ্য অসুরগণের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে সেই শব্দ লক্ষ্য করে ধাবিত হ'ল। তারপর যাঁর দেহ-কান্তিতে ত্রিভুবন আলোকিত, যাঁর পদভরে মেদিনী অবনত, যাঁর মস্তকের কিরীট আকাশ স্পর্শ করেছে, যাঁর ধনুকের টঙ্কারে অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল ও পাতাল এই সাতটি নিম্নলোক আকুলিত, যিনি সহস্রভুজে দিকগুলি পরিব্যাপ্ত করে বিরাজমান, সেই দুর্গাদেবীকে মহিষাসুর দর্শন করলেন।

অষ্টাদশভুজা মহাদেবী ও সহস্রভুজা মহাদেবীর মধ্যে যোগসূত্র বৈকৃতিক রহস্য অনুসন্ধান করলে বোধগম্য হবে। বৈকৃতিক রহস্যে উল্লিখিত আছে 'অষ্টাদশভুজা পূজ্যা সা সহস্রভুজা সতী' অর্থাৎ সেই মহাদেবী সহস্রভুজা হ'লেও অষ্টাদশভুজারূপে পূজা পেয়ে থাকেন।[১] এখানে সহস্র শব্দ অনন্ত এই

(১) শ্রীশ্রীচণ্ডী—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত মধ্যম চরিত্র দ্বিতীয় অধ্যায় 'ভুজসহস্রেণ' সম্পর্কীয় পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

অর্থ বোঝাচ্ছে, মহাদেবী সহস্রভুজা অর্থাৎ তাঁর ভুজসংখ্যার সীমা নাই। সর্ব্ব-ব্যাপিনী মহাদেবীর সংখ্যাতীত অনন্ত ভুজ স্বাভাবিক কারণেই স্তবাদিতে বিবৃত হয়েছে। শুধু ভুজ কেন, বিশ্বরূপিণী মহাদেবীর চরণ, নেত্র, মস্তক, মুখ, কর্ণ, নাসিকাও সংখ্যাপরিমিতির অতীত, অন্তহীন এবং এই হেতু সর্ব্বব্যাপী। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কোন গ্রন্থে এইরূপ একটি শ্লোক পাওয়া যায়ঃ

'সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তে সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখে।
সর্ব্বতঃ শ্রবণঘ্রাণে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥'

তোমার হস্ত, পাদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ, কর্ণ, নাসিকা সর্বদিকেই বিরাজিত। হে নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার করি।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তর চরিত্রের দেবতা মহাসরস্বতীর এইরূপ ধ্যানমন্ত্র পাওয়া যায়ঃ

'ঘণ্টা-শূল-হলানি শংখমুসলে চক্রং ধনুঃ সায়কং
অষ্টভুজা মহাসরস্বতী হস্তাব্জৈর্দধতীং ঘনান্তবিলসচ্ছীতাংশুতুল্যপ্রভাম্।
গৌরীদেহসমুদ্ভবাং ত্রিজগতামাধারভূতাং মহা-
পূর্ব্বামত্র সরস্বতী-মনুভজে শুম্ভাদিদৈত্যার্দ্দিনীম্॥'

যিনি ঘণ্টা, শূল, হল, শঙ্খ, মুষল, চক্র, ধনু ও তীর করপদ্মে ধারণ করে আছেন, যিনি মেঘমধ্যবর্ত্তী চন্দ্রের মতো স্নিগ্ধ, যিনি পার্ব্বতীর দেহ থেকে উদ্ভূতা, যিনি ত্রিভুবনের আধারভূতা, অপূর্ব্বা ও শুম্ভ, নিশুম্ভ, ধূম্রলোচন ইত্যাদি দৈত্যের বিনাশকারিণী—উত্তর চরিত্র পাঠের পূর্ব্বে এইরূপ মহাসরস্বতীর আমরা ধ্যান করে থাকি।

উপরোক্ত আয়ুধ বর্ণনা থেকে দেখা যাবে যে, মহাসরস্বতী অষ্টভুজা। তিনি পার্ব্বতীর শরীর-কোষ থেকে নিষ্ক্রান্তা। শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দুই অসুরের দ্বারা পরাজিত দেবগণ নগাধিরাজ হিমালয়ে উপনীত হন ও তথায় বিষ্ণুমায়া বৈষ্ণবী শক্তি মহাদেবীকে বিশেষরূপে স্তব করেন। এইরূপ স্তবাদিতে ব্যাপৃত দেবগণের সম্মুখে পার্ব্বতী গঙ্গাজলে স্নান করতে আগমন করেন। তিনি দেবগণকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনারা কাহার স্তব করছেন?' তখনঃ

'শরীর-কোষতশ্চাস্যাঃ সমুদ্ভূতাঽব্রবীচ্ছিবা॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডীঃ উত্তম চরিত্র—পঞ্চম শ্লোক

তার পার্ব্বতীর দেহকোষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে শিবা এইরূপ প্রত্যুত্তর করলেন :

'স্তোত্রং মমৈতৎ ক্রিয়তে শুম্ভদৈত্যনিরাকৃতৈঃ।
দেবৈঃ সমেতৈঃ সমরে নিশুম্ভেন পরাজিতৈঃ ॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী : উত্তম চরিত্র—৮৬ শ্লোক

শুম্ভ দৈত্যের দ্বারা স্বর্গ থেকে বিতাড়িত ও যুদ্ধে নিশুম্ভের দ্বারা পরাজিত দেবগণ কর্তৃক সমবেতভাবে আমারই স্তুতি গীত হচ্ছে।

এই পার্ব্বতীর দেহকোষ-নিষ্ক্রান্তা অম্বিকাই কৌশিকী। শ্রীশ্রীচণ্ডীতে কৌশিকী নাম সম্পর্কে এইরূপ শ্লোক পাওয়া যায় :

'শরীরকোষাৎ যত্তস্যাঃ পার্ব্বত্যা নিঃসৃতাম্বিকা।
কৌশিকীতি সমস্তেষু ততো লোকেষু গীয়তে ॥'

সেই পার্ব্বতীদেবীর দেহকোষ থেকে যেহেতু অম্বিকা নির্গত হয়েছেন, সেই হেতু তিনি ত্রিভুবনে কৌশিকী নামে প্রসিদ্ধা হলেন।

স্বীয় শরীর থেকে কৌশিকীর নির্গমনের পর পার্ব্বতী কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করলেন।

'তস্যাং বিনির্গতায়াস্তু কৃষ্ণাভূৎ সাপি পার্ব্বতী।
কালিকেতি সমাখ্যাতা হিমাচলকৃতাশ্রয়া ॥'

---শ্রীশ্রীচণ্ডী : উত্তম চরিত্র—পঞ্চম অধ্যায়, ৮৮ শ্লোক

কৌশিকী দেবীর বিনির্গমনের পর পার্ব্বতী কৃষ্ণবর্ণা হয়ে হিমালয় পর্ব্বতে অধিষ্ঠান করতঃ কালিকা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলেন।

অবশ্য কৌশিকী দেবীর ললাট-ফলক থেকে বিনিঃসৃতা অসিপাশিনী করাল-বদনা কালীদেবীর বর্ণনাও শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পাওয়া যায়। 'মুক্তকেশী কে ষোড়শী হুঙ্কারে নাচিছে রণে' এই পদাংশ আলোচনাকালে পূর্ব্বে এই কালীদেবীর বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

আগমনী ও বিজয়া পর্য্যায়ের পদাবলী থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, শ্রীশ্রীচণ্ডী-বর্ণিত মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী এবং ভারতবর্ষের শারদীয়া মহাপূজার উপাস্যা দুর্গা শাক্ত কবির কাছে তত্ত্বগত ঐক্যসূত্রে বিধৃত হয়ে প্রতীয়মান হয়েছিলেন এবং এই অধ্যাত্ম-প্রতীতির রসোজ্জ্বল অভিব্যক্তি শাক্ত পদাবলীকে পরমরমণীয় ও ভক্তভাবুক সহৃদয়ের হৃদয়হৃদ্য করে রেখেছে।

মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী ও শারদীয়া দুর্গা

তাই দেখি রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের পূর্ব্ব উদ্ধৃত পদে মেনকার বাণীতে শারদীয়া দুর্গাপ্রতিমার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত: 'সঙ্গে সুরপরিবার এল দেবকন্যা লয়ে।' 'সুরপরিবার' কার্ত্তিক, গণেশ ও অন্যান্য দেবগণের ধ্বনিবাহক শব্দ। 'দেবকন্যা' শব্দটি লক্ষ্মী-সরস্বতীর ইঙ্গিত বহন করে আনছে।

কবি ঠাকুরদাস দত্তও তাঁর নিম্নলিখিত বিষয়ক পদে গিরিরাণী মেনকা তথা পাঠকের মনশ্চক্ষুতে শারদীয় দুর্গারূপ সমুদ্ভাসিত করে তুলেছেন:

'অপরূপ রূপ এ যে দশভূজা,
কুসুম চন্দন পায়ে কে করেছে পূজা,
শুন হে পাষাণ, হয়ে হতজ্ঞান এমন ভুলিলে ॥
নারায়ণী বাণী দুপাশে দাঁড়ায়,
দশভূজে পাশ শোভা পায়,
বলে গেলে হে গিরি, যাই—
আনিগো গিরিজায়,
সে মেয়ে রেখে এলে কোথায় ?'

—ক. বি শা. প: আগমনী স্তবক

মেনকা ও উমার মানসিক সম্পর্ক

গিরিরাণী মেনকার মিলনোৎক দৃষ্টিতে কার্ত্তিক-গণেশ-লক্ষ্মী-সরস্বতী-শোভিত মহিষমর্দ্দিনী রূপ প্রস্ফুট হবার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃসুলভ বাৎসল্যপ্রেম মেনকার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে তোলে। দাশরথি উমার গণেশজননী রূপের সম্মুখে মেনকার স্নেহ-ব্যাকুলতা অকৃত্রিম দরদের সঙ্গে অভিব্যক্ত করেছেন তাঁর নিম্নরূপ পদে:

'বসিলেন মা হেমবরণী, হেরম্বে লয়ে কোলে।
হেরি গণেশজননীরূপ, রাণী ভাসেন নয়নজলে।
... ...
রাণী মনে ভাবেন—উমারে দেখি, কি উমার কুমারে দেখি,
কোন্ রূপে সঁপিয়ে রাখি নয়ন যুগলে।'

—ক. বি. শা. প.: আগমনী—দ্বিতীয় স্তবক

উমাদর্শনে উপরুদ্ধ-নেত্রবৃত্তি উদগত অশ্রুধারাকে সম্বোধন করে মেনকার আক্ষেপোক্তি হরিশচন্দ্রের পদকে অনুপম রসস্নিগ্ধতা দান করেছে।

'থাক, থাক, থাক—নয়ন ধারা,
নয়ন ভরিয়ে একবার নিরখি নয়ন তারা।
না হেরে যে উমা, তারা বহিতে শ্রাবণের ধারা,
এল সেই নয়ন তারা, এখন ধারা এ কি ধারা?
নিরখিতে উমাধনে, বহুদিনের সাধ মনে,
হেরিতে সে চন্দ্রাননে, বাধা দেও এ কেমন ধারা।
একে পলক বাধা চোখে—দেখতে দেয় না অনিমিখে,
তুমি তাতে হলে বাদী, হেরি বল কেমন ধারা।'

ক. বি শা প.: আগমনী—দ্বিতীয় স্তবক

যদিও এই পদটি যমকালঙ্কারের সূত্র ধরে আমাদের মানসনেত্রে সাধককবি রামপ্রসাদ সেনের—

'এমন দিন কি হবে তারা
যবে তারা তারা তারা বলে তারা বেয়ে পড়বে ধারা।'

ক. বি শা. প.—ভক্তের আকুতি

—ইত্যাদি প্রসিদ্ধ পদটিকে উপস্থাপিত করে এবং আমরা কন্যাউমাদর্শনে বিহ্বলা স্নেহব্যাকুলা জননী মেনকার মাতৃহৃদয়ের তৃপ্তিতে ইষ্টদেবীর সাক্ষাৎকারধন্য সাধকের উল্লাসানুভূতির সন্ধান পাই, তথাপি 'থাক, থাক, থাক—নয়ন ধারা' ইত্যাদি উপরি-উৎকলিত পদটি আমাদের কাছে যে চিত্রটি উদ্ঘাটিত করে তোলে, সেটি হ'ল বাঙ্গালী পারিবারিক জীবনে কন্যাসন্তানের অধিকৃত অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থানটির চিত্র। যদিও শাক্ত কাব্য তথা শাক্ত পদাবলীর ভৌগোলিক পটভূমিকা হ'ল নগাধিরাজ হিমালয় ও বরফাবৃত কৈলাসচূড়ার দুর্গম শৃঙ্গ, তথাপি যে কবি কল্পনাধারা এই শাক্ত সাহিত্যকে রসসিঞ্চিত করে রেখেছে তার উৎস সেই হিমালয়-কৈলাসের তুষারশীতল বিজনতা, নয় তার উৎপত্তিস্থল হ'ল বাঙ্গালী গার্হস্থ্য-জীবনের স্নেহার্দ্র সমতল পৃথ্বী।

বাঙ্গালী পরিবারে কন্যাসন্তানের স্থান পুত্রসন্তানের স্থান থেকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কন্যাসন্তান পারিবারিক জীবনে একপ্রকার অবাঞ্ছিত অতিথি। স্মৃতিকারদের দৃষ্টিতে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্র-পিণ্ড প্রয়োজনম্'। যেহেতু পুত্র প্রদত্ত পিণ্ড মৃতের পারলৌকিক সদ্গতির জন্য প্রয়োজনীয়, সেহেতু অর্থাৎ

পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত পুরুষ দারপরিগ্রহ করেন। সাধারণ ক্ষেত্রে কন্যাসন্তান পিণ্ডাধিকারী নয়। তাই স্মার্ত্ত দৃষ্টিতে কন্যা পরিবারের প্রধান অঙ্গ নয়। তাছাড়া, বিবাহ বাঙ্গালী তথা ভারতীয় নারী-সমাজের জীবনে একটি প্রধান ঘটনা। বিবাহই নারীকে পূর্ণতা দান করে। স্মৃতিকারের দৃষ্টিতে—

'বৈবাহিকী বিধি স্ত্রীণাং সংস্কারো বৈদিকঃ স্মৃতঃ।

পতিসেবা গুরৌ বাসঃ গৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া ॥' —মনুসংহিতা

স্ত্রীদের পক্ষে বিধিবদ্ধ বিবাহকেই বৈদিক সংস্কার বলে গণনা করতে হবে। স্বামিসেবা ও গৃহকর্ম্মকরণের মাধ্যমে তাঁরা যথাক্রমে গুরুগৃহে বাস ও হোমাগ্নি সংরক্ষণের ফল পেয়ে থাকেন।

নারী-জীবনের বিবাহের এই সার্ব্বভৌম প্রাধান্যের জন্যই নারী যাতে সুগৃহিণী ও সুধর্ম্মিণী হতে পারে, তার প্রস্তুতি হিসাবে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপযুক্ত স্বীকৃতি পেয়েছিল।

'অজ্ঞাতপতিমর্য্যাদামজ্ঞাতপতিসেবনাম্।

নোদ্বাহয়েৎ পিতা বালামজ্ঞাতধর্ম্মশাসনাম্ ॥'

—বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রের অষ্টম উল্লাসে ৪৭ শ্লোকের পাদটীকায় উদ্ধৃত

যে কুমারীর স্বামীর মর্য্যাদা, স্বামীর পরিচর্য্যা বা ধর্ম্মের অনুশাসন সম্বন্ধে জ্ঞান নাই, তার বিবাহ দেওয়া তার পিতার পক্ষে অনুচিত।

এই কারণেই মহানির্ব্বাণতন্ত্রকার আগে কন্যার লালনপালন ও শিক্ষাদান এবং পরে যোগ্য পাত্রে তার বিবাহের বিধান দিয়েছেন।

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

দেয়া বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা ॥'

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র: অষ্টম উল্লাস—৪৭ শ্লোক

পুত্রের ন্যায় কন্যারও লালনপালন ও শিক্ষাদান বিষয়ে অতিশয় যত্ন নেওয়া উচিত। পরে যোগ্যকালে কন্যাকে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করে বিদ্বান্ বরের হাতে ধনসহ অর্পণ করা উচিত।

তন্ত্রমতে বিবাহকে নারীর জীবনে এরূপ অতি-প্রয়োজনীয় মনে করা হয়েছে যে, বিধবা বিবাহও তন্ত্রে উপদিষ্ট হয়েছে।

'পরিণীতা ন রমিতা কন্যকা বিধবা ভবেৎ।
সাপ্যুদ্বাহ্যা পুনঃ পিত্রা শৈবধর্ম্মেম্বয়ং বিধিঃ ॥'

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র : একাদশ উল্লাস—৬৭ শ্লোক

যদি স্বামিসহবাসের পূর্ব্বেই কোন কন্যার স্বামীর মৃত্যু ঘটে, তবে সেই কন্যার পুনর্ব্বিবাহ শিব-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের অনুশাসন অনুযায়ী সম্পূর্ণ বৈধ।

নারীর দেহ আদ্যাশক্তির অধিষ্ঠানক্ষেত্র। যে শক্তি বিশ্বসৃষ্টিতে কলা-কাষ্ঠাদিরূপে পরিণাম সংঘটন করে, সেই শক্তিই নারীদেহাশ্রিত হয়ে ভ্রূণের উৎপত্তি বিধান করে ও তাকে ভিন্ন ভিন্ন পরিণতি-পর্য্যায়ের মধ্য দিয়ে পরিচালিত করে সদ্যপ্রসূত শিশুর অবয়বে পূর্ণ বিকশিত করে তোলে। তাই নারী সৃষ্টিশক্তির জীবন্ত বিগ্রহ ও বিশ্বের ধারিকা শক্তি। রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিবর মোহিতলালের ভাষায় :

'সৃষ্টির মানসলক্ষ্মী, কালস্রোতে কমল আসনা
মূর্ত্তি ধরি দেখা দিলা মোর মুগ্ধ নয়নের আগে।
হেরিনু সে বিশ্বধাত্রী সবে করে তারি উপাসনা,
জন্ম মৃত্যু পায়ে তার বাঁধা আছে অন্ধ অনুরাগে ॥'

—স্মরগরল নারীস্তোত্র

বিবাহ-বিধি এই সৃষ্টিস্বরূপিণী নারীর সৃষ্টির ক্ষেত্র রচনা করে। তাই তন্ত্রধর্ম্মে নারী-জীবনে বিবাহের স্থান গভীর তাৎপর্য্যমণ্ডিত।

কিন্তু নারীর প্রাগ্‌বৈবাহিক জীবনের সমস্ত কর্ম্মাবলীর বিবাহোদ্দেশ্যের দ্বারা নিয়ন্ত্রণ এবং বিবাহোত্তর জীবনে নারীর পিতৃগৃহের পরিবার ও পরিবেশের সঙ্গে সর্ব্ববিধ সম্পর্ক-লোপের ফলে নারীর জীবনস্রোতে দুটি ধারার মিলন সংঘটিত হ'ল,—তাদের একটি হ'ল নারীর পিতৃকুলের সংস্কৃতি-ধারা ও অপরটি হ'ল তার পতিকুলের সংস্কৃতি-ধারা। নারী এইরূপে দুটি সংস্কৃতি-ধারার সাধারণ অববাহিকায় পরিণত হ'ল। তাই পিতৃপরিবারের দৃষ্টি-ভঙ্গীতে কন্যা আপন হয়েও পর, সে আত্মজা অথচ পরজায়া, সে পিতৃগৃহের অন্তর্ভুক্তা অথচ পরগৃহের কেন্দ্রীভূতা। কন্যার হৃদয়ের এই পিতৃকুল-কল্যাণ-কামনা ও পতিকুল-মঙ্গলৈষণার জোয়ার-ভাটার খেলা শাক্ত পদাবলীর রসসমুদ্রকে উত্তুঙ্গ মহনীয়তা দান করেছে। শাক্ত কবি হরজায়া উমা ও

গিরিরাণী মেনকার সম্পর্ক বিশ্লেষণ-অবসরে দেখিয়েছেন যে, বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে তার জননীর সম্বন্ধটি এমন একটি পর্য্যায়ের, যেটিকে অবিমিশ্র আপনের সঙ্গে সম্পর্ক বলা চলে না, আবার যেটিকে পুরোপুরি পরের সঙ্গে সম্পর্ক বললেও ভুল হয়। বিবাহিতা কন্যার সঙ্গে তার মায়ের সম্বন্ধটি যেন প্রকাশশালিনী দিবার সঙ্গে অপ্রকাশরূপ রাত্রির মিলন-মুহূর্ত্ত, ঊষা বা গোধূলির প্রকাশা-প্রকাশ-মিশ্র কাল। কবি অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পদটিকে এ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

উমাকে আনার জন্য গিরিরাজকে কৈলাস পাঠাবার প্রাক্কালে মেনকা তাঁকে মেয়ে উমার সঙ্গে জামাই শিবকে আনার উপদেশ দিচ্ছেন। কারণ উমা কন্যা হ'লেও এখন তো পরসংসারভুক্তা।

'গিরিরাজ হে, জামায়ে এনো মেয়ের সঙ্গে।
মেয়ের যেরূপ মন, মায়ে বোঝে যেমন,
পুরুষ পাষাণ তুমি, বুঝ না তেমন।'

—ক. বি. শা. প : আগমনী, প্রথম স্তবক

অন্যবারে মেয়ের সঙ্গে জামাইকে নিমন্ত্রণ না করার দরুণ মেয়ের মনের তীব্র প্রতিক্রিয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা মেনকার মনে সঞ্চিত আছে।

'উমা এলো বাহির দুয়ারে,
কোলে করি ত্বরা করে, জিজ্ঞাসি উমারে,
আমার শিব তো আছেন ভাল?'

—ক. বি. শা. প. : আগমনী, প্রথম স্তবক

মায়ের কুশল প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়, কিন্তু স্বামী হিমালয়-গৃহে অনিমন্ত্রিত, তার জন্য মায়ের প্রতি উচ্ছ্বসিত অভিমান উমার চোখে অশ্রুর আকারে আত্ম-প্রকাশ করে।

'উমা বলে আছেন ভালো,—চোখে দেয় অঞ্চল
বলে—চোখে কি হলো? আমার চোখে কি হলো?'

—ক. বি. শা. প. : আগমনী, প্রথম স্তবক

মা মেনকা কন্যার এই ভাববৈলক্ষণ্যের কারণ ঠিক অনুধাবন করতে পারেন।

'আমি বুঝিনু সকল, কেন চোখে দেয় অঞ্চল।
হিয়ের জল ঝিয়ের চোখে উথলিল, জামায়ের প্রসঙ্গে ॥'

—ক. বি. শা. প.ঃ আগমনী, প্রথম স্তবক

অশ্রুতে যেমন তেমনি কথনো উমার অভিমান মায়ের প্রতি বক্রোক্তিতে তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

'কার্তিকে রাখিয়া বুকে, নাচায় গৌরী থেকে থেকে,
সোনার কার্তিক তোমায়[১] দেখে, উঠে চমকে,
বলে তোমায় দেখিয়ে,—মা, ও মা, ওকে দাঁড়ায়ে ?
উমা বলে—তোমার দাদা ঐ, বাবা, আমার বাবা ঐ ?
বাপসোহাগে বাপের ছেলে, জড়িয়ে মায়ের ধরে গলে,
বলে—মা, আমার বাবা কই,
বাবা কেন এল না, ও মা বল না !
বলে কেশে ধরে টানে, উমা চাহি আমার পানে,
বলে—'কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে।'

—ক. বি শা প.ঃ আগমনী, প্রথম স্তবক

নিজের স্বামীর না আসার কারণ সম্বন্ধে মা মেনকাকে লক্ষ্য ও শিশু কার্তিককে উপলক্ষ্য করে উমার 'কেন এলেন না, তোমার দিদি জানে' এই নিদারুণ বক্রোক্তিই সপ্রমাণ করে যে, বিবাহিতা কন্যা উমার জীবনে পিতৃ-সংসারের প্রতি স্নেহাসক্তির পাশাপাশি আরো একটি তীব্র আকর্ষণ বর্তমানে বিরাজ করছে—সেটি হ'ল স্বামী শিব ও তার সংসারের উপর নিবিড় মমত্ববোধ।

এইরূপে বিবাহিতা কন্যার পিতৃ-পরিবারের আত্মকেন্দ্রিক কক্ষে বৈবাহিক বিধির রন্ধ্র-পথে পরসংসারের ভিন্ন পরিবেশের বায়ু-প্রবাহ সংক্রমিত হয়। শুধু তাই নয়, সমাজের অন্য স্তরের বায়ুমণ্ডলের চাপও বিবাহব্যাপারের মাধ্যমে বিবাহিতা কন্যার পিতৃকুলের শান্ত আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সংঘটিত করে থাকে। বাঙ্গালীর পারিবারিক সম্পর্ক-নিয়ামক এই সনাতন রীতি

১। 'তোমায়' অর্থ—গিরিরাজ হিমালয়কে।

সম্বন্ধে শাক্ত কবিরাও খুবই সচেতন ছিলেন। তারই ফলে আমরা দেখি, কিভাবে শিবের তন্ত্র-বর্ণিত গুণবর্ণনার সময় বাঙ্গালী পারিবারিক তথা সামাজিক এই বৈশিষ্ট্যটিকে শাক্ত কবিগণ ধ্বনির সাহায্যে আভাসিত করেছেন।

পূর্ব্বালোচিত তন্ত্রোক্ত লক্ষণানুযায়ী শিব আত্মারাম। যেহেতু তাঁকে আনন্দিত করতে কোন বাহ্যবিষয়ের প্রয়োজন হয় না, সেহেতু তিনি সর্ব্বপ্রকার বিষয়বর্জ্জিত, অকিঞ্চন। শিবের এই গভীর তাৎপর্য্যব্যঞ্জক অকিঞ্চনত্বকে শাক্ত কবি তদানীন্তন এক সমাজ-বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করার কাজে লাগিয়েছেন। সে সময় বাঙ্গালী সমাজে কৌলীন্য-প্রথার অস্তিত্ব ও পণপ্রথার বহুলপ্রচার-হেতু ধনীকন্যার অপেক্ষাকৃত দরিদ্র পরিবারে বিবাহ প্রচলিত ছিল। তারই ফলে দরিদ্র স্বামীর গৃহস্থালীতে বিলাসে অভ্যস্তা কন্যার সম্ভাব্য দুঃখময় জীবনের আশঙ্কিত চিত্র সব ধনী পিতামাতাকেই চিন্তাকুল করে তুলত। গিরিরাণী মেনকাও তদানীন্তন এই সমাজবিধি অনুসরণ করে অকিঞ্চন জামাতা শিবের দৈন্যপীড়িত সংসারে আদরিণী কন্যা উমার কষ্ট আশঙ্কা করে তাকে বলেন :

'উমা মা আমার স্বর্ণলতা, শ্মশানবাসী মৃত্যুঞ্জয়।
মরি জামাতার খেদে, তোমার বিচ্ছেদে, প্রাণ কাঁদে দিবানিশি।
আমি অচল নারী, চলিতে নারি, পারি না যে দেখে আসি।
আছি জীবন্মৃতা হয়ে, আশাপথ চেয়ে, তোমায় না হেরিয়ে নয়ন ঝরে।
কও দেখি উমা, কেমন ছিলে মা, ভিখারী হরের ঘরে ?
জানি নিজে সে পাগল, কিছু নাই সম্বল, ঘরে ঘরে বেড়ায় ভিক্ষা করে।

* * * *

তুমি রাজার বালিকা, মায়ের প্রাণাধিকা, ভাগ্যেতে মা হলি শিবদারা।
মরি দুঃখেতে শঙ্করী, শঙ্কর ভিখারী, উপজীব্য ভিক্ষা করা।'

—রাম বসু : ক. বি. শা. প —আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক

তদানীন্তন সমাজে ধনীকন্যার দরিদ্র গৃহে বিবাহ ছাড়া আর যে দুটি প্রথা প্রচলিত ছিল, সে দুটির একটি হ'ল কুলীনের বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ। সে-যুগে কৌলীন্য-প্রথার আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থ-দর্শন, শ্রদ্ধা, বৃত্তি, তপ ও দান এই নবধা কুললক্ষণ শ্লোকশ্রুতিমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়েছিল। প্রধান কুললক্ষণ যেটি সামাজিক বৈশিষ্ট্য-হিসাবে সাধারণ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল,

সেটি হ'ল কুলীন সন্তানের একাধিক দারপরিগ্রহ। শাক্ত কবি তন্ত্রোক্ত শিবশক্তি-সম্বন্ধটিকে পুরাণপ্রোক্ত শিব-জাহ্নবী-সম্বন্ধের সঙ্গে যোজনা করে সামাজিক বহুবিবাহ প্রথাটিকে তাঁর সাহিত্যচিত্রে প্রস্ফুট করেছেন। উমার সপত্নী-কণ্টকিত গৃহস্থালীর অধিক্ষেপে গিরিজায়া মেনকার মুখে এই সামাজিক প্রথাটিরই ইঙ্গিত আমরা লাভ করে থাকি।

'ঘরেতে সতিনী জ্বালা, সদা করে ঝালাপালা।
হয়ে উমা রাজবালা, কিসে পাবে ত্রাণ॥
শিরে সুরতরঙ্গিণী, হয়ে শিবসোহাগিনী,
করি কলকলধ্বনি, করে অপমান।'

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত: ক. বি. শা. প—আগমনী, প্রথম স্তবক

কুলীনের বহুবিবাহ ছাড়া অপর প্রচলিত সামাজিক প্রথাটি ছিল বাল্য-বিবাহ। সে-যুগে রজোদর্শনের পূর্ব্বে কন্যার বিবাহ দেওয়া যে আবশ্যিক কর্ত্তব্য ছিল শুধু তাই নয়, একেবারেই অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহে সম্প্রদান অশেষ পুণ্যবিধায়ক কর্ম্ম বলে পরিগণিত হ'ত। সেইজন্য আমরা দেখি যে, শাক্ত পদাবলীর গিরিকন্যা উমা অপ্রাপ্তযৌবনা অবস্থাতেই হরসীমন্তিনী। এই কারণেই ভিখারীর ঘরে উমাকে পাঠাতে বিবাহের পর প্রথম প্রথম মা মেনকার এত অনিষ্টশঙ্কা।

'আপন ঝোঁকে ক্ষেপা থাকে, মানুষ নয় বোঝাব কাকে,
সে দেখবে কি দেখবি তাকে—নিত্য ভাং ধুতুরা খাবে॥
আঁচল ধরে পাছে ছোটে, ঘুমিয়ে উমা চম্‌কে উঠে,
শ্বশুর ঘর কি জানে মোটে, কত বকি তারি তরে॥'

—গিরিশচন্দ্র: ক. বি. শা. প—বিজয়া

বিবাহের কয়েক বৎসর পর প্রাপ্তযৌবনা পিত্রালয়াগতা উমাকে আরও কিছুদিন থাকবার জন্য মেনকার ব্যাকুল আর্ত্তির মধ্যে আমরা এই বাল্যবিবাহ-প্রথারই ইঙ্গিত পেয়ে থাকি।

'এসেছিস মা—থাক্ না উমা দিন কত।
হয়েছিস ডাগর-ডোগর, কিসের এখন ভয় এত?

এখন বুঝি ঘর চিনেছিস, তাই হয়েছি পর,
কেঁদে কেঁদে ভাসিয়ে দিতিস, নিতে এল হর।
সঁপে দিছি পরের হাতে, জোর আমার ত নাই তত।'

—গিরিশচন্দ্র : ক. বি. শা. প —আগমনী, দ্বিতীয় স্তবক

কিন্তু এই সামাজিক প্রথা-সূচনার ধ্বনি অনুসরণ করে আমরা শাক্ত পদাবলীতে এক অপরূপ রসমহার্ণবের সামসঙ্গীত শ্রবণ করতে পারি। কনক-চম্পকদামা অতসীকুসুমোপমা বালিকা উমা অপ্রাপ্তবয়স্কা, তাই আসন্ন বিজয়া-বিচ্ছেদের কল্পনাও গিরিরাণী মেনকার মাতৃহৃদয়ের কাছে অসহ্য। সেই কারণেই তিনি দশমী প্রভাতের পূর্ববর্ত্তিনী নবমী নিশার কাছে তাঁর ব্যাকুল আর্ত্তি নিবেদন করেন :

'রজনী জননী, তুমি পোহায়ো না ধরি পায়,
তুমি না সদয় হলে উমা মোরে ছেড়ে যায়।'

—অজ্ঞাত কবির পদ : ক. বি শা. প —বিজয়া

এখানে রজনী মেনকার কাছে অচেতন খণ্ডকাল নয়, চেতনামণ্ডিত অন্তর্ভূতময়ী ব্যাপিকা প্রকৃতি। এই কালরূপা প্রকৃতি আদ্যাশক্তির রূপমাত্র। তাই রজনী জননী অর্থাৎ জগজ্জননী।

নবমী নিশার উপর এই জাতীয় চৈতন্যধর্মের আরোপ তিনজন প্রসিদ্ধ কবির পদে উচ্চাঙ্গের করুণ-রসাত্মক কাব্য-সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। এই কবিত্রয়ীর একজন হলেন সাধক কবি কমলাকান্ত, অপর দুজন হলেন মধুসূদন ও নবীনচন্দ্র।

কমলাকান্তের পদ কখনও মেনকার উচ্ছ্বসিত অভিমানে অভিযোগ-তীব্র, কখনও বা মেনকার সকাতর অনুনয়ে আবেগে আর্দ্র। যেহেতু নবমী নিশি উষাগমে আপন অবলুপ্তির মাধ্যমে অন্যের মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করে, সেহেতু সে অতি নিকৃষ্ট খল। তাই গিরিরাণী মেনকা তাকে নিন্দা করে বলেন :

'শুনেছি দারুণ তুমি, না রাখ সতের মান ॥
খলের প্রধান যত, কে আছে তোমার মত—
আপনি হইয়ে হত, বধ রে পরেরই প্রাণ।'

—ক. বি. শা. প. : বিজয়া

যদিও নবমী তিথি খলের প্রধান অপেক্ষাও খল, তথাপি তার প্রতি গিরিরাণী মেনকার কাতর অনুনয়ের অবধি নাই। কারণ কন্যা উমার সঙ্গে মিলনক্ষণকে একমাত্র সে-ই চিরস্থায়ী করতে পারে। খণ্ডকাল তার আপাতরূপ, কিন্তু অনন্ত-কালাত্মিকা শক্তিই তার স্বরূপ। তাই মেনকা পুজার্থিনীর ভক্তিনম্র মনোভাব নিয়ে তাকে বলেন—

'প্রফুল্ল কুমুদবরে সচন্দন লয়ে করে,
কৃতাঞ্জলি হৈয়ে তোমার চরণে করিব দান।'

—ক. বি. শা. প. ঃ বিজয়া

এই আকুল হৃদয়ার্তির একমাত্র কামনা কন্যা উমার বিরহহীন স্নেহসঙ্গ, তাই মা মেনকার ব্যাকুল প্রার্থনা, 'ওরে নবমী নিশি, না হইও রে অবসান'।

মধুসূদনের মেনকাও নবমী নিশির কাছে অনুরূপ আবেদন জানিয়েছেন, 'যেও না রজনি, আজি লয়ে তারাদলে'। মধুসূদনই বাংলা সাহিত্যে সনেট রচনার প্রথম পথিকৃৎ। পেত্রার্কার অন্ত্যমিল-রীতি অনুসরণ করে লিখিত 'বিজয়া' বিষয়ক সনেটটি একটি উচ্চাঙ্গের সনেট। সনেটের প্রারম্ভে যে ভাব আভাসিত হয়, সেই ভাবটিই সমগ্র অষ্টকে বিস্তৃতি ও ষড়কে সংহৃতি লাভ করে সনেটের অন্ত্যে ভাবের পরিপূর্ণ রসবিগ্রহ ধারণ করতে সক্ষম হয়। কোন একটি ভাবকে নিটোল-'গোলোকত্ব'-মণ্ডিত আস্বাদ্য রস-শরীরের সঙ্গে যুক্ত করাই সনেটের লক্ষ্য। আলোচ্য সনেটটিতে উমার আশঙ্কিত বিচ্ছেদকে অবলম্বন করে মেনকার মাতৃহৃদয়ের ব্যথা একটি পূর্ণ রসাস্বাদন প্রক্রিয়ার বিষয়ীভূত হয়েছে। এইখানেই সনেট-রচয়িতা হিসাবে মধুসূদনের অপরিসীম কৃতিত্ব। তাছাড়া, রূপকালঙ্কারের সাহায্যে নিশির উপর মানবিকতার আরোপকে তীক্ষ্ণ করে নিশির মানবী মূর্তি পাঠকের কাছে জীবন্ত করে তুলেছেন।

'কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ জ্বালা এ মন জুড়াবে?'

—ক. বি. শা. প. ঃ বিজয়া

কবি নবীনচন্দ্র মধুসূদনের মতো নবমী নিশির উপর মানবধর্ম্মের আরোপের দিকে নজর না দিয়ে, প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর বর্ণনা দিয়ে তাঁর 'বিজয়া' বিষয়ক পদটিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে চেষ্টা করেছেন।

'যেও না, যেও না, নবমী রজনি,
সন্তাপহারিণী লয়ে তারাদলে।
গেলে তুমি দয়াময়ি, উমা আমার যাবে চলে।
তুমি হলে অবসান, যাবে মেনকার প্রাণ,
প্রভাতশিশিরে আমায় ভাসাবে নয়নজলে।
প্রভাত-কাকলী-গান কাঁদাবে মায়ের প্রাণ,
ঊষার আলোকে প্রাণ উঠিবে রে জ্বলে।'

—ক. বি. শা. প.: বিজয়া

কিন্তু নবীনচন্দ্রের প্রধানতম কৃতিত্ব উমাকে মেনকার গলের পুষ্পহার এবং সেই পুষ্পহারের বিরহানলে শুষ্ক হয়ে যাওয়ার পরিকল্পনায়।

'হৃদয়েতে মেনকার, উমা যেন পুষ্পহার,
শুখাইবে বিজয়ার বিরহ অনলে।'

—ক. বি. শা. প.: বিজয়া

'হৃদয়' ও 'পুষ্পহার' এই দুটি শব্দ মেনকা-উমার স্নেহ-সম্বন্ধের কোমলতা ধ্বনির সাহায্যে আভাসিত করছে। উমা-বিচ্ছেদের তীব্রতা বুঝাবার জন্যই বিরহের উপর অনলধর্ম্ম আরোপিত হয়েছে।

কিন্তু শাক্ত কবির এই কাব্যরস-সৃষ্টির প্রেরণার উৎস তন্ত্র-বর্ণিত সেই চির পুরাতন অথচ চির নবনবায়মান শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব! তাই নবমী নিশির প্রতি গিরিরাণী মেনকার আক্ষেপোক্তির অবসরেই সাধক কবি কমলাকান্ত তাঁকে নিপুণ ভবরোগবৈদ্যের মতই সুপরামর্শ দেন:

'কমলাকান্তের বাণী শুন ওগো গিরিরাণী।
লুকায়ে রাখ না মারে হৃদয়ে দিয়ে স্থান॥'

—ক. বি. শা. প.: বিজয়া

হৃদয়ে শক্তিতত্ত্বের ন্যাসই পরম শক্তিসাধনা। আপন মনকে সম্বোধন করে কমলাকান্ত অন্যত্র বলেছেন—

'আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই, কেউ না দেখে॥'

—ক. বি. শা. প. : মনোদীক্ষা

কিন্তু শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব 'বাগর্থাবিব সম্পৃক্তৌ' শব্দ ও অর্থের মতো পরস্পরসম্বদ্ধ। তাই শক্তিতত্ত্বের স্বীকরণ শিবতত্ত্বের অধিগতি ভিন্ন সম্ভব নয়। সিদ্ধ পদবীতে আরূঢ় কমলাকান্ত তাই মেনকাকে জামাতা শিবকে কৈলাসে স্থাপনা করা সম্পর্কেও উপদেশ দিয়েছেন।

'কমলাকান্তের নিবেদন ধর, শিব বিনা শিবা পাবে না।
যদি জামাতা শঙ্করে পার রাখিবারে, তবে তোমার গৌরী যাবে না॥'

—ক. বি. শা. প. : বিজয়া

কবি দাশরথি রায়ের মেনকা কমলাকান্তের মেনকার চেয়ে আরো এক পদ অগ্রসর হয়ে কন্যা উমার হিমগৃহে অবস্থিতির জন্য জামাতা শিবের অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে স্বীয় স্বামী গিরিরাজ হিমালয়কে সনির্বন্ধ মিনতি জানাচ্ছেন।

'নাথ হরচরণে যদি ধর, দোষ নাই হে ধরাধর।
চরণে ধরে তুমি হে নাথ, দিলে কন্যা যায়—
ধরাতে ধরিলে পদ, হরেন অনেকের আপদ,
মোর বচন ধর হে নাথ, ধর গঙ্গাধর-পায়।
ধরাতে গুণ ধরে যদি ঐ পদ ধরায়॥
নাথ কিসে যাবে আর এ বেদন, ভিন্ন হর-আরাধন,
রাখিতে ঘরে তারাধন, নাহি অন্য উপায়,—'

—ক. বি. শা. প. : বিজয়া

কৌলমার্গে পাশ-বিমুক্ত অবস্থায় শিবত্বপ্রাপ্তি যে সাধনার চরম লক্ষ্য, তা উপরি-উদ্ধৃত পদের ভণিতায় কবির উক্তি থেকেই সুস্পষ্ট হয়।

'মজে অসার সম্পদে, হরপদে না সঁপে মতি,
কেন মুক্তিকন্যা তুমি হারা হও দাশরথি,
কি হবে, কাল এলো—আজি কি কালনিশি পোহায়॥'

—ক. বি. শা. প. : বিজয়া

শিবতত্ত্বের মানস অধিগতির মাধ্যমে গিরিরাণী মেনকা উপলব্ধি করতে পারেন যে, মহত্তত্ত্বাদিভূতান্ত জগৎপ্রপঞ্চ পরমশিবে অধ্যস্ত রয়েছে ও শক্তির প্রভাবেই এই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের ব্যবহারিক সত্তা আক্ষিপ্ত। জগতের সর্বত্রই শক্তির অদৃশ্য চলমান চরণের ভক্তশ্রুতিগোচর নূপুরশিঞ্জনে মুখরিত। সখী বিজয়ার কন্যা উমাকে বিদায় দেবার অনুরোধের প্রতিক্রিয়া-হিসাবে মা মেনকার চিন্তাধারা উমার প্রতি উক্তিতে এইভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে :

'ভানু যত কষ্ট প্রকাশ করিছে, বিদায় দিতে তোমায়
বিজয়া বলিছে,
সেই কেমনে, ভেবে সেই ভাব মনে, সদা আঁখি ঝুরে
আমার হৃদয় ফাটিছে ॥
চৈতন্যরূপিণী তুমি ব্রহ্মময়ী,
তুমি নাই যথায় এমন স্থান আর কৈ,
তোমায় দিলে বিদায়, সকলই যে যায়,
মাগো তোমায় অবলম্বন করি এই জগৎ রয়েছে ॥'
—হরিনাথ মজুমদার-কাঙ্গাল ফকিরচাঁদ : ক. বি. শা. প.—বিজয়া

যেহেতু শক্তি প্রতিভাসমান জগৎপ্রপঞ্চের একমাত্র অবলম্বন সেহেতু শক্তির বিদায়ের অর্থ লীলার নিত্যে প্রবেশ, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ থেকে মহাকারণে লয় : জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি থেকে তুরীয়ে লয়।' তাছাড়া, শক্তি স্বরূপতঃ ব্রহ্মময়ী, ঔপনিষদিক ব্রহ্ম বা তন্ত্রোক্ত পরম শিবের সঙ্গে অভিন্নসত্তা।

কন্যাজামাতা শক্তিশিবের এই অভেদবুদ্ধি গিরিরাজ হিমালয় কন্যা উমার হিমগৃহে আগমনের পূর্ব্বেই মা মেনকার মনে জাগ্রত করে দিয়েছেন।

'বিশেষে তোমার তারা, হর ত্রিলোচন তারা,
তেঁই পরস্পর তারা, বিচ্ছেদ না সয় ॥
অর্থহীন পশুপতি, তাঁর সর্ব্বস্ব পার্ব্বতী,
দুর্গা বিহনে দুর্গতি, শুনেছি নিশ্চয়।'
—রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় : ক. বি. শা. প.—আগমনী, প্রথম স্তবক

তারা হর-ত্রিলোচন তারা, অর্থাৎ শক্তিহীন শিব স্পন্দনক্ষম নন। শিব শক্তির বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারেন না, অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কোন ভেদ নাই। অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির মধ্যে কোন দ্বৈতভাব নাই, শিব ও শক্তির মধ্যেও সেরূপ কোন পার্থক্য নাই।

বিজয়ার স্বপ্নে সাধিকা মেনকারাণী সিদ্ধ দৃষ্টি লাভ করে উপলব্ধি করেন যে, পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ পরমার্থতঃ শিবশক্ত্যাত্মক, সর্ব্বত্রই শিব-শক্তির লীলা। শুধু তাই নয়, স্বীয় হৃৎকমলমঞ্চেও শিবশক্তি। বাহ্য বা আন্তর ক্ষেত্র সর্ব্বত্রই যা-কিছু অব্যক্ত তাই-ই মহেশ্বর, আর যা-কিছু ব্যক্ত তাই-ই উমা।

কবি জ্ঞানেন্দ্রনাথের 'বিজয়া' বিষয়ক পদের ভণিতায় এই মহাসত্য আভাসিত হয়েছে :

'জ্ঞান বলে গো গিরি জায়া, সর্ব্বত্র হল হর জায়া!
নয়ন মুদে দেখ না হৃদে, কোথা তোমার উমা নাই?'

— জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায় কাব্যতীর্থ : ক. বি. শা. প —বিজয়া

কবিবরের অভিপ্রায় এই : গিরিরাণী মেনকা! পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চে হর ও তার জায়া অর্থাৎ শিব ও শক্তি সর্ব্বত্র অনুস্যূত। তাছাড়া, তোমার জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অবস্থাত্রয়ে স্ফুরিত মানসবৃত্তিনিচয়ে ও তুরীয় অবস্থার বৃত্তিশূন্যতায় সেই শিবশক্তিই বিরাজিত।

শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে

শক্তিদর্শন শক্তি-পূজাবিধির প্রারম্ভিক ক্রিয়া আচমনের মন্ত্রত্রয়ীতে সূত্রাকারে উপনিবদ্ধ আছে। শৈবশাক্তপক্ষে আচমনের এই তিনটি মন্ত্র বিহিত হয়েছে: 'ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা, ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা'। স্ত্রী শূদ্র এই তিনটি মন্ত্রই ঈষৎ পরিবর্তিত করে উচ্চারণ করবেন: 'হ্রীং আত্মতত্ত্বায় নমঃ, হ্রীং বিদ্যাতত্ত্বায় নমঃ, হ্রীং শিবতত্ত্বায় নমঃ'।

আত্মতত্ত্ব, বিদ্যাতত্ত্ব বা শক্তিতত্ত্ব, এবং শিবতত্ত্ব শক্তিদর্শনের মূলীভূত তিনটি তত্ত্ব। শুধু আচমন কেন, পূজাবিধির অন্তর্ভুক্ত অপর একটি প্রধান অনুষ্ঠান তত্ত্বন্যাসে এই তিনটি তত্ত্বের সাক্ষাৎ নামোল্লেখ দেখা যায়। উভয় হস্ত দ্বারা শরীরের পা থেকে নাভি পর্যন্ত 'ক্রীং ক্রীং ক্রাং হূং হূং হ্রীং হ্রীং ওঁ আত্মতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে আত্মতত্ত্বের, নাভি থেকে হৃদয় পর্যন্ত 'দক্ষিণে কালিকে ওঁ বিদ্যাতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে বিদ্যাতত্ত্বের, হৃদয় থেকে মস্তক পর্যন্ত 'ক্রীং ক্রীং ক্রীং হূং হূং হ্রীং হ্রীং স্বাহা ওঁ শিবতত্ত্বায় স্বাহা' এই মন্ত্রে শিবতত্ত্বের ন্যাস করণীয় বলে বিহিত হয়েছে।

ষট্‌চক্র সাধনা-বাসনার সঙ্গে এই আত্মতত্ত্বদিদৃক্ষার সুর রামপ্রসাদের পদাবলীতে অনুরণিত হয়েছে:

'তীর্থ গমন, মিথ্যা ভ্রমণ, মন উচাটন করো না রে।
ও মন, ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস, শীতল হবে অন্তঃপুরে॥'

—ক. বি. শা. প: নামমহিমা

চার্ব্বাকমতে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ ও বায়ু এই চারটি তত্ত্ব। যেহেতু এই মত একমাত্র প্রত্যক্ষকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করে থাকে, সেই হেতু আকাশ অপ্রত্যক্ষ বলে তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত হয় না। এই ক্ষিতি-অপ্-তেজঃ-বায়ু যখন দেহাকারে পরিণত হয়, তখন সেই পরিণামবিশেষের স্বভাব থেকে দেহে চৈতন্য উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যুতে দেহনাশে এই চৈতন্যের নাশ হয়ে থাকে। চৈতন্যের স্বাভাবিক অভ্যুদয় প্রসঙ্গে একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে। সুরার উপাদান বৃক্ষবিশেষের নির্য্যাসে কোন মাদকতা নাই, কিন্তু সেই নির্য্যাস যখন বিকৃত হয়ে সুরায় পরিণত হয়, তখন তাতে মাদকতার উদ্ভব হয়। তাছাড়া, দেহব্যতিরিক্ত আত্মা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা গ্রাহ্য নয়। অতএব চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা—এই-ই চার্ব্বাকসিদ্ধান্ত।

চার্ব্বাকমত

দেহাত্মবাদের স্বপক্ষে প্রাত্যহিক জীবনের অনুভূতিকে চার্ব্বাকপন্থীরা বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণ দৃষ্টিতে আমরা এইরূপ অনুভব করে থাকি—আমি স্থূল, আমি কৃশ, আমি কৃষ্ণ ইত্যাদি। এই অনুভূতিগুলির সাহায্যেই সহজ প্রতীতি হয় যে, স্থূলত্ব, কৃশত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মের আধার ও 'আমি' এই শব্দের বাচ্য একই। এস্থলে পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্ন এই: দেহাত্মবাদে কিভাবে 'আমার শরীর' এই উক্তির উৎপত্তি হয়? চার্ব্বাকপন্থীরা উত্তরে বলেন: রাহুর স্বরূপ শুধু মস্তক, তথাপি ভেদ পরিকল্পনা করে 'রাহুর মস্তক' এইরূপ উক্তি দেখা যায়। সুতরাং 'আমার শরীর' এই উক্তিতে আত্মা ও শরীরের মধ্যে যে ভেদ আক্ষিপ্ত হয়েছে তা কাল্পনিক, প্রকৃত নহে।

শ্রুতিকেও চার্ব্বাকমতাবলম্বীরা তাঁদের দেহাত্মবাদ-প্রতিষ্ঠায় নিযুক্ত করেছেন। শ্রুতিতে আছে: 'স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ'। তৈঃ ২।১।১। এই সে আত্মা যা অন্নরসের বিকার। যেহেতু দেহ অন্নরসে ধৃত হয়, সেই হেতু দেহই আত্মা।

দেহাত্মবাদে আত্মা চৈতন্যাংশে বোধরূপ বা চিৎরূপ এবং দেহাংশে জড়রূপ বা অচিৎরূপ। সুতরাং আত্মা অংশতঃ চিৎ ও অংশতঃ অচিৎ। দেহ যেহেতু নানাবিধ সেই হেতু আত্মাও সংখ্যায় বহু, এক নয়। দেহের উৎপত্তি বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে যেহেতু আত্মার উৎপত্তি বিনাশ হয়, সেই হেতু আত্মা অনিত্য, নিত্য নয়।

অপর চার্ব্বাক-সম্প্রদায় দেহকে আত্মা বলে স্বীকার করেন না, তাঁদের মতে ইন্দ্রিয়ই আত্মা। তাঁদের যুক্তি: ইন্দ্রিয়ের সদ্‌ভাবে শরীরচলনরূপ চৈতন্যকার্য্য পরিলক্ষিত হয়, সুপ্তি ইত্যাদি অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের বিশ্রান্তিকালে উক্ত শরীরচলনরূপ চৈতন্যকার্য্য পরিলক্ষিত হয় না, অতএব অন্বয়ব্যতিরেকমুখী অনুমানে ইন্দ্রিয়গুলিই চৈতন্যমণ্ডিত, দেহ নয়—এইরূপ নিশ্চিত হয়। তাছাড়া, চক্ষুর অভাবে আমি অন্ধ বা কর্ণের অভাবে আমি বধির ইত্যাদি যে অনুভূতিগুলি দেখা যায়, সেগুলিও প্রমাণিত করে যে, ইন্দ্রিয়-সমষ্টিই আত্মা। স্বপক্ষসমর্থক হিসাবে তাঁরা শ্রুতির উল্লেখ করেন: তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্যোচুঃ। ছাঃ ৫।১।৭। সেই সকল ইন্দ্রিয় প্রজাপতির নিকট গমন করে জিজ্ঞাসা করলো—আমাদের মধ্যে 'আত্মা কে'?

অন্য এক সূক্ষ্মবুদ্ধি চার্ব্বাক-সম্প্রদায় উপরোক্ত ইন্দ্রিয়াত্মবাদে আস্থাশীল নন, তাঁরা প্রাণকেই আত্মা বলে থাকেন। তাঁরা এইরূপ যুক্তি প্রদর্শন করে থাকেন: প্রাণধারণযোগ্য অন্নাদির অপ্রাপ্তিহেতু প্রাণ যখন কৃশ হয়, তখন ইন্দ্রিয়সমূহ বিদ্যমান থাকলেও তাদের রূপাদি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি দেখা যায় না; আবার অন্নাদির প্রাপ্তিতে প্রাণের পুষ্টিকালে ইন্দ্রিয়গণের রূপাদি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্তি পরিলক্ষিত হয়। অতএব প্রাণই আত্মা, যে ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়াকারিত্ব প্রাণের অধীন সেই ইন্দ্রিয়সমূহের পক্ষে আত্মা হওয়া কখনই সম্ভব নহে। তাছাড়া, আমি ক্ষুধার্ত্ত এইরূপ প্রাণ-ধর্ম্ম-বিষয়ক অনুভবও সপ্রমাণ করে যে, প্রাণই আত্মা। সমর্থক শ্রুতি: অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ, অন্নময় আত্মা থেকে ভিন্ন অন্নময় আত্মার অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রাণময় সত্তাই আত্মা।

অপর এক সূক্ষ্মতরবুদ্ধি চার্ব্বাক-সম্প্রদায় এইরূপ মত পোষণ করে থাকেন। যেহেতু স্বপ্নে ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া বন্ধ হয়, প্রাণের বৃত্তিরও বিরতি ঘটে, তথাপি কেবল মনের দ্বারাই স্বপ্নের উপলব্ধি হয়,—সেই হেতু মনই আত্মা, ইন্দ্রিয় বা প্রাণ কখনই আত্মা হতে পারে না। তাছাড়া, আমি সংশয়াপন্ন, আমি সঙ্কল্প করি ইত্যাদি অনুভূতি কখনই মনের অভাবে সম্ভবপর নয়। মন আত্মা এই মতের স্বপক্ষে শ্রুতি: অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ। তৈঃ ২।৩।১। প্রাণময় আত্মা থেকে পৃথক প্রাণময় আত্মার অভ্যন্তরে বিদ্যমান মনোময় সত্তাই আত্মা।

চার্ব্বাকমতাবলম্বীদের আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে নিম্নোক্ত শ্লোকগুলি প্রণিধানযোগ্য:

'ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ।
নৈব বর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়াশ্চ ফলদায়িকাঃ॥
মৃতানামপি জন্তূনাং শ্রাদ্ধং চেৎ তৃপ্তিকারণম্।
নির্ব্বাণস্য প্রদীপস্য স্নেহঃ সংবর্দ্ধয়েচ্ছিখাম্॥
যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥
যদি গচ্ছেৎ পরং লোকং দেহাদেষ বিনির্গতঃ।
কস্মাদ্ভূয়ো ন চায়াতি বন্ধুস্নেহসমাকুলঃ॥'

স্বর্গ, মোক্ষ বা পরলোকসঞ্চারী আত্মা নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার বর্ণের এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চার আশ্রমের বিহিত পুণ্যপ্রদ কর্ম্ম থাকাও সম্ভব নয়, অর্থাৎ বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম অভিধেয় কিছুই নাই। যদি শ্রাদ্ধাদি পারলৌকিক কর্ম্ম মৃত ব্যক্তির তৃপ্তিবিধানে সমর্থ হয়, তাহ'লে নির্ব্বাপিত প্রদীপে তৈল দিলে তার শিখায় অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়া উচিত। যতদিন মৃত্যু না হয়, ততদিন সুখেই বাঁচা উচিত। উত্তম খাদ্য সংগ্রহের জন্য ঋণ করতেও পরাঙ্মুখ হওয়া উচিত নয়। কারণ যে দেহ অগ্নি-সংকারের দ্বারা ভস্মীভূত হয়, তার পুনরাবির্ভাব কোন্ সূত্র ধরে সম্ভব? যদি দেহাতীত আত্মা মৃত্যুকালে দেহ থেকে নির্গত হয়ে পরলোকগমন করে থাকে, তাহ'লে সে কেন আত্মীয়-স্বজন-বন্ধুদের স্নেহাসক্তির আকর্ষণে পুনরায় ইহলোকে আগমন করে না?

শক্তিদর্শন তথা শক্তিসাধনার সূচনা দেহাত্মিকা বুদ্ধির অবসানে। তাই শাক্ত কবি আসন্ন দেহাবসানের চিত্রের মাধ্যমে নানাযোনিসঞ্চারী জীবাত্মার মহামোহ সম্বন্ধে তাকে অবহিত করে বলেন:

'এমন করে আর কতদিন করবি রে মন আসা যাওয়া।
পঞ্চভূতের মধ্যে থেকে, তুই কি হলি ভূতে পাওয়া?
কালীমায়ের চরণপানে, একটি দিন হলো না চাওয়া।
যাবি কবে পড়ে রবে জমিখানি চৌদ্দ পোয়া॥'

—রসিকচন্দ্র রায়: ক. বি. শা. প.—মনোদীক্ষা

মৃত্যুরও দিন আসন্ন—

'গমনের দিন আর বাকি নাই, কবে হবে ধরায় শোওয়া।
ওখানেতে চিত্রগুপ্ত বসে আছে মিলিয়ে রেওয়া॥'

—রসিকচন্দ্র রায়: ক. বি. শা. প.—মনোদীক্ষা

তাই কবিবর রসিকচন্দ্র দেহাবস্থিত অবস্থাতেই দেহাতীতা বুদ্ধি নিয়ে মায়ের কাছে মুক্তিকামনা নিবেদন করতে বদ্ধ জীবকে উপদেশ দিয়েছেন।

'রসিক বলে, সুখের কাল তোর এবার হোলো কালে খাওয়া।
এই বেলা মা কালীর কাছে, করে নে রে মুক্তির দাওয়া॥'

—রসিকচন্দ্র রায়: ক. বি. শা. প.—মনোদীক্ষা

কিন্তু মনকেও আত্মা বলে স্বীকার করা যায় না। সে পাঞ্চভৌতিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকে, লিঙ্গশরীরসংসক্ত হয়ে নানা যোনি ভ্রমণ করে, সাধক তাকে মাতৃনাম জপ করার কাজে নিযুক্ত রাখেন, কিন্তু সে তা ভুলে কামাদি-কুসুম সকলের বিষয়-মধুপানে প্রমত্ত হয়। তাই সাধক কবি আক্ষেপ করে বলেন :

'তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়াপাখী।
আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি॥
কালী নাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পুরে মন।
ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি সুখে হলি সুখী॥'

—রামপ্রসাদ : ক. বি. শা. প.—মনোদীক্ষা

শেষে সাধক কবি তাঁকে পুনরায় উপদেশ দেন—

'শিব দুর্গা কালী নাম, জপ কর অবিশ্রাম
মন! ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বল্ রে দেখি॥'

—রামপ্রসাদ : ক. বি. শা. প.—মনোদীক্ষা

সুতরাং কে সেই গুহাহিত গহ্বরেষ্ঠ শাশ্বত পুরুষ যিনি বৃত্তিচঞ্চল প্রশান্ত মনের অধ্যাত্ম দীক্ষার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করছেন?

সাধারণ জীবনে আমরা বৃত্তি-বিক্ষুব্ধ অনুভূতি-সিদ্ধ মনের উপর আত্মধর্ম আরোপ করে তাকেই আত্মা বলে মনে করে থাকি। কিন্তু এই দৃষ্টি কি তত্ত্বদৃষ্টি? উজ্জ্বল শুক্তিকাকে রজত বলে ভুল করতে পারি, কিন্তু আমাদের এই ভুলের জন্য শুক্তিকা কখনই রজত হয়ে যায় না।

তাহ'লে মনের এই চিন্তন-অনুভবন-এষণময় সত্তাকে মুছে ফেললে আত্মার থাকে কি? আত্মা কি নিরাশ্রয় নিরালম্ব আলোহীন বায়ুহীন এমন কি ব্যোম-সত্তাহীন নাস্তিত্ব? কবি রামলাল দাশগুপ্তের পদে আত্ম-স্বরূপান্বেষী সাধক-হৃদয়ের এই শূন্যত্ব-জিজ্ঞাসা সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছে :

'আমার আমার করে মত্ত হই মা অনিবার।
ইন্দ্রিয় আদি দারাসুত সকলই ভাবি আমার।
কিন্তু আমি কোনখানে, ভাবিয়ে না পাই ধ্যানে,

কোন্ পথে গেলে ও মা আমি মিলে দে মা বলে.
দীন রামে ভ্রমে আর রেখ না জননি ॥'

—ভক্তের আকুতি : ক. বি. শা. প.

ভারতীয় দর্শনের আত্মতত্ত্ব-বিচারণার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আমরা এই পর্য্যায়ে পাই শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধ দর্শনাচার্য্যদিগে। তাঁদের মতে,

বৌদ্ধ মত

শুক্তিকায় রজত-ভ্রম স্থলে যখন ভ্রমের নিরসন হয় তখন দ্রষ্টার এইরূপ জ্ঞান হয়, স্বপ্নে ও জাগরণে রজত আমার দ্বারা দৃষ্ট হয় নাই। এখানে 'নাই' এই শব্দের অর্থের কারকান্বিত দর্শনক্রিয়ার সঙ্গে অন্বয় হওয়ায় কারকান্বিত ক্রিয়ার নিষেধই 'নাই' শব্দের দ্বারা বোঝা যাচ্ছে। অতএব দর্শনক্রিয়া, দর্শনক্রিয়ার কর্ত্তা অর্থাৎ দ্রষ্টা এবং দর্শনক্রিয়ার কর্ম্ম অর্থাৎ দৃশ্য, এক্ষেত্রে শুক্তিকা, রজতত্ব ও শুক্তিকা-রজতত্বের সম্বন্ধ—সমস্তই এখানে নিষিদ্ধ হচ্ছে। শ্রীমৎ সায়নমাধবাচার্য্য তাঁর সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে, বৌদ্ধ দর্শন-আলোচনাপ্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য করেছেন :

'ন হি কুক্কুট্যা একো ভাগঃ পাকায় অপরো ভাগঃ প্রসবায় কল্প্যতামিতি কল্প্যতে। তস্মাৎ অধ্যস্তাধিষ্ঠানতৎসংবন্ধদর্শনদ্রষ্টৄণাং মধ্য একস্যানেকস্য বা অসত্বে নিষেধবিষয়ত্বেন সর্ব্বস্যাসত্ত্বং বলাৎ আপতেদিতি ভগবতো উপদিষ্টে মাধ্যমিকাস্তাবৎ উত্তমপ্রজ্ঞা ইত্থমচীকথন্—ভিক্ষুপাদপ্রসারণন্যায়েন ক্ষণভঙ্গাদ্যভিধানমুখেন স্থায়িত্বানুকূলবেদনীয়ত্বানুগতত্বসর্ব্বসত্যত্বভ্রমব্যাবর্ত্তনেন সর্ব্বশূন্যতায়ামেব পর্য্যবসানম্। অতস্তত্বং সদসদুভয়াত্মকচতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যমেব।'

একই কুক্কুটীর শরীরের একাংশ পাক হচ্ছে ও অপরাংশ শাবক প্রসব করছে, এইরূপ কল্পনা করা যায় না। অতএব অধ্যস্ত, অধিষ্ঠান, উভয়ের সম্বন্ধ, দর্শনক্রিয়া ও দ্রষ্টার মধ্যে এক বা একাধিক যদি অসৎ হয়, তাহ'লে সবকটিই নিষেধের বিষয়ীভূত বলে অসৎ হবে। তাই উত্তমবুদ্ধি মাধ্যমিক বৌদ্ধ সম্প্রদায় এইরূপ মত প্রকাশ করেন—বামনরূপী বিষ্ণু যেমন এক পা এক পা করে অগ্রসর হয়ে ত্রিপাদে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল গ্রাস করেছিলেন, তেমনি ক্ষণিকবাদ সিদ্ধির মাধ্যমে 'সর্ব্বং ক্ষণিকং ক্ষণিকং' 'সর্ব্বং দুঃখং দুঃখং, সর্ব্বং স্বলক্ষণং স্বলক্ষণং' ও পরিশেষে 'সর্ব্বং শূন্যং শূন্যং' এই মতবাদগুলি স্বাভাবিকভাবেই সিদ্ধ হয়। যেহেতু তত্ত্বকে সৎ, অসৎ, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই উভয়ধর্ম্ম-

বিশিষ্ট বা সত্ত ও অসত্ত্ব এই উভয়ধর্ম্ম-বর্জ্জিত—কোনও কিছুই বলা চলে না, সেহেতু তত্ত্ব শূন্যই।

শূন্যবাদ-প্রতিষ্ঠায় আরও যুক্তিজাল এইরূপে বিস্তৃত করা হয়েছে—যদি ঘটাদি বস্তুর সত্ত্বই স্বভাব, তাহ'লে তার কারণ থাকার প্রয়োজন নাই। আর যদি ঘটাদি বস্তু অসৎ-ই হয়, তাহ'লে তার কারণ থাকা সম্ভব নয়। ঘটাদি বস্তু হয় সৎ নয় অসৎ। সুতরাং ঘটাদি বস্তুর স্বভাব সম্বন্ধে কোনও কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না।

'বুদ্ধ্যা বিবিচ্যমানানাং স্বভাবো নাবধার্য্যতে।
অতো নিরভিলপ্যাস্তে নিঃস্বভাবাশ্চ দর্শিতাঃ॥ ইতি
ইদং বস্তুবলায়াতং যৎ বদন্তি বিপশ্চিতঃ।
যথা যথার্থাশ্চিন্ত্যন্তে বিশীর্য্যন্তে তথা তথা॥ ইতি চ।'

— সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ : বৌদ্ধ দর্শন

বুদ্ধি দ্বারা বিচারে বস্তুসমূহের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। এইজন্যই বস্তু-সমূহের স্বরূপ সম্বন্ধে কোন স্থির মন্তব্য করা চলে না। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ বস্তুসমূহের স্বরূপ নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। পরিদৃশ্যমান জগতে যেগুলিকে বস্তু নামে অভিহিত করা যায়, সেগুলির স্বরূপ সম্বন্ধে চিন্তা শুরু করলে পরিশেষে দেখা যাবে যে, তাদের কোন সঠিক স্বরূপই নাই।

অনঙ্গ আত্মা যদি নিরাধার নিঃসীম নাস্তিত্ব হয়, তাহ'লে প্রাত্যহিক জীবনের সুখ-দুঃখ-আশা-নৈরাশ্যের দোলাচঞ্চল চেতনাস্পর্শী লোকব্যবহারও কি অন্তঃসারহীন মহাশূন্য? শূন্যবাদী বৌদ্ধ বলেন, স্বপ্নব্যবহারের মতো লোক-ব্যবহারও মায়িক। শাক্ত কবি বলেন, মহামায়ার প্রভাবেই জীব হর্ষবিষাদময় সংসার-যাত্রাকে পারমার্থিক বলে মনে করে ও তাতে আকৃষ্ট হয়। তাই সাধক কবি রামপ্রসাদের নিদারুণ মর্ম্মদাহী আক্ষেপ :

'মা আমায় ঘুরাবি কত,
কলুর চোখঢাকা বলদের মত?
ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।'

—ক. বি. শা. প. : ভক্তের আকুতি

কলুর চোখ-ঢাকা বলদ এক জায়গায় আবদ্ধ থেকে ঘানিগাছের চারদিকে ঘোরপাক দিলেও অজ্ঞানবশতঃ মনে করে, সে সামনের দিকে সোজা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে চলেছে। সেইরূপ প্রাত্যহিক লোকব্যবহার স্বপ্নব্যবহারের মতো অলীক হ'লেও, বদ্ধ জীব অবিদ্যা-প্রভাবে তাকে পারমার্থিক বলে ভুল করে।

কিন্তু লোকব্যবহারকে স্বপ্নব্যবহারের মতো কাল্পনিক বললেও সব সমস্যার কি সমাধান হয়? পরিদৃশ্যমান জগতের সামনে চোখ বুজে বসে থাকলেও দেহের মধ্যে যে সতত অনুভববেদ্য স্বয়ংবেদন রয়েছে তা তো কৈ কুয়াশা হয়ে মিলিয়ে যায় না!

তাই বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ দার্শনিক ধর্মকীর্ত্তি বলেন, 'অপ্রত্যক্ষোপলম্ভস্য নার্থদৃষ্টিঃ প্রসিধ্যতি', যে দ্রষ্টার স্বস্বরূপ-সম্বন্ধেই উপলম্ভ হয় না, তার পক্ষে বাহ্য বস্তুদর্শন কখনই সম্ভব নয়। এই বোধই একমাত্র তত্ত্ব। অনাদিভেদ-বাসনাবশতঃই এই একমাত্র বোধকে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানরূপে ত্রিবিধ বিভক্ত বলে মনে হয়।

> 'সহোপলম্ভনিয়মাদভেদো নীলতদ্ধিয়োঃ।
> ভেদশ্চ ভ্রান্তিবিজ্ঞানৈর্দৃশ্যেতেন্দাবিবাদ্বয়ে॥ ইতি।
> অবিভাগোঽপি বুদ্ধ্যাত্মা বিপর্য্যাসিতদর্শনৈঃ।
> গ্রাহ্যগ্রাহকসংবিত্তিভেদবানিব লক্ষ্যতে॥ ইতি চ।'

—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ : বৌদ্ধ দর্শন

নীল অর্থাৎ বিষয় ও বিজ্ঞানের সহোপলম্ভ নিয়মিত দেখা যায়। এই দুটির মধ্যে একটির উপলম্ভের অভাবে অন্যটির উপলম্ভ হয় না। সুতরাং যেমন সহোপলম্ভবশতঃ ঘট ও মৃত্তিকা অভিন্ন এইরূপ অনুমিত হয়, তেমনি সহোপলম্ভ-হেতু বিষয় ও বিজ্ঞানের অভিন্নতা অনুমান-সিদ্ধ। কিন্তু জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানের পার্থক্যের উপলব্ধি এক চন্দ্রে দ্বিতাবভাসের মতোই ভ্রম। যদিও বুদ্ধ্যাত্মা অর্থাৎ বুদ্ধি-স্বরূপ-তত্ত্বও অবিভক্ত তথাপি যাদের দৃষ্টি অনাদিভেদবাসনাবশতঃ বিপর্য্যাস প্রাপ্ত হয়েছে, তারা সেই একক বুদ্ধি-স্বরূপকে জ্ঞেয়, জ্ঞাতা ও জ্ঞানরূপে ত্রিধা-বিভক্ত মনে করে থাকেন।

সুতরাং আত্মা অরূপ অরস অগন্ধ অস্পর্শ অশব্দ অসীম অরন্ধ্র শূন্যতা নয়,

সতত অনুভূত স্বয়ংবেদনেই আত্মা প্রকাশময়। কিন্তু এই স্বানুভূতি কি একত্ব-বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ চৈতন্যাংশ ?

সহজ উত্তর আসে, সে উত্তর নেতিবাচক। মানসিক অনুভূতিই প্রমাণিত করে তৈলধারার মতো অবিচ্ছিন্ন সতত বিরাজমান এক চৈতন্য-প্রবাহ। স্বয়ংবেদন যেন একটি কুসুমমালিকা, আর তার উপাদানীভূত কুসুমগুলি হ'ল ক্ষণস্থায়ী চৈতন্যাংশসমূহ। এই অনুভূতির সুরের সঙ্গে বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য্যদের আত্মস্বরূপ-নির্ণয়ের সুরটির সুস্পষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায়।

বৌদ্ধ দার্শনিক ক্ষণভঙ্গবাদী[১]। তাই তাঁর অভিমত : ক্ষণিক বুদ্ধি বা বিজ্ঞানের যে প্রবাহ তাই আত্মা। এ সম্বন্ধে শ্রুতি প্রমাণ হ'ল তৈত্তিরীয় সংহিতার উক্তি 'অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়'। অন্তরাত্মা অন্য অর্থাৎ মন থেকে ভিন্ন, তিনি বিজ্ঞানময়। শ্রুতির মননমূলক যুক্তি এই : যে পদার্থের ব্যাপারের ফলে ক্রিয়ানিষ্পত্তি হয়, তাকে করণ বলে, যেমন—ছেদনরূপ ক্রিয়ার করণ অস্ত্র। মনের ব্যাপারবশতঃই জ্ঞানরূপ ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। অতএব মন করণ। কিন্তু করণ স্বব্যাপারের স্রষ্টা নয়। কর্ত্তা তার উপর ব্যাপার প্রয়োগ করেন। যেমন—অস্ত্র কর্ত্তার দ্বারা চালিত হয়েই ছেদনরূপ ক্রিয়ার নিষ্পাদনে ব্যাপৃত হয়। মন যখন করণ, তখন মনকে প্রয়োগ করে এরূপ কোনও কর্ত্তা নিশ্চয়ই আছে। সে কর্ত্তা বুদ্ধি বা বিজ্ঞান। বুদ্ধি বা বিজ্ঞানই আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা ইত্যাদি প্রকার অনুভব করে থাকে। সুতরাং মন থেকে ভিন্ন অথচ মনের চালক বুদ্ধি বা বিজ্ঞানই যে আত্মা, এই শ্রুতি-বাক্য যুক্তি দ্বারা উপলব্ধ হ'ল।

কিন্তু তর্কশাস্ত্রের শুষ্ক নীরস যুক্তি ও মনের স্বচ্ছ সহজ অনুভূতি উভয়ের সমন্বয় সাধন না করতে পারলে, দার্শনিক বা কবি কারুরই তো তৃপ্তি নাই। উভয়েই ক্রান্তদর্শী, উভয়েই পরিদৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চের গূঢ়তলচারী, রহস্যময়

১। 'যৎ সৎ তৎ ক্ষণিকং যথা জলধরঃ সন্তশ্চ ভাবা অমী।
সত্তা শক্তিরিহার্থকর্ম্মণি, মিতেঃ, সিদ্ধেষু সিদ্ধা ন সা॥
নাপ্যেকৈব বিধান্যথা পরকৃতেনাপি ক্রিয়াদির্ভবেৎ।
দ্বেধাপি ক্ষণভঙ্গসঙ্গতিরতঃ সাধ্যে চ বিশ্রাম্যতি॥' —সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ : বৌদ্ধ দর্শন

সত্তার পরম অনুভূতিলাভের চরম পথের পথিক। তাই শ্রবণ-মননের পরই নিদিধ্যাসন অনুষ্ঠানের অত্যাবশ্যক আয়োজন।

ক্ষণভঙ্গুর বিজ্ঞান-সমষ্টি আত্মা। তর্কশাস্ত্রের অমোঘ অনুশাসনে স্বীকার করতে হয় কিন্তু মনের সহজ অনুভূতির স্বচ্ছন্দ গতিতে এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় কি?

বিষয়াসক্ত মনের সততচঞ্চল ভাবনিচয়ের দৌরাত্ম্যে অধ্যাত্ম-চিন্তার অবসরের অভাবের জন্য আদ্যাশক্তিকে দায়ী করে কবি আক্ষেপ করেছেন:

'চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি?
নামে জগৎ-চিন্তাময়ী, ব্যাভারে কৈ তেমন দেখি।
প্রভাতে দাও বিষয়চিন্তে, মধ্যাহ্নে জঠরচিন্তে,
ওমা শয়নে দাও সর্ব্ব চিন্তে,
বল মা তোরে কখন ডাকি॥
অচিন্ত্যরূপিণী মেয়ে, পরম চিন্তামণি পেয়ে,
রয়েছ নিশ্চিন্ত হয়ে, শম্ভুচাঁদকে দিয়ে ফাঁকি॥'

—শম্ভুচন্দ্র রায় (কুমার): ক. বি. শা. প—ভক্তের আকুতি

যাঁর চিন্তনে জগৎ উদ্ভূত, যাঁর রূপ চিন্তার অগম্য, তিনি পরম চিন্তামণি মহেশ্বরকে পেয়ে ভক্ত কবির অধ্যাত্ম উন্নতির জন্য মোটেই চিন্তা করেন না। চিন্তা করলে কি তিনি কবিকে এমনভাবে নানা চিন্তায় জর্জ্জরিত করতে পারতেন। প্রভাতে বিষয়-চিন্তা, মধ্যাহ্নে জৈব-প্রয়োজন-সংসিদ্ধির চিন্তা, শয়নে অশেষ চিন্তা—এইভাবে কবির মনে নানা স্মৃতির অভ্যুদয় হচ্ছে।

এখন বিবেচ্য এই: কবির আত্মতত্ত্ব যদি ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞান-প্রবাহ হয়, তাহ'লে তাঁর পক্ষে কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন কাল-সংঘটিত ঘটনাবলীকে স্মৃতিপথে আনা সম্ভব হতে পারে?

তাছাড়া, জীবের পারলৌকিক গতি ও নানা-যোনি-সঞ্চরণ সম্বন্ধেও সুস্পষ্ট অনুভূতি কবিচিত্তে বিদ্যমান। আত্মার এই যাতনাময় সংসরণ সম্পর্কে আদ্যা-শক্তির কাছে শাক্ত কবির তো অনুযোগের অন্ত নাই।

'আর কত কাল ভুগবে৷ কালী, হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া।
এই ভবকূপে, কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া॥

আশীলক্ষ পাটে ঠেকে সর্ব্বাঙ্গে পড়েছে কড়া।
আবার গলায় কশা, শক্ত ফাঁসা, মায়ামোহ দড়িদড়া ॥
যুগে যুগে মলেম ভুগে, কিছুতে নাই নড়াচড়া।
শীতে কাঁপি, জলে ভিজি, রোদেতে হই বেগুন পোড়া ॥
রোগ ছিদ্রতে কাল নিদাতে, যখন থাকি হয়ে খোঁড়া।
জীবাত্মা কাঁসারি বেটা, অমনি এসে দেয় মা জোড়া ॥
কি অপরাধ করেছি মা, এত কেন শাস্তি কড়া।
কবি কয়, তোর পায় পড়ি, আর করো না ফাড়া ছেঁড়া ॥'

—প্যারীমোহন কবিরত্ন : ক. বি. শা. প.—ভক্তের আকুতি

সুতরাং কে এই নানা-যোনি-সঞ্চারী স্থিরসত্তাময় জীবাত্মা, যে ক্ষণস্থায়ী দুঃখময় অনুভূতি-অংশগুলিকে ঐক্যসূত্রে বিধৃত করে?

কর্ম্মফলের অনন্ত বৈচিত্র্যহেতু যে পার্থিব ভোগবৈচিত্র্য, সে সম্বন্ধেও শাক্ত কবির সচেতনতা জগজ্জননীর প্রতি আকুল আর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে :

'ও মা কারে করেছ রাজ্যেশ্বর মা অতুল ধনের অধিকারী,
কারে করেছ পথের কাঙ্গাল মুষ্টিমেয় অন্নের ভিখারী,
কেউ বা সুখে কাটায় নিশি পুষ্প শয্যায় শয়ন করি,
কেউ বা গাছের তলায় তৃণ শয্যায় দুঃখে কাটায় মা বিভাবরী—'

—গোবিন্দ চৌধুরী

'সকলি তোমার খেলা বুঝেও বুঝিনে।'

—ক. বি. শা. প. : মা কি ও কেমন

জীবাত্মা যদি ক্ষণিক বিজ্ঞান-সন্ততি হয়, তাহ'লে কর্ম্মফলানুযায়ী কারও অতুল ধনের অধিপতিত্ব, কারও মুষ্টিমেয় অন্নেরও অভাব, কারও পুষ্পশয়নের আরাম, কারও বা তৃণশয়নের দুর্ভোগ সম্ভবপর হয় না। কারণ, কর্ম্ম-করণ-কালের কর্ত্তা জীব ও ফলভোগকালীন জীব এক ব্যক্তি নয়, উভয়েই পৃথক পৃথক ব্যক্তি। ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞান-প্রবাহকে উভয়ের রূপ বলে স্বীকার করলে উভয়কে আর এক বলার উপায় থাকে না।

এই পর্য্যায়ে আমরা জৈন দার্শনিকদের আত্মা সম্বন্ধে চিন্তাধারার সম্মুখীন হই। শ্রীমৎ সায়নমাধবাচার্য্যের সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ গ্রন্থের জৈন দর্শন সম্বন্ধীয় নিম্নরূপ বিবৃতি থেকেই আত্মা সম্বন্ধে বৌদ্ধ মতের দুর্ব্বলতা ও জৈন মতের বৈশিষ্ট্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে :

জৈন মত

'তদিত্থং মুক্তকচ্ছানাং মতমসহমানা বিবসনাঃ কথঞ্চিৎ স্থায়িত্বমাস্থায ক্ষণিকত্বপক্ষং প্রতিক্ষিপন্তি। যদ্যাত্মা কশ্চিৎ নাঙ্গীয়েত স্থায়ী তদিহলৌকিক-পারলৌকিকফলসাধনসংপাদনং বিফলং ভবেৎ। ন হ্যেতৎ সংভবতান্যঃ করোত্যন্যো ভূঙক্ত ইতি। তস্মাৎ যোঽহং প্রাককর্ম্মাকরবং সোঽহং সংপ্রতি তৎফলং ভুঞ্জ ইতি পূর্ব্বাপরকালানুযায়িনঃ স্থায়িনস্তস্য স্পষ্টপ্রমাণাবসিততয়া পূর্ব্বাপরভাগ-বিকলকালকলাবস্থিতিলক্ষণক্ষণিকতা পরীক্ষকৈরহর্ভির্ন পরিগ্রহার্হা'।

জৈন দার্শনিকগণ বৌদ্ধ দার্শনিকদের মত স্বীকার করেন না। তাঁরা বস্তুর স্বরূপকে স্থায়ী বলে মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী এবং এইজন্যই তাঁরা বৌদ্ধদের ক্ষণভঙ্গবাদ খণ্ডন করেছেন। তাঁদের যুক্তি এইরূপ : যদি আত্মাকে স্থায়ী পদার্থ না বলা হয়, তাহ'লে ইহলোক ও পরলোকে কর্ম্মফলের ভোগ সম্ভব হয় না। কারণ, এক ব্যক্তি কর্ম্ম করে ও অন্য ব্যক্তি সেই কর্ম্মের ফল ভোগ করে, এইরূপ পরিস্থিতি কল্পনারও অতীত। সুতরাং যে আমি পূর্ব্বে কর্ম্ম করেছিলাম সেই আমি-ই তার ফল বর্ত্তমানে ভোগ করছি, এইরূপ অনুভূতির বলে পূর্ব্বকাল ও পরকাল উভয় কালেই অবস্থিত কোন স্থায়ী পদার্থই আত্মারূপে প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। ক্ষণভঙ্গবাদে বস্তুর স্থিতিকাল কালকলা অর্থাৎ কালের সূক্ষ্মাংশ, যার পূর্ব্বভাগ ও উত্তরভাগ এইরূপ বিভাগ হয় না। উপরোক্ত যুক্তি অনুযায়ী জৈন দার্শনিকগণ বৌদ্ধ দার্শনিকদের এই ক্ষণভঙ্গবাদকে অশ্রদ্ধেয় বলে বিবেচনা করেন।

জৈন দার্শনিক হেমচন্দ্র আত্মা-সম্বন্ধীয় বৌদ্ধ মত খণ্ডনের সময় পাঁচটি দোষের কথা উল্লেখ করেছেন। সেগুলি হ'ল : কৃতপ্রণাশদোষ, অকৃতকর্ম্ম-ভোগদোষ, ভবভঙ্গদোষ, প্রমোক্ষভঙ্গদোষ ও স্মৃতিভঙ্গদোষ।

'কৃতপ্রণাশাকৃতকর্ম্মভোগভবপ্রমোক্ষস্মৃতিভঙ্গদোষান্।
উপেক্ষ্য সাক্ষাৎ ক্ষণভঙ্গমিচ্ছন্নহো মহাসাহসিকঃ পরোঽসৌ॥'

—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ : জৈন দর্শন

কৃতপ্রণাশদোষ, অকৃতকর্ম্মদোষ, ভবভঙ্গদোষ, প্রমোক্ষভঙ্গদোষ ও স্মৃতিভঙ্গ-দোষ—এই পাঁচটি অনুভব-সিদ্ধ দোষকে প্রত্যক্ষ করে তাদিগে উপেক্ষা করে সমস্ত বস্তু উৎপত্তির পরক্ষণেই বিনষ্ট হয়, এই মত পোষণ করেন যে বৌদ্ধ তিনি কি চূড়ান্ত মাত্রায় অবিমৃষ্যকার্য্যকারী !

মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের দর্শনাঙ্কুর নামক যে টীকা লিখেছেন, তাতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ বিশ্লেষণ করা হয়েছে :

বৌদ্ধ মতে ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞান-সন্ততিই আত্মা। ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞানাংশগুলিতে অনুস্যূত বিজ্ঞান ভিন্ন কোন পদার্থ বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন না। সুতরাং যে ক্ষণিকবিজ্ঞানের দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয়েছিল, তার নিশ্চিহ্ন বিনাশের ফলে তার পক্ষে কর্ম্মফল ভোগ করা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে যে ক্ষণিকবিজ্ঞান কর্ম্মফল ভোগ করছে, তার দ্বারা কর্ম্ম কৃত হয় নাই। এইভাবে যে কর্ম্ম করে তার ফলভোক্তা না হওয়ায় কৃতপ্রণাশদোষ। অপরপক্ষে নিজের দ্বারা কৃত হয় নাই অথচ পরের দ্বারা কৃত কর্ম্মের ফল লাভ হওয়ায় অকৃতকর্ম্মভোগদোষ। তাছাড়া, যে সংসার পূর্ব্বজন্মকৃত কর্ম্মানুসারে নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই সংসার ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ জ্ঞাতার ক্ষেত্রে উদ্ভূত হওয়া অসম্ভব। এই পরিস্থিতিই ভব-ভঙ্গদোষ। অধিকন্তু ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ আত্মার মোক্ষের জন্য কেউ প্রযত্নবান হবে না। এইটি হ'ল মোক্ষভঙ্গদোষ। পরিশেষে বিচার্য্য হ'ল যে, বৌদ্ধ মতে যে অনুভব করে তার সদ্য বিনাশের ফলে স্মৃতি কিরূপে সম্ভব হয় ? এই প্রত্যক্ষ-অনুভব-সিদ্ধ স্মৃতির অনুপপত্তিই স্মৃতিভঙ্গদোষ।

জৈন দার্শনিক শাক্ত দার্শনিক ও শাক্ত কবিদের মতো কর্ম্মফলের সঙ্গে সংসারী জীবাত্মার সম্পর্ক সম্বন্ধে একমত।

জৈন দর্শনে জীব ও কর্ম্মের মিশ্রণকে প্রদেশবন্ধ বলা হয়। এ সম্পর্কে মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্করের উক্ত দর্শনাঙ্কুর টীকার মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

"জীবকর্ম্মণোবয়বানাং মিথো যৎ মিশ্রণং স প্রদেশবন্ধঃ। তেন চ প্রদেশ-বন্ধেন অয়ং জীবঃ কর্ম্মণা সহ একীভূতো ভবতি। ভেদেন জ্ঞাতুং ন শক্যতে। যথা দুগ্ধং জলমিশ্রিতং জলেন সহ একীভূতং পার্থক্যেন জ্ঞাতুং ন শক্যতে তদ্বৎ।

উপযোগেন তু অয়ং জীবাত্মা স্বস্মিন্ মিশ্রিতেভ্যঃ কর্ম্মপারমাণুভ্যঃ সকাশাৎ পার্থক্যেন জ্ঞাতুং শক্যতে। কর্ম্মপুদ্গলানাং চৈতন্যরূপেণ পরিণামাভাবাৎ।"

জীব ও কর্ম্মের অবয়বদের পরস্পর যে মিশ্রণ তাই প্রদেশবন্ধ। এই প্রদেশবন্ধের জন্যই জীব কর্ম্মের সঙ্গে একাত্মতাপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ কর্ম্ম থেকে পৃথক ভাবে উপলব্ধ হয় না। এস্থলে দৃষ্টান্ত এই: যেমন জল-মিশ্রিত দুগ্ধ জল থেকে ভিন্ন রূপে দেখা যায় না, তেমনি কর্ম্মবলে সংসারী জীবের কর্ম্ম থেকে অভিন্ন রূপে প্রতীতি হয় না। কিন্তু এই জীবাত্মাকে স্বমিশ্রিত কর্ম্মখণ্ড থেকে পৃথকরূপে জানা সম্ভব, কারণ, চৈতন্যরূপে পরিণাম কর্ম্মপুদ্গলের ধর্ম্ম নয়।

শাক্ত দার্শনিক ও শাক্ত কবিদের সংসারী জীবের কর্ম্মবন্ধ সম্বন্ধে অনুরূপ অনুভূতি নিম্নোক্ত পদে সুস্পষ্ট হয়েছে:

'দোষ কারো নয় গো মা,
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।
ষড়রিপু হলো কোদণ্ডস্বরূপ,
পুণ্যক্ষেত্র মাঝে কাটিলাম কূপ।
সে কূপে ব্যাপিল,—কালরূপ জল—কালমনোরমা।'

—দাশরথি রায়: ক. বি. শা. প.—ভক্তের আকূতি

এই কর্ম্মচক্রে সংসরমান অবস্থায় শাক্ত কবি মহাদেবী শক্তিকে আশ্রয় করতে চান, কিন্তু কর্ম্মদোষে তাও পারেন না।

'পঞ্চভূত, ছয়টা রিপু, দশেন্দ্রিয় মহা লেঠে,
তারা কারো কথা কেউ শুনে না, দিন তো আমার গেল কেটে॥
যেমন অন্ধজনে হারা দণ্ড পুনঃ পেলে ধরে এঁটে।
আমি তেমনি মত ধরতে চাই মা, কর্ম্মদোষে যায় গো ছুটে॥'

—রামপ্রসাদ: ক. বি. শা. প.—ভক্তের আকূতি

তাই এই কর্ম্মবন্ধন কাটার জন্যই মহাদেবীর কাছে ভক্তকবির ব্যাকুল আবেদন:

'প্রসাদ বলে, ব্রহ্মময়ি, কর্ম্মড়ুরি দে মা কেটে।
প্রাণ যাবার বেলা এই করো মা ব্রহ্মরন্ধ্র যায় যেন ফেটে।'

—রামপ্রসাদ: ক. বি. শা. প.—ভক্তের আকূতি

কিন্তু কর্ম্মবন্ধের হেয়তা সম্বন্ধে জৈন দার্শনিকদের সঙ্গে দার্শনিক শাক্ত কবির চিন্তাধারায় ঐক্য পরিলক্ষিত হ'লেও এই কর্ম্মবন্ধনকে কেন্দ্র করে জৈন দার্শনিক আত্মস্বরূপ সম্বন্ধে যে সব মতবাদ ব্যক্ত করেছেন, দার্শনিক শাক্ত কবি ঠিক সেই সব মতবাদকে আরো মার্জ্জিত করে তাদিকে ঔপনিষদিক যুক্তির সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করেছেন।

তাই দার্শনিক শাক্ত কবি কর্ম্মবন্ধে সংসারী জীবাত্মার পরিমাণকে জৈন দার্শনিকদের মতো অণু বলেন নাই। জৈন দার্শনিকদের মতে, আত্মা মধ্যম পরিমাণ অর্থাৎ দেহপরিমাণ। কিন্তু শাক্ত সিদ্ধান্তে আত্মা বিভুপরিমাণ, জগদ্ব্যাপী চৈতন্যই আত্মতত্ত্ব। একটি প্রসিদ্ধ শাক্ত পদে আত্মতত্ত্বের এই ব্যাপক চিন্ময় সত্তা নিখুঁতভাবে রূপায়িত হয়েছে :

"ও মা কালী চিরকালই সং সাজালি সংসারে।
এ সং সাজায় নাইকো মজা, সাজা পাই যে অন্তরে॥
ও মা কভু ভূতল অনিলে, কভু ব্যোম রসাতলে,
কভু বারিধি সলিলে সাজাও নানা আকারে॥
আমি ভ্রমিয়া অশেষ দেশ ধরিলাম অশেষ বেশ,
তবুও না হল শেষ—বলিহারি মা তোমারে।
প্রেমিক বলছে, আমার মন যে পাজি,
তাই তো প্রলোভনে মজি।
নইলে তোমার এ কারসাজি খাটত কি বারে বারে।"

—মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রেমিক : ক. বি. শা. প.—লীলাময়ী মা

আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে কবির এই শাক্ত সিদ্ধান্ত জৈন দার্শনিকের আত্মা দেহ-পরিমাণ, এই মতের মতো ত্রুটিপূর্ণ নয়। আত্মা যে দেহপরিমাণ অর্থাৎ আত্মার বিস্তৃতি যে দেহের বিস্তৃতির সমান—এই মতবাদের খণ্ডন সায়নমাধবাচার্য্য-বিরচিত সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে নিম্নরূপে ব্যক্ত হয়েছে :

"তথা জীবস্য দেহানুরূপপরিমাণত্বাঙ্গীকারে যোগবলাৎ অনেকদেহপরি-গ্রাহকযোগিশরীরেষু প্রতিশরীরং জীববিচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত। মনুজশরীরপরিমাণো জীবো মতঙ্গজদেহং কৃৎস্নং প্রবেষ্টুং ন প্রভবেৎ। কিংচ গজাদিশরীরং পরিত্যজ্য পিপীলিকাশরীরং বিশতঃ প্রাচীনশরীরসন্নিবেশবিনাশোঽপি প্রাপ্নুয়াৎ।"

আত্মার পরিমাণকে যদি দেহপরিমাণের সমান বলে মনে করা হয়, তাহ'লে যোগশক্তিতে যোগীর একাধিক শরীর-ধারণের ক্ষেত্রে এক-একটি শরীরে এক-একজন পৃথক আত্মা আছেন, এইরূপ স্বীকার করতে হয়। তাছাড়া, জন্মান্তরের ক্ষেত্রে যদি আত্মা মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করে হস্তিদেহ ধারণ করেন, তাহ'লে মনুষ্যদেহপরিমাণ আত্মা সমগ্র হস্তিদেহকে ব্যাপ্ত করে অধিষ্ঠিত হতে পারবেন না। পরে হস্তিদেহাশ্রয়ী আত্মা যদি জন্মান্তরে পিপীলিকাদেহে অনুপ্রবিষ্ট হন, তাহ'লে তাঁর পূর্ব্বকালীন হস্তি-অবয়বের একটি বৃহৎ অংশকে স্থানাভাবে বিনষ্ট হতে হবে।

আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় উপরোক্ত শাক্ত পদে নানা-যোনি-সঞ্চারী আত্মা যে একপ্রকার স্থির সত্তা তা স্বীকৃত হয়েছে। দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ বাহ্যমাত্র, কবির ভাষায় 'অশেষবেশধারণ'।

এই পর্য্যায়ে দার্শনিক শাক্ত কবির মতবাদ মীমাংসা ও ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের আত্মা-সম্বন্ধীয় মতবাদের সঙ্গে অনেকাংশে সাম্যবিশিষ্ট।

মীমাংসাদর্শনে আত্মতত্ত্বের বিচার নিম্নলিখিত শ্লোকে উপনিবদ্ধ হয়েছে :

"স চ দেহেন্দ্রিয়জ্ঞানসুখেভ্যো ব্যতিরিচ্যতে।
মীমাংসা মত নানাভূতো বিভুর্নিত্যো ভোগস্বর্গাপবর্গভাক্॥"

—মানমেয়োদয়ঃ (পৃঃ ২৫)

সেই আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়, অনুভূতি ও সুখ থেকে পৃথক। আত্মা সংখ্যায় বহু, ব্যাপক, শাশ্বত পদার্থ, ভোগ, স্বর্গ ও মোক্ষ পাবার অধিকারী।

উক্ত শ্লোকের যে মর্ম্মার্থ-বিশ্লেষণ মানমেয়োদয়কার শ্রীমৎ নারায়ণাচার্য্য করেছেন, তা সুধী সহৃদয় পাঠকের অনুধাবনের জন্য এখানে উৎকলিত করা হ'ল।

"অত্র কেচিৎ স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যাদিপ্রত্যয়ানাং শরীরগতস্থৌল্য-কার্শ্যাদিবিষয়ত্বাৎ স্থৌল্যকার্শ্যাদ্যধিকরণং শরীরমেবাত্মেতি সঙ্গিরন্তে। তদযুক্তম্। আত্মবিশেষগুণানাং সুখদুঃখাদীনাং শরীরগুণত্বানুপপত্তেঃ। যদি সুখদুঃখাদয়ঃ শরীরবিশেষগুণাঃ তর্হি তে যাবচ্ছরীরমবতিষ্ঠেরন্। ন হি তে মৃতশরীরেষু উপলভ্যন্তে। তস্মাৎ সুখদুঃখাদীনামন্যাশ্রয়ত্বমবশ্যাশ্রয়ণীয়ম্। ইতি সিদ্ধঃ সুখদুঃখাদ্যাশ্রয়স্যাত্মনস্তদনাশ্রয়াৎ দেহাৎ ভেদঃ। স্থূলোঽহং কৃশোঽহমিত্যাদি-

বুদ্ধিস্তু শরীরাত্মনোরত্যন্তসংসৃষ্টতয়া তোয়ৌষ্ণ্যপ্রত্যয়বদিতি দ্রষ্টব্যম। দৃশ্যতে চ মম শরীরমিতি শরীরাত্মনোর্ভেদব্যপদেশঃ।

ন চেন্দ্রিয়াণামাত্মত্বম্। তত্র বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং ভৌতিকত্বাৎ, ভূতেষু চাত্ম-গুণানাং চৈতন্যাদীনামনুপলম্ভাৎ কার্য্যগুণস্য চ কারণগুণপূর্ব্বকত্বনিয়মাৎ অচেতন-ভূতারব্ধানাং তেষামাত্মত্বং নিরাকরণীয়ম্। ইয়মেব যুক্তিঃ দেহাত্মবাদি-নিরাকরণেঽপি সমর্থেত্যবগন্তব্যম্।

অপরোক্ষতয়া সিদ্ধরূপাৎ আত্মনস্তৎসমবেতসুখদুঃখাদ্যপরোক্ষ্য সাধনেন্দ্রিয়ত্বেন সাধ্যরূপস্য অন্তঃকরণস্য ভেদাবগমঃ পুনরনায়াসসাধ্য এব।

ন চ জ্ঞানমেবাত্মা। তস্য ক্ষণিকত্বাৎ। আত্মনস্তু যোঽহং প্রাক্ দুঃখমন্বভূবং স এবেদানীং সুখমনুভবামীতি পূর্ব্বাপরকালয়োরেকত্বাবগমাৎ অক্ষণিকত্বসিদ্ধেঃ। যস্য যে পূর্ব্বং সুখমাসীৎ তস্যৈবেদানীং দুঃখমনুবর্ত্ততে ইতি পূর্ব্বাপরকালয়োরাত্মন একত্বাবগমেঽপি সুখনিবৃত্ত্যনুসন্ধানবিরোধাৎ সুখরূপত্বমপ্যাত্মনো নিরাকরণীয়ম্॥"

কোন কোন দার্শনিক আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি প্রত্যয়গুলি যেহেতু দৈহিক স্থৌল্যকার্শ্য প্রভৃতি ধর্ম্মগুলিকেই আভাসিত করে, সেই হেতু স্থৌল্যকার্শ্য প্রভৃতি ধর্ম্মগুলির আধার দেহই আত্মা, এইরূপ মত প্রকাশ করে থাকেন। এই মত ঠিক নয়। কারণ, সুখদুঃখাদি আত্মার বিশেষ গুণ, এগুলিকে কোন যুক্তি অনুসারেই শরীরের গুণ বলে স্বীকার করা যায় না। এস্থলে নিম্নলিখিত যুক্তি প্রণিধানযোগ্য: যদি সুখদুঃখাদি শরীরের বিশেষ গুণ হয়, তাহ'লে যতদিন শরীর বিদ্যমান থাকবে ততদিনই তারা অবস্থিত থাকবে। কিন্তু যেহেতু নিষ্প্রাণ শরীরে এই সুখদুঃখাদি গুণগুলি পরিদৃষ্ট হয় না, সেই হেতু শরীর ছাড়া সুখদুঃখাদির অন্য কোন আধার আছে, এই কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। অতএব উপরোক্ত যুক্তিবলে সুখদুঃখাদির অনাধার শরীর থেকে পৃথক সুখ-দুঃখাদির আধার কোন সত্তাই যে আত্মা তা স্থিরীকৃত হ'ল। যেমন জল ও অগ্নি অত্যন্ত ভিন্ন দুটি পদার্থ হ'লেও উভয়ের সংযোগের ফলে উষ্ণতা জলে সংক্রামিত হয়, সেইরূপ দেহ ও আত্মা দুটি পৃথক পদার্থ হ'লেও উভয়ের অত্যন্তনৈকট্যহেতু দেহধর্ম্ম স্থৌল্যকার্শ্য ইত্যাদির আত্মায় আরোপ হয় এবং ফলে আমি স্থূল, আমি কৃশ ইত্যাদি বোধগুলি উদ্ভূত হয়। তাছাড়া, লৌকিক

ব্যবহারস্থলে আমার শরীর এইরূপ প্রয়োগগুলিও শরীর ও আত্মার পারস্পরিক ভেদটিকেই সপ্রমাণ করে।

যেরূপ দেহ আত্মা নয়, সেরূপ ইন্দ্রিয়ও আত্মা নয়। বাহ্যেন্দ্রিয়গুলির কারণ পঞ্চভূত। কারণের যা গুণ নয় তা কখনো কার্য্যে অনুস্যূত হতে পারে না। চৈতন্যাদি আত্মগুণগুলি পঞ্চভূতে পরিলক্ষিত হয় না। অতএব পঞ্চভূতের দ্বারা নির্ম্মিত ইন্দ্রিয়গুলি কখনই চৈতন্যসম্পন্ন হতে পারে না। এই হেতু ইন্দ্রিয়ের পক্ষে আত্মা হওয়া যুক্তিবিরুদ্ধ। পঞ্চভূতে গঠিত অচেতন ইন্দ্রিয় যেমন আত্মা নয়, সেরূপ পাঞ্চভৌতিক অচেতন শরীরও আত্মা নয়।

যেরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয় আত্মা নয়, সেরূপ অন্তঃকরণও আত্মা নয়। কারণ আত্মার বিশেষ গুণ সুখদুঃখাদির অনুভূতির সাধন ইন্দ্রিয়হিসাবে অন্তঃকরণ বা মন সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। কিন্তু আত্মা সম্বন্ধে আমাদের সচেতনতা এইরূপ পরোক্ষ নয়, সম্পূর্ণরূপেই প্রত্যক্ষ।

বিজ্ঞানও আত্মা নয়। কারণ বিজ্ঞান ক্ষণিক। যে আমি পূর্ব্বে দুঃখ অনুভব করেছিলাম সেই আমি এখন সুখ অনুভব করছি, এইরূপ প্রতীতি থেকে আত্মা যে পূর্ব্বকাল ও পরকালে বিদ্যমান কোন স্থায়ী পদার্থ, বিজ্ঞানের মতো ক্ষণস্থায়ী নয়, তা বোঝা যায়। যে আমার পূর্ব্বে সুখ হয়েছিল সেই আমারই এখন দুঃখ হচ্ছে, এই জাতীয় অনুভূতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, আত্মা পূর্ব্বকাল ও পরকালে বিদ্যমান কোন স্থায়ী পদার্থ হলেও সুখস্বরূপ নয়, কারণ আত্মা সুখস্বরূপ হ'লে সুখের নিবৃত্তি প্রতীয়মান হবে কেন?

ন্যায়বৈশেষিক দর্শনেও অনুরূপভাবে আত্মতত্ত্ব নিরূপিত হয়েছে। শ্রীমৎ

ন্যায়বৈশেষিক বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য তাঁর ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থে এ সম্পর্কে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন:

'আত্মেন্দ্রিয়াদ্যধিষ্ঠাতা করণং হি সকর্ত্তৃকম্ ॥
শরীরস্য ন চৈতন্যং মৃতেষু ব্যভিচারতঃ।
তথাত্বং চেদিন্দ্রিয়াণামুপঘাতে কথং স্মৃতিঃ ॥
মনোঽপি ন তথা জ্ঞানাদ্যনধ্যক্ষং তদা ভবেৎ।
ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়োঽধ্যক্ষো বিশেষগুণযোগতঃ ॥

প্রবৃত্ত্যাদ্যনুমেয়োঽয়ম্ রথগত্যেব সারথিঃ।
অহঙ্কারস্যাশ্রয়োঽয়ং মনোমাত্রস্য গোচরঃ॥
বিভুর্বুদ্ধ্যাদিগুণবান্'—

—ভাষাপরিচ্ছেদঃ, প্রত্যক্ষখণ্ডম্ ৪৭—৫১

আত্মা ইন্দ্রিয় ও শরীরের অধিষ্ঠাতা, সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকার ভাষায় 'পরম্পরয়া চৈতন্যসম্পাদকঃ' অর্থাৎ আত্মার দ্বারাই ইন্দ্রিয় ও শরীর চৈতন্য-বিশিষ্ট হয়ে স্ব স্ব কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। এস্থলে যুক্তি এই: অচেতন ছুরিকা কর্ত্তা ব্যতিরেকে ছেদন করতে পারে না, সেরূপ চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ও আত্মা ব্যতিরেকে স্ব স্ব কর্ম্ম সাধনে অক্ষম। সুতরাং ইন্দ্রিয়ব্যতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।[১] চৈতন্য শরীরের স্বধর্ম্ম নয়, কারণ শবে চৈতন্য পরিলক্ষিত হয় না। চৈতন্য যদি ইন্দ্রিয়ের ধর্ম্ম হয়, তাহ'লে ইন্দ্রিয়ের বিনাশে স্মৃতি কিরূপে সম্ভব হয়?[২] মনও চেতন পদার্থ নয়। কারণ মন চেতন আত্মা হ'লে সেই মনে জ্ঞানসুখাদিকে অবস্থিত থাকতে হবে এবং ঐ সব জ্ঞানসুখাদির প্রত্যক্ষ হতে পারবে না। তার হেতু হ'ল: ন্যায়দর্শনে মনকে অণুপরিমাণ বলা হয়েছে এবং একমাত্র মহত্ত্বপরিমাণবিশিষ্ট বস্তুরই প্রত্যক্ষ হয়, এ-কথা স্বীকৃত হয়েছে।[৩] আত্মা ধর্ম্মাধর্ম্মাদির আশ্রয়। দেহ যদি ধর্ম্মাধর্ম্মাদির আশ্রয় হয়, তাহ'লে এক দেহে কৃত কর্ম্মের অন্য দেহে ভোগ কিভাবে সম্ভব হয়? কারণ দেহের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গেই তদাশ্রিত ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরও বিনাশ হবে। আমি জানি, আমি করি, ইত্যাদি প্রতীতি থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, আত্মার বিশেষ গুণ জ্ঞান-

১। "বাস্যাদীনাং ছিদাদিকরণানাং কর্ত্তারমন্তরেণ ফলানুপধানং দৃষ্টম্, এবং চক্ষুরাদীনাং জ্ঞান-করণানামপি ফলোপধানং কর্ত্তারমন্তরেণ নোপপদ্যতে ইত্যতিরিক্তঃ কর্ত্তা কল্প্যতে॥"

—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা

২। "পূর্ব্বং চক্ষুষা সাক্ষাৎকৃতানাং চক্ষুরভাবে স্মরণং ন স্যাৎ অনুভবিতুরভাবাৎ অন্যেন অনুভূতস্য অন্যেন স্মরণাসম্ভবাৎ, অনুভবস্মরণয়োঃ সামানাধিকরণ্যেন কার্য্যকারণভাবাৎ ইতি ভাবঃ।"

—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা

৩। "মনসোঽণুত্বাৎ প্রত্যক্ষে মহত্ত্বস্য হেতুত্বাৎ মনসি জ্ঞানসুখাদিসত্ত্বে তৎপ্রত্যক্ষানুপ-পত্তিরিত্যর্থঃ।"

—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা

মনের অণুত্ব 'অযৌগপদ্যাৎ জ্ঞানানাং তস্যাণুত্বমিহেষ্যতে' এই শ্লোকে বিশ্বনাথ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

সুখাদির মাধ্যমেই আত্মার প্রত্যক্ষ হয়।[১] যেরূপ রথকর্ম্ম গতির দ্বারা রথের চালক সারথির অস্তিত্ব অনুমিত হয়, সেরূপ পরদেহে চেষ্টারূপ কর্ম্ম দ্বারা পরের আত্মা অনুমান-সিদ্ধ হয়। আত্মা অহঙ্কার, অর্থাৎ আমি এই প্রত্যয়ের বিষয়। শরীরাদিতে আমি এই প্রত্যয় সম্ভব নয়। যেহেতু আত্মার রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইত্যাদি নাই, সেই হেতু মন ছাড়া অন্য ইন্দ্রিয়গুলি আত্মাকে গ্রহণ করতে পারে না।[২] আত্মার পরিমাণ পরমমহৎ।[৩] বুদ্ধি প্রভৃতি আত্মার গুণ।[৪]

এই পর্য্যায়ে আমাদের সাবলীল চিন্তাধারার মাঝে হঠাৎ বাধা এসে পড়ে, শাক্ত কবির বিশেষ অনুভূতির সঙ্গে উপরি-উদ্ধৃত নৈয়ায়িক মতবাদের বিরোধ স্পষ্ট হয়ে আমাদের মনকে সক্রিয় আত্মানুশীলনে উদবুদ্ধ করে।

সাধক কবি রামপ্রসাদ বলেছেন :

'প্রসাদ বলে, ভুক্তিমুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
আমি কালীব্রহ্ম জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি॥'

—ক. বি. শা. প. : ব্রহ্মময়ী মা

ধর্ম্মাধর্ম্ম যদি ন্যায়দর্শনের মতানুযায়ী আত্মার স্বরূপের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহ'লে রামপ্রসাদ কিভাবে তাদিগে ত্যাগ করেছিলেন?

নন্দকুমার রায় দেওয়ান লিখেছেন :

'কবে সমাধি কবে শ্যামাচরণে
অহংতত্ত্ব দূরে যাবে সংসারবাসনাসনে।
উপেক্ষিয়ে মহত্তত্ত্ব, ত্যজি চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব,
সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব, দেখি আপনে আপনে॥'

ন্যায়দর্শনের চিন্তাসূত্রানুযায়ী আত্মা যদি অহঙ্কার থেকে অভিন্ন হয়, তাহ'লে সমাধিতে সাধক কিভাবে অহঙ্কারকে দূরীভূত করতে সক্ষম হন? তাছাড়া,

১। "যোগ্যবিশেষগুণস্য জ্ঞানসুখাদেঃ সম্বন্ধেন আত্মনঃ প্রত্যক্ষত্বং সম্ভবতি ন ত্বন্যথা। অহং জানে অহং করোমি ইত্যাদিপ্রতীতেঃ।" —সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা

২। "মনোভিন্নেন্দ্রিয়জন্যপ্রত্যক্ষাবিষয়ঃ মানসপ্রত্যক্ষবিষয়শ্চেত্যর্থঃ। রূপাদ্যভাবেনেন্দ্রিয়ান্তরা যোগ্যত্বাৎ।" —সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা

৩। "কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ।" —কারিকাবলী

৪। "বুদ্ধ্যাদিষট্কং সংখ্যাদিপঞ্চকং ভাবনা তথা। ধর্ম্মাধর্ম্মৌ গুণা এতে আত্মনঃ স্যুঃ চতুর্দ্দশ।" —কারিকাবলী

আত্মা যদি বুদ্ধ্যাদিগুণবিশিষ্ট হয়, তাহ'লে সমাধিতেও এই জাতীয় গুণবিশিষ্ট আত্মারই দর্শন হবে, সর্ব্বতত্ত্বাতীত তত্ত্ব অর্থাৎ নির্গুণ আত্মার প্রত্যক্ষ গোচরীভূত হওয়ার কোন প্রশ্নই উঠে না।

সুতরাং আমরা লক্ষ্য করি যে, আত্মতত্ত্ব-বিনির্ণয়ে শাক্ত দর্শন ন্যায়দর্শন থেকে উন্নততর স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছে। এক্ষেত্রে সাংখ্যপাতঞ্জল দর্শনের সঙ্গে শাক্ত দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর মিল লক্ষ্য করা যায়।

আত্মা, সাংখ্যপাতঞ্জল দর্শনের পরিভাষায় পুরুষ, কিরূপ, তার পরিচয় ঈশ্বরকৃষ্ণের কারিকায় নিম্নরূপ পাওয়া যায় :

সাংখ্যপাতঞ্জল "তস্মাচ্চ বিপর্য্যাসাৎ সিদ্ধং সাক্ষিত্বমস্য পুরুষস্য।
কৈবল্যং মাধ্যস্থ্যং দ্রষ্টৃত্বমকর্তৃভাবশ্চ॥" ১৯নং কারিকা

ত্রিগুণাদির বিপর্য্যাস, অর্থাৎ অত্রিগুণত্ব, বিবেকিত্ব, অবিষয়ত্ব, অসাধারণত্ব, চেতনত্ব ও অপ্রসবধর্ম্মিত্ব। পুরুষ সুখদুঃখমোহশূন্য, পদার্থান্তর থেকে পৃথক-স্বরূপ, বাহ্যবস্তুর মতো বহিঃস্থিত নয়, সর্ব্বসাধারণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, চেতন এবং অপরিণামী। যেহেতু পুরুষ চেতন, সেই হেতু পুরুষ বিষয়ের দ্রষ্টা ও সাক্ষী।

কারিকায় প্রযুক্ত 'সাক্ষী' শব্দটি গভীর তাৎপর্য্যপূর্ণ। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর তত্ত্বকৌমুদী টীকায় 'সাক্ষী' শব্দটির এইরূপ লক্ষণ করেছেন—'যস্মৈ প্রদর্শ্যতে বিষয়ঃ স সাক্ষী। যথাহি লোকে অর্থিপ্রত্যর্থিনৌ বিবাদবিষয়ং সাক্ষিণে দর্শয়তঃ।' যাকে বিষয় দেখানো হয় সেই সাক্ষী। এস্থলে দৃষ্টান্ত : যে ব্যক্তিকে বাদী-বিবাদীরা বিবাদের বিষয় দেখিয়ে থাকে, সেই ব্যক্তিকেই লোকব্যবহারে সাক্ষী নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পুরুষের সাক্ষিত্ব প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে বাচস্পতি মিশ্র এইরূপ মন্তব্য করেছেন : 'এবং প্রকৃতিরপি স্বচরিতং বিষয়ং পুরুষায় দর্শয়তীতি পুরুষঃ সাক্ষী। ন চাচেতনো বিষয়ো বা শক্যো বিষয়ং দর্শয়িতুমিতি চৈতন্যাদবিষয়ত্বাচ্চ ভবতি সাক্ষী। অতএব দ্রষ্টাপি ভবতি।' যেমন বাদী-বিবাদীগণ সাক্ষীকে বিবাদের বিষয় দেখায়, তেমনি প্রকৃতি আপন বিষয় পুরুষকে দেখায়, এই কারণেই পুরুষ সাক্ষী। অচেতন বাহ্য বিষয়কে বিষয় প্রদর্শন সম্ভব নয়। অতএব যেহেতু পুরুষ চেতন ও বাহ্য বিষয় নয়,

সেই হেতু পুরুষ বিষয়সাক্ষী ও বিষয়দ্রষ্টা। পুরুষ সুখদুঃখমোহাতীত, অতএব পুরুষ নিত্যমুক্ত ও উদাসীন।[১] পুরুষ অপরিণামী, অতএব অকর্তা।

সাংখ্যপুরুষের এই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা শাক্ত কবির প্রতীকারহীন হতাশ্বাস আকুতিতে সুন্দর রূপায়িত হয়েছে। মামলা-মোকদ্দমার রূপকের আড়ালে আত্মার কূটস্থ রূপচিত্রটিকে সুস্পষ্ট অনুভব করা যায়ঃ

'মা গো তারা ও শঙ্করী,
কোন অবিচারে আমার পরে, করলে দুঃখের ডিক্রী জারি?
এক আসামী ছয়টা প্যাদা, বল্ মা কিসে সামাই করি।
আমার ইচ্ছা করে, ঐ ছয়টারে, বিষ খাওয়াইয়ে প্রাণে মারি।'

—রামপ্রসাদ সেনঃ ক. বি. শা. প.—ভক্তের আকুতি

পরে আপন অক্ষমতার জন্য মহাদেবীকেই অনুযোগ করে বলছেনঃ

'হুজুরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাব টাকা কড়ি।
আমায় ফিকিরে ফকির বানায়ে বসে আছ রাজকুমারী।'

—রামপ্রসাদ সেনঃ ক. বি. শা. প.—ভক্তের আকুতি

রামদুলাল নন্দীর (দেওয়ান) প্রসিদ্ধ শাক্ত পদে মহাদেবীর সর্বময় কর্ত্রীত্ব ও জীবাত্মার কর্তৃত্বহীনতা সমানভাবে বিবৃত হয়েছেঃ

'সকলই তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ, কারে কর অধোগামী॥
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি,
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারের সার তুমি॥'[২]

—ক. বি. শা. প.ঃ ইচ্ছাময়ী মা

১। "আত্যন্তিকো দুঃখত্রয়াভাবঃ কৈবল্যম্। তচ্চ তস্য স্বাভাবিকাদেবাত্রৈগুণ্যাৎ সুখদুঃখমোহরহিতত্বাৎ সিদ্ধম্। অতএবা ত্রৈগুণ্যাৎ মাধ্যস্থ্যম্। সুখী হি সুখেন তৃপ্যন্ দুঃখী হি দুঃখং দ্বিষন্ ন মধ্যস্থো ভবতি। তদুভয়রহিতস্তু মধ্যস্থ ইতি উদাসীন ইতি চাখ্যায়তে।"

—তত্ত্বকৌমুদী টীকা

২। 'সঙ্গীত-সন্দর্ভ নামক পুস্তকে এই গানটি কমার নরচন্দ্রের রচনা বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু সাধারণের নিকটে ইহা রামদুলালের গান বলিয়াই প্রচলিত।'

—ক. বি. শা. প.ঃ সম্পাদক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ রায়ের পাদটীকা

কিন্তু শাস্ত্র-প্রতিপাদিত আত্মার এই কর্তৃত্বহীনতার সঙ্গে লোকব্যবহারে অহর্নিশ অনুভববেদ্য আত্মার কর্তৃত্বের প্রবল বিরোধ হয়।

শাক্ত কবি নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের পদে আত্মার কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব দুঃখ প্রসঙ্গে কবিমানসের ব্যথাময় সচেতনতা বাণীমূর্তি লাভ করেছে :

'প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি, ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল।
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি, সর্বনাশী জানিস কতই ছল॥
আনি ভূমণ্ডলে, কতই দুঃখ দিলে, নীলাম্বরের জ্বলে দুঃখানল
আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই, ফণী ধরে খাই হলাহল।'

—ক. বি. শা. প. : ভক্তের আকৃতি

অপরপক্ষে আত্মার বন্ধদশা দূরীকরণে আত্মার কর্তৃত্বশক্তি স্বীকার করে সাধনসম্পর্কে ইতিকর্তব্যতার নির্দেশও শাক্ত পদাবলীতে পাওয়া যায় :

'প্রবৃত্তি নিবৃত্তি জায়া, তার নিবৃত্তিরে সঙ্গে লবি।
ওরে বিবেক নামে জ্যেষ্ঠপুত্র, তত্ত্ব কথা তায় সুধাবি॥
অশুচি শুচিকে লয়ে, দিব্য ঘরে কবে শুবি।
যখন দুই সতীনে প্রীতি হবে, তখন শ্যামা মাকে পাবি॥
অহঙ্কার অবিদ্যা তোর, পিতামাতায় তাড়িয়ে দিবি।
যদি মোহগর্ত্তে টেনে লয়, ধৈর্য্য-খোঁটা ধরে রবি॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ, তবে জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি॥
প্রথম ভার্য্যার সন্তানেরে দূরে রইতে বুঝাইবি।
যদি না মানে প্রবোধ, জ্ঞানসিন্ধু মাঝে ডুবাইবি॥'

—রামপ্রসাদ : ক. বি. শা. প —মনোদীক্ষা

আত্মার স্বলাভিষিক্ত মনকে অনুরূপভাবে সম্বোধন করে সাধন-প্রক্রিয়ার উপদেশের মাধ্যমে শাক্ত কবি আত্মার কর্তৃত্বশক্তিকেই পরোক্ষে স্বীকার করে নিচ্ছেন :

'শোন্ রে মন তোরে বলি, ভজ কালী, ইচ্ছা হয় যেই আচারে।
মুখে গুরুদত্ত মন্ত্র পড়, দিবানিশি কর ধরে

শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় কর মাকে ধ্যান,
ওরে নগরে ফির, মনে কর প্রদক্ষিণ করি শ্যামামারে ॥
যত শোন কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে,
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম শোন রে ॥
কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে, ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে।
ওরে আহার কর, মনে কর আহুতি দিই শ্যামামারে ॥'

--ক. বি. শা. প. ঃ মনোদীক্ষা

সাধনপথে আপনার কর্ত্তৃত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা সাধকচিত্তে সময়ে সময়ে এত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, তিনি ভাবের আতিশয্যে জগজ্জননীকেও সাধন-সমরে প্রতিপক্ষ হিসাবে আহ্বান করতে স্নেহের দাবিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

'আয় মা সাধন সমরে দেখবো, মা হারে কি পুত্র হারে।
আরোহণ করিয়ে কালী সাধন রথে,
তপ জপ দুটা অশ্ব যুতে তাতে,
দিয়ে জ্ঞানধনুকে টান, ভক্তিব্রহ্মবাণ বসেছি ধরে ॥
মা, দেখবো তোমায় রণে, শঙ্কা কি মরণে,
ডঙ্কা মেরে লব মুক্তিধন।
তাতে রসনাঝঙ্কারে, কালীনাম হুঙ্কারে,
কার সাধ্য আমার রণে রণ ॥
বারে বারে রণে তুমি দৈত্যজয়ী,
এইবার আমার রণে এসো ব্রহ্মময়ী,
ভক্ত রসিকচন্দ্র বলে, মা তোমারি বলে,
জিনবো তোমারে ॥'

—রসিকচন্দ্র রায় ঃ ক. বি. শা. প.—সাধন •

আত্মার এই লৌকিক কর্ত্তৃত্বকে ঔপাধিক বলে সাংখ্যযোগশাস্ত্র আ· যুক্তিসিদ্ধ নিষ্ক্রিয়ত্ব ও লোকব্যবহার-সিদ্ধ কর্তৃত্বের বিরোধ-নিষ্পত্তির করেছেন। ঈশ্বরকৃষ্ণের প্রাসঙ্গিক কারিকা এই স্থলে উল্লেখযোগ্য:

'তস্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম্।
গুণকর্তৃত্বে চ তথা কর্ত্তেব ভবত্যুদাসীনঃ ॥' ২০নং কারিকা

পুরুষের সঙ্গে সংযোগের ফলে অচেতন মহদাদিসূক্ষ্মপর্যন্ত পদার্থ চৈতন্যপ্রাপ্ত বলে প্রতীত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে পুরুষ নিষ্ক্রিয় ও গুণকর্তৃত্বযুক্ত হলেও এই সংযোগবশতঃ পুরুষকে কর্ত্তা বলে ভ্রম হয়।[১]

বিজ্ঞানভিক্ষু কারিকা-প্রযুক্ত দুটি ইব শব্দের তাৎপর্য্য হিসাবে বুদ্ধিপুরুষের পরস্পরপ্রতিবিম্বের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, এই পরস্পরপ্রতিবিম্বের ফলেই আমি কর্ত্তা, আমি সুখী, আমি জানি ইত্যাদি প্রত্যয়সিদ্ধ বুদ্ধিপুরুষের মিথ্যা একত্ববোধ জাগ্রত হয়।[২]

চৈতন্য-স্বরূপ আত্মায় বুদ্ধিপ্রতিবিম্ব বিজ্ঞানভিক্ষু এই যুক্তিবলে প্রতিষ্ঠিত করেছেন: বিভুচৈতন্যের সঙ্গে সকল বিষয়ের সর্ব্বক্ষণ যোগ। সুতরাং সূর্য্যালোক যেমন সকল বস্তুকে প্রকাশিত করে, আত্মার তেমন ব্যাপক চৈতন্যধর্ম্মে সকল ব্যক্তিরই সব সময় সর্ব্ব বস্তুর জ্ঞান হওয়া উচিত। যেহেতু সকলের সব সময় সব বস্তুর জ্ঞান হয় না, সেই হেতু চৈতন্য-স্বরূপ আত্মায় বুদ্ধিপ্রতিবিম্ব অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।[৩] যুক্তির উপোদ্বলক শাস্ত্রহিসাবে বিজ্ঞানভিক্ষু 'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র' এই যোগসূত্রের তাঁর যোগবার্ত্তিক টীকায় স্মৃতি উৎকলিত করেছেন—

'তস্মিংশ্চিদ্দর্পণে স্ফারে সমস্তা বস্তুদৃষ্টয়ঃ।
ইমাস্তাঃ প্রতিবিম্বন্তি সরসীব তটদ্রুমাঃ॥'

১। যতশ্চৈতন্যকর্তৃত্বে ভিন্নাধিকরণে যুক্তিতঃ সিদ্ধে, তস্মাৎ ভ্রান্তিরিয়মিত্যর্থঃ। ভ্রান্তিবীজং তৎসংযোগঃ তৎসন্নিধানম্। —বাচস্পতি মিশ্র: তত্ত্বকৌমুদী টীকা

২। তদেবং বুদ্ধ্যাত্মনোঃ পরস্পরপ্রতিবিম্বরূপাৎ দোষাদেব একতাভ্রমোঽহং কর্ত্তা সুখী মানাদীত্যাদিরূপ ইতি, তদেতৎ পরস্পরং প্রতিবিম্বং সাংখ্যকারিকায়ামিবশব্দাভ্যামুক্তম—তস্মাৎ তৎসংযোগাৎ অচেতনং চেতনাবদিব লিঙ্গম ইত্যাদি। 'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র' যোগসূত্রের যোগবার্ত্তিক।

৩। চেতনে তাবৎ বুদ্ধিপ্রতিবিম্বমবশ্যং স্বীকার্য্যম, অন্যথা কূটস্থনিত্যবিভুচৈতন্যস্য সর্ব্বসম্বন্ধাৎ সদৈব সর্ব্বং বস্তু সর্ব্বৈরজ্ঞায়েত, ন হি সূর্য্যসম্বন্ধে সতি ঘটাদ্যপ্রকাশো দৃষ্ট ইতি।... ... অতোঽর্থভানস্য কদাচিৎকত্বাদ্যুপপত্তয়েঽর্থাকারতৈবার্থগ্রহণং বাচ্যং বুদ্ধৌ তথা দৃষ্টত্বাৎ... ... ... স চার্থাকারতা বুদ্ধৌ পরিণামরূপা সম্ভবেদ্ বিষয়াভাবেন তৎপ্রতিবিম্বাসম্ভবাৎ, পুরুষে চ প্রতিবিম্বরূপা, বিদ্যমানবৃত্তিমাত্র গ্রাহকে পুংসি প্রতিবিম্বেনৈবোপপত্তেরিতি।

—'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র' যোগসূত্রের যোগবার্ত্তিক টীক

বিজ্ঞানভিক্ষু কপিলসাংখ্যসূত্রের তৎকৃত সাংখ্যপ্রবচনভাষ্যে উপরি শ্লোকোল্লিখিত 'দৃষ্টি' ও 'প্রতিবিম্ব' শব্দ দুটির দুটি পারিভাষিক সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন :

'অত্র হি দৃষ্টিশব্দো বুদ্ধিবৃত্তিসামান্যপরো যুক্তিসাম্যাৎ। প্রতিবিম্বশ্চ তত্তদুপাধিষু বিম্বাকারশ্চিত্তপরিণাম ইতি।'[১]

দৃষ্টিশব্দ সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রতিবিম্বশব্দ সেই সেই উপাধিকেন্দ্রিক চিত্তের পরিণামকে বোঝাচ্ছে।

এই পারিভাষিক সংজ্ঞার দৃষ্টিকোণ থেকে উপরি-উল্লিখিত স্মৃতির এইরূপ অর্থ হয় : যেমন পুষ্করিণীর জলে তটস্থ বৃক্ষরাজি প্রতিবিম্বিত হয়, আয়নার মতো স্বচ্ছ বিভুচৈতন্যেও তেমন বিষয়াকারতাপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তি প্রতিবিম্বিত হয়।

চিৎ যেহেতু অহংপ্রত্যয়ের বিষয়ী হয়, সেই হেতু বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্ব স্বীকার করতে হয়। বিভুচৈতন্যে আমিত্ব-বোধ জাগ্রত হতে পারে না, বুদ্ধি যেরূপ বিষয়াকারতাপ্রাপ্ত হয়ে বিষয়জ্ঞানের সৃষ্টি করে, সেরূপ বুদ্ধি চিদাকারতাপ্রাপ্ত হয়ে অহংপ্রত্যয়ের সূচনা করে।[২]

আমি এই বস্তুকে এইভাবে জানছি—এইরূপ প্রতীতির দুটি অংশ, (১) বুদ্ধ্যংশ ও (২) চিদংশ। বস্তু ও তার বিশেষণ সম্বন্ধে জ্ঞান প্রতীতির বুদ্ধ্যংশের অন্তর্গত। অহংপ্রত্যয় অর্থাৎ 'আমি' এই বোধ প্রতীতির চিদংশের অন্তর্ভুক্ত। দ্বৈতবাদী সাংখ্যাচার্য প্রতীতির বুদ্ধ্যংশের কারণ হিসাবে বুদ্ধির বিষয়াকারতা ও সেই বিষয়াকারা বুদ্ধির আত্মায় প্রতিবিম্বের অর্থাৎ আত্মার জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হওয়ার কথার উল্লেখ করেছেন। তারা প্রতীতির চিদংশের কারণ হিসাবে বুদ্ধিতে চিৎপ্রতিবিম্বের অর্থাৎ বুদ্ধির চিদাকারতাপ্রাপ্তি ও সেই চিদাকারা বুদ্ধির আত্মার জ্যোতিতে ভাস্বরত্বের কথা বিবৃত করেছেন।

চিৎ ও বুদ্ধির পরস্পর সম্পর্ক বীজ ও অঙ্কুরের সম্বন্ধের মতো অনাদি। তাদের সন্নিধানহেতু পরস্পরের ধর্ম পরস্পরের উপর আরোপিত হয়। 'বৃত্তি-

১। অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ

—এই সাংখ্যসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষুকৃত সাংখ্য প্রবচনভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। যথা চ চিতি বুদ্ধেঃ প্রতিবিম্বমেবং বুদ্ধাবপি চিৎপ্রতিবিম্বং স্বীকার্যমন্যথা চৈতন্যভানানুপপত্তেঃ স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বদর্শনে কর্মকর্তৃবিরোধেন বুদ্ধ্যারূঢ়তয়ৈবাত্মনো ঘটাদিবজ্জ্ঞেয়ত্বাভ্যুপগমাৎ॥

—'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র' সূত্রের বার্তিক।

সারূপ্যমিতরত্র' এই যোগসূত্রের তত্ত্ববৈশারদী টীকায় বাচস্পতি মিশ্র জীবাত্মার অবিদ্যা-বিজড়িত বিষয়জ্ঞান এইরূপে ব্যাখ্যা করেছেন :

'জবাকুসুমস্ফটিকয়োরিব বুদ্ধিপুরুষয়োঃ সংনিধানাদ-ভেদগ্রহে বুদ্ধিবৃত্তীঃ পুরুষে সমারোপ্য শান্তোঽস্মি দুঃখিতোঽস্মি মূঢোঽস্মীত্যধ্যবস্যতি, যথা মলিনে দর্পণতলে প্রতিবিম্বিতং মুখং মলিনমারোপ্য শোচত্যাত্মানং মলিনোঽস্মীতি. যদ্যপি পুরুষসমারোপোঽপি শব্দাদিবিজ্ঞানবং বুদ্ধিবৃত্তিত্বযদ্যপি চ প্রাকৃতত্বেনাচিদ্রূপতয়া অনুভাব্যাস্তথাপি বুদ্ধেঃ পুরুষপ্রমাণোদয়েন পুরুষবৃত্তিরিবানুভব ইবাবভাসতে, তথা চায়মবিপর্যয়োঽপি আত্মা বিপর্যয়বানিবাভোক্তাঽপি ভোক্তেব বিবেকখ্যাতিরহিতোঽপি তৎসহিত ইবাবিবেকখ্যাত্যা প্রকাশতে।'

যেমন জবাফুল ও স্ফটিক এক জায়গায় রাখলে জবাফুলের রক্তিমা স্বচ্ছ স্ফটিকে সংক্রামিত হয়, তেমনি বুদ্ধি ও চিৎ-এর একত্রাবস্থানের ফলে তারা পরস্পর পৃথক হ'লেও তাদিগে এক বলে ভ্রম হয়। এই কারণে বুদ্ধির বৃত্তি চিৎস্বরূপ জীবাত্মায় আরোপিত হয় এবং আমি শান্ত, আমি দুঃখিত, আমি মূঢ় এই জাতীয় অধ্যবসায়াত্মক বোধ জাগরিত হয়। এক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত : মলিন আয়নায় মুখের প্রতিবিম্বকে মলিন দেখে মানুষ মুখকেই মলিন মনে করে দুঃখ পায়। যদিও বুদ্ধির চিদাকারতাপ্রাপ্তি তার বিষয়াকারতাপ্রাপ্তির মতোই একজাতীয় বৃত্তি, যদিও চিদাকারা বুদ্ধি জড় বলে অনুভূত হওয়া উচিত—তথাপি চিদাকারা বুদ্ধির চিৎধর্ম অর্জনের ফলে বুদ্ধিবৃত্তিকে চিৎস্বরূপ জীবাত্মার বৃত্তি বলে অনুভব হয়, এরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। এইভাবে পূর্ণ আত্মজ্ঞান জাগরিত হওয়ার পূর্ব্ব পর্যন্ত কর্ত্তা ভোক্তা বা বদ্ধ না হ'লেও চিন্ময় জীবাত্মাকে কর্ত্তা বদ্ধ বা ভোক্তা বলে অনুভব হয়।

উপরি-উদ্ধৃত অংশে বাচস্পতি-প্রযুক্ত 'অধ্যবস্যতি' কথাটির গভীর তাৎপর্য্য : 'অধ্যবস্যতি' ক্রিয়াপদ। 'অধ্যবসায়' শব্দের অর্থ আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর সাহিত্যদর্পণ গ্রন্থে এইরূপ নির্দেশ করেছেন—'বিষয়নিগরণেন বিষয়িণোঽভেদপ্রতীতিঃ অধ্যবসায়। বিষয় অর্থাৎ উপমেয়ের নিগরণ বা অন্তর্দ্ধান হয়ে তাকে বিষয়ী বা উপমানের সঙ্গে অভিন্ন বলে বোধ জন্মালে অধ্যবসায় হয়।

তন্ত্রাচার্য্য অভিনব গুপ্ত তাঁর তন্ত্রালোক গ্রন্থে জীবাত্মার বিষয়চেতনা ব্যাখ্যা করার সময়ও এই 'অধ্যবসায়' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন :

'অহমিত্থমিদং বেদ্মীত্যেবমধ্যবসায়িনী ষট্‌কঞ্চুকাবিলাণুস্থপ্রতিবিম্বনতো যদা॥ ৩৯

ধীর্জ্জায়তে তদা তাদৃগ্‌জ্ঞানমজ্ঞানশব্দিতং বৌদ্ধং তস্য চ তৎ পৌংস্নং পোষণীয়ং চ পোষ্টৃ চ॥ '৪০ —তন্ত্রালোক: প্রথমাহ্নিক, ৩৯—৪০ শ্লোক

ছয় প্রকার কঞ্চুকের[১] দ্বারা আবৃত পরিমিতাত্মার প্রতিবিম্বন বা চিচ্ছায়া-সংক্রমণের ফলে 'আমি এই বস্তুকে এইরূপ জানছি' এই জাতীয় বোধবিশিষ্ট যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাই অজ্ঞান। এই অজ্ঞান-সংজ্ঞক বস্তুচৈতন্যাত্মক জ্ঞান বৌদ্ধ অর্থাৎ বুদ্ধিতে চিৎস্বরূপ জীবাত্মার অধ্যবসায়ের ফলে জাত। এই বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান পৌংস্ন অর্থাৎ চিন্ময় জীবাত্মা পরমার্থতঃ নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত স্বভাব হ'লেও এইরূপ বস্তুজ্ঞানের দ্বারা বিশেষিত হয়। অপরপক্ষে অনাদি অবিদ্যা-সংস্কার প্রবাহের ফলে চিদ্রূপ জীবাত্মা ও বুদ্ধির সন্নিধানের জন্য বুদ্ধিতে যে চিচ্ছায়া সংক্রমণ হয়, তার জন্যই জীবাত্মার এই বস্তু-বিষয়ক জ্ঞান উদ্ভূত হয়।

শ্লোকোক্ত 'প্রতিবিম্বন' শব্দের অর্থ তন্ত্রালোকের ভাষ্যকার আচার্য্য জয়রথ নিরূপণ করেছেন চিচ্ছায়া-সংক্রমণ বলে। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে এই চিচ্ছায়া-সংক্রমণ হ'ল বুদ্ধিতে চিদ্রূপ জীবাত্মার প্রতিবিম্ব।

'বুদ্ধাবাত্মপ্রতিবিম্বমেব চ তান্ত্রিকা বুদ্ধেশ্চিচ্ছায়াপত্তিরিত্যাত্মাকারতেতি প্রাহুঃ'—'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র' এই যোগসূত্রের যোগবার্ত্তিক টীকায় বিজ্ঞানভিক্ষু এইরূপ মন্তব্য করেছেন।

তন্ত্রাচার্য্যগণ বুদ্ধিতে আত্মার প্রতিবিম্বকেই বুদ্ধির চিচ্ছায়াপত্তি বা বুদ্ধির আত্মাকারতা নামে অভিহিত করে থাকেন।

যে-কোন বুদ্ধিতে যে-কোন জীবাত্মার বা যে-কোন জীবাত্মায় যে-কোন বুদ্ধির প্রতিবিম্বন সম্ভব নয়। অনাদি অবিদ্যার ফলে যে জীবাত্মা ও বুদ্ধির

১। উক্ত শ্লোকের আচার্য্য জয়রথ-বিরচিত টীকাংশ এস্থলে প্রণিধানযোগ্য:

'অস্যাশ্চৈবমধ্যবসায়যোগিত্বে হেতুঃ ষট্‌কঞ্চুক ইতি।
ষট্‌কঞ্চুকৈঃ কালকলানিয়তিবলাদ্রাগাবিদ্যাবশেন সংবদ্ধঃ
অধুনৈব কিঞ্চিদেবেদমেব সর্ব্বাত্মনৈব জানামি।
মায়াসহিতং কঞ্চুকষট্‌কমণোরন্তরঙ্গমিদমুক্তম্ ॥'

—ইত্যাদিনা নিরূপিতস্বরূপৈঃ আবিলঃ প্রতিনিয়তঞ্চ দ্বকর্তৃত্বাত্মৎপত্ত্যা ম্লানপ্রায়ো যোঽসৌ অণুঃ পরিমিতাত্মা, ততো জাতাৎ প্রতিবিম্বনাৎ চিচ্ছায়াসংক্রমণাৎ ইত্যর্থঃ —জয়রথটীকা

পরস্পরসন্নিধান, সেই জীবাত্মা ও বুদ্ধির মধ্যেই পরস্পরের উপর পরস্পরের প্রতিবিম্বন সংঘটিত হয়।

উপরোক্ত তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তই পাতঞ্জল যোগদর্শনের ব্যাসভাষ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে :

'চিত্তময়স্কান্তমণিকল্পং সংনিধিমাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন স্বং ভবতি পুরুষস্য স্বামিনঃ তস্মাচ্চিত্তবৃত্তিবোধে পুরুষস্যানাদিসম্বন্ধো হেতুঃ।'—'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র' এই যোগসূত্রের ভাষ্যের মন্তব্য।

যেরূপ অয়স্কান্তমণি লৌহ আকর্ষণ করার শক্তিবশতঃই শল্যনিষ্কর্ষণরূপ উপকার করে ভোগসাধন হিসাবে মানুষের সম্পত্তি বলে পরিগণিত হয়, সেরূপ চিত্তও আপনার নিকট বিষয় সমাবিষ্ট করে বিষয়কে পুরুষের দৃশ্য করে তুলে পুরুষের উপকার সাধন করে এবং এইভাবে পুরুষের ভোগ চিত্তের দ্বারা সম্ভব হয় বলে চিত্ত পুরুষের স্ব বলে নির্ণীত হয়। কিন্তু পুরুষের এই ভোগের সাধন বলেই চিত্ত ও পুরুষের মধ্যে অনাদি স্বস্বামিভাবসম্বন্ধ।[১]

১। যথায়স্কান্তমণিঃ স্বস্মিন্ বায়ঃসংনিধিকরণমাত্রাৎ শল্যনিষ্কর্ষণাখ্যমুপকারং কুর্বন্ স্বামিনঃ স্বং ভবতি ভোগসাধনত্বাৎ, তথৈব চিত্তমপ্যয়ঃসদৃশবিষয়জাতস্য স্বস্মিন্ সংনিধিকরণমাত্রাৎ দৃশ্যত্বরূপমুপকারং কুর্বৎ পুরুষস্য স্বামিনঃ স্বং ভবতি ভোগসাধনত্বাৎ অতশ্চিত্তপুরুষয়োরনাদিঃ স্ব-স্বামিভাবঃ সম্বন্ধ ইতি শেষঃ।...... স এবানাদিসম্বন্ধঃ পুরুষস্য চিত্তবৃত্তিদর্শনে হেতুরিত্যর্থঃ অতো ন পরচিত্তেন পরস্য বৃত্তিসারূপ্যং ভবতি, কদাপি তদ্বৃত্ত্যববোধেন তয়োঃ স্বস্বামিসম্বন্ধাভাবাৎ—

—'বৃত্তিসারূপ্যমিতরত্র' এই যোগসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু-কৃত যোগবার্ত্তিক টীকা।

যুষ্মদস্মৎপ্রত্যয়গোচরয়োর্বিষয়বিষয়িণোস্তমঃপ্রকাশবদ্বিরুদ্ধস্বভাবয়োরিতরেতরভাবানুপপত্তৌ সিদ্ধায়াং তদ্ধর্ম্মাণামপি সুতরামিতরেতরভাবানুপপত্তিঃ, ইত্যতোঽস্মৎপ্রত্যয়গোচরে বিষয়িণি চিদাত্মকে যুষ্মৎ-প্রত্যয়-গোচরস্য বিষয়স্য তদ্ধর্ম্মাণাং চাধ্যাসঃ, তদ্বিপর্য্যয়েণ বিষয়িণস্তদ্ধর্ম্মাণাঞ্চ বিষয়েঽধ্যাসো মিথ্যেতি ভবিতুং যুক্তম্, তথাপ্যন্যোন্যস্মিন্নন্যোন্যাত্মকতামন্যোন্যধর্ম্মাংশ্চাধ্যস্যেতরেতরাবিবেকনাত্যন্ত বিবিক্তয়োর্ধর্ম্মধর্ম্মিণোর্মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তঃ সত্যানৃতে মিথুনীকৃত্য অহমিদং মমেদমিতি নৈসর্গিকোঽয়ং লোকব্যবহারঃ। আহ—কোঽয়মধ্যাসো নামেতি। উচ্যতে—স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্বদৃষ্টাবভাসঃ। তং কেচিৎ অন্যত্রান্যধর্ম্মাধ্যাস—ইতি বদন্তি। কেচিত্তু, যত্র যদধ্যাসস্তদ্বিবেকাগ্রহনিবন্ধনো ভ্রম—ইতি॥ অন্যে তু—যত্র যদধ্যাসস্তস্যৈব বিপরীতধর্ম্মত্বকল্পনাং—আচক্ষতে, ইতি॥

—ব্রহ্মসূত্র : অধ্যায় ১, পা ১, সূত্র ১, শারীরক ভাষ্য

অসর্পভূতায়াং রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্ত্বারোপঃ অধ্যারোপঃ বস্তু—সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম। অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহঃ অবস্তু—সদানন্দ-কৃত বেদান্তসার।

সাংখ্যপাতঞ্জলের সঙ্গে শক্তিদর্শনের চিন্তাধারার ঐক্য আমরা অনেক বিষয়ে লক্ষ্য করলাম।

কিন্তু আরো একটু প্রণিধান করে দেখলে বোঝা যাবে যে, সাংখ্যপাতঞ্জল [illegible] অপেক্ষা। বেদান্তদর্শনের সঙ্গেই শাক্তদর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর সমতা অধিকতর নিবিড়।

তন্ত্রাচার্য্য অভিনব গুপ্ত-প্রযুক্ত উপরি-উল্লিখিত 'অধ্যবসায়' শব্দটি এই দিক থেকে গভীর ব্যঞ্জনা বহন করে। এই অধ্যবসায়িনী ধী বা অধ্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির মূলে আছে জীবাত্মা ও বুদ্ধির সন্নিধান হেতু অভেদগ্রহ অর্থাৎ বুদ্ধির বিষয়াকারতারূপ ধর্ম্মের জীবাত্মায় ও জীবাত্মার চিদ্ধর্ম্মের বুদ্ধিতে আরোপ। সুতরাং তন্ত্রাচার্য্য অভিনব গুপ্তের অধ্যবসায় ও বৈদান্তিকের অধ্যাস একই।

বেদান্ত সূত্রের ভগবান শঙ্করাচার্য্য-কৃত ভাষ্যে অধ্যাসের লক্ষণ এইরূপে নির্ণীত হয়েছে।

স্মৃতির সূত্র ধরে অন্যত্র পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর অবভাসই অধ্যাস। কিংবা এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম্মের আরোপই অধ্যাস। যে বস্তুতে যে বস্তুর আরোপ সেই সেই বস্তু দুটির পার্থক্য-জ্ঞানের অভাবে যে ভ্রম, তাই অধ্যাস। যে বস্তুর উপর অন্য বস্তু আরোপিত হয়, সে বস্তুর বিপরীতধর্ম্মত্ব কল্পনা করাই অধ্যাস।

অধ্যাস-সংক্রান্ত নানা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উল্লেখ করে শেষে ভগবান শঙ্করাচার্য্য অধ্যাসের লক্ষণ সম্বন্ধে এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন :

'সর্ব্বথাপি ত্বন্যস্যান্যধর্ম্মাবভাসতাং ন ব্যভিচরতি। তথাচ লোকে অনুভবঃ—শুক্তিকা হি রজতবদবভাসতে, একশ্চন্দ্রঃ সদ্বিতীয়বদিতি।'

—ব্রহ্মসূত্র : অধ্যায় ১—পাদ ১, সূত্র ১ (শঙ্করভাষ্য দ্রষ্টব্য)

অধ্যাসের লক্ষণ যাই হোক না কেন, অধ্যাসে যে এক বস্তুতে অন্য বস্তুর ধর্ম্ম প্রতিভাত হয়, তা অস্বীকার করার উপায় নাই। এখানে লৌকিক অনুভবও প্রণিধানযোগ্য—শুক্তি রূপার মতো ঔজ্জ্বল্য বিকীর্ণ করছে, চন্দ্র এক হলেও দুই বলে মনে হচ্ছে।

শঙ্করাচার্য্যের মতে, অন্তর-করণের জীবাত্মায় ও জীবাত্মার অন্তঃকরণে অধ্যাস হয়। এই পরস্পর অধ্যাসের ফলে জীবাত্মার কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্ব ইত্যাদির অবভাস সম্ভব হয়। এই অধ্যাস অনাদি এবং অনন্ত।[১]

লোকব্যবহারে চিৎ-স্বরূপ জীবাত্মাকে কর্ত্তা, ভোক্তা ইত্যাদি বলে মনে হয়। কিন্তু যেহেতু জীবাত্মা উদাসীন কূটস্থ, সেই হেতু তার ক্রিয়াশক্তি, ভোগশক্তি ইত্যাদি থাকা সম্ভব নয়। বুদ্ধি প্রভৃতিরই ক্রিয়াশক্তি, ভোগশক্তি ইত্যাদি, কিন্তু তার চৈতন্য নাই। সুতরাং চিৎ-স্বরূপ জীবাত্মাই বুদ্ধি প্রভৃতির অধ্যাসহেতু ক্রিয়াশক্তি, ভোগশক্তি ইত্যাদি যেন অর্জ্জন করে বলে মনে হয়। বিভুচৈতন্য ব্রহ্ম ও অণুচৈতন্য জীব প্রকৃত প্রস্তাবে একই। বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি দ্বারা বিভুচৈতন্য ব্রহ্ম যখন পরমার্থতঃ অবচ্ছিন্ন না হ'লেও অবচ্ছিন্ন বলে প্রতীয়মান হন, তখনই তিনি জীব বা ক্ষেত্র এই আখ্যায় অভিহিত হন। বুদ্ধি, মন, সূক্ষ্ম শরীর—এগুলি অনির্ব্বচনীয় ও অনাদি-অবিদ্যা-পরিকল্পিত উপাধি, যা বিভুচৈতন্যকে অবচ্ছিন্ন করে। এই উপাধি-কৃত অবচ্ছেদের ফলেই জীবাত্মা পরমাত্মা থেকে অভিন্ন, অকর্ত্তা, অভোক্তা ও 'আমি' এই প্রত্যয়ের অগোচর হ'লেও পরমাত্মা থেকে ভিন্ন কর্ত্তা, ভোক্তা ও 'আমি' এই প্রত্যয়ের গোচর বলেই প্রতীয়মান হয়। আত্মার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের অনুভূতি হতে পারে, কিন্তু আত্মা থেকে বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধির যে ভেদ তা অনুভূত হয় না। কারণ বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধি যেমন সৎ-ও নয়, অসৎ-ও নয়, অতএব অনির্ব্বাচ্য,—আত্মা থেকে বুদ্ধি প্রভৃতির উপাধিরও ভেদ তেমনি সৎ-ও নয়,

১। অধ্যাসো নাম অতস্মিন্ তদ্বুদ্ধিরিত্যবোচাম। তদ্যথা—পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বা অহমেব বিকলঃ সকলো বেতি বাহ্যধর্ম্মান্ আত্মনি অধ্যস্যতি। তথা দেহধর্ম্মান্—স্থূলোঽহং, কৃশোঽহং, গৌরোঽহং, তিষ্ঠামি, গচ্ছামি, লঙ্ঘয়ামি চেতি। তথেন্দ্রিয়ধর্ম্মান্—মূকঃ, কাণঃ, ক্লীবঃ, বধিরঃ অন্ধোঽহমিতি। তথাঽন্তঃকরণধর্ম্মান্—কামসঙ্কল্পবিচিৎকিৎসাধ্যবসায়াদীন। এবমহংপ্রত্যয়িনমশেষস্বপ্রচারসাক্ষিণি প্রত্যগাত্মন্যধ্যস্য, তং চ প্রত্যগাত্মানং সর্ব্বসাক্ষিণম্ তদ্বিপর্য্যয়েণান্তঃকরণাদিষ্বধ্যস্যতি। এবমযমনাদিরনন্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসো মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বপ্রবর্ত্তকঃ সর্ব্বলোকপ্রত্যক্ষঃ।

—ব্রহ্মসূত্র : অধ্যায় ১—পাদ ১, সূত্র ১ (শারীরক ভাষ্য)

অসৎ-ও নয়, অতএব তা অনির্ব্বাচ্য। বিভুচৈতন্যস্বরূপ আত্মায় বুদ্ধি প্রভৃতির অধ্যাসই আত্মার জীবভাব।[১]

শক্তিদর্শনে আত্মার স্বরূপ বেদান্তদর্শনের অনুরূপ রীতিতেই নির্ণীত হয়েছে। আচার্য্য জয়রথ তাঁর তন্ত্রালোক টীকায় জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে নিম্নরূপ মন্তব্য করেছেন :

'পরমেশ্বর এব হি স্বস্বাতন্ত্র্যাৎ পূর্ণজ্ঞত্বকর্তৃত্বাদ্যপহস্তনেন অখ্যাত্যাত্মকাণবমলাবির্ভাবেন স্বাত্মানমাবৃণুতে।' —তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক ৩৭ শ্লোকের টীকা

পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম শিবই নিজের স্বাতন্ত্র্য শক্তি থেকে পূর্ণজ্ঞত্ব কর্তৃত্বাদি শক্তি দূরীভূত করে অখ্যাতি রূপ অণুপরিমাণ জীবাত্মা-সংক্রান্ত মলের সৃচনা করে নিজের স্বরূপকে আবৃত করেছেন।[২]

১। সত্যং প্রত্যগাত্মা স্বয়ংপ্রকাশত্বাদবিষয়োঽনংশশ্চ, তথাপ্যনির্ব্বচনীয়ানাদ্য-বিদ্যাপরিকল্পিত বুদ্ধিমনঃসূক্ষ্মস্থূলশরীরেন্দ্রিয়াবচ্ছেদেনানবচ্ছিন্নোঽপি বস্তুতোঽবচ্ছিন্ন ইব, অভিন্নোঽপি ভিন্ন ইব, অকর্ত্তাপি কর্ত্তেব, অভোক্তাপি ভোক্তেব, অবিষয়োঽপি অস্মৎপ্রত্যয়বিষয় ইব, জীবভাবমাপন্নোঽবভাসতে, নভ ইব ঘটমণিকমল্লিকাদ্যবচ্ছেদভেদেন ভিন্নমিবানেকবিধধর্ম্মকমিবেতি। ন হি চিদেকরসস্যাত্মনশ্চিদংশে গৃহীতেঽগৃহীতং কিঞ্চিদস্তি। ন খলু আনন্দনিত্যত্ববিভুত্বাদয়োঽস্য চিদ্রূপাৎ বস্তুতো ভিদ্যন্তে যেন তদ্‌গ্রহে ন গৃহ্যেরন্। গৃহীতা এব তু কল্পিতেন ভেদেনাবিনিশ্চিতা ইত্যগৃহীতা ইবাভান্তি। নাচাত্মনো বুদ্ধ্যাদিভ্যো ভেদস্তাত্ত্বিকঃ, যেন চিদাত্মনি গৃহ্যমাণে সোঽপি গৃহীতো ভবেৎ, বুদ্ধ্যাদীনাম্ অনির্ব্বাচ্যত্বেন তদ্ভেদস্যাপি অনির্ব্বচনীয়ত্বাৎ। তস্মাৎ চিদাত্মনঃ স্বয়ংপ্রকাশস্যৈব অনবচ্ছিন্নস্য অবচ্ছিন্নেভ্যো বুদ্ধ্যাদিভ্যো ভেদাগ্রহাৎ, তদধ্যাসেন জীবভাব ইতি। তস্য চানিদমিদমাত্মনোঽস্মৎ-প্রত্যয়বিষয়ত্বমুপপদ্যতে। তথাহি—কর্ত্তা ভোক্তা চিদাত্মা অহং প্রত্যয়ে প্রত্যবভাসতে। ন চোদাসীনস্য তস্য ক্রিয়াশক্তিভোগশক্তিবা সম্ভবতি। যস্য চ বুদ্ধ্যাদেঃ কার্য্যকারণসংঘাতস্য ক্রিয়াভোগশক্তী ন তস্য চৈতন্যম্। তস্মাৎ চিদাত্মৈব কার্য্যকারণসংঘাতেন গ্রথিতো লব্ধক্রিয়াভোগশক্তিঃ, স্বয়ংপ্রকাশোঽপি বুদ্ধ্যাদিবিষয়বিচ্ছুরণাৎ, কথঞ্চিদস্মৎপ্রত্যয়বিষয়োঽহঙ্কারাস্পদং জীব ইতি চ, জন্তুরিতি চ, ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি চাখ্যায়তে। ন খলু জীবশ্চিদাত্মনো ভিদ্যতে। তথাচ শ্রুতিঃ—অনেন জীবেনাত্মনা ইতি।

—ব্রহ্মসূত্র : অধ্যায় ১—পাদ ১, সূত্র ১ (শঙ্করভাষ্যের উপর বাচস্পতি মিশ্রের ভামতী টীকা)

২। 'পরমং যৎ স্বাতন্ত্র্যং দুর্ঘটসম্পাদনং মহেশস্য।
দেবী মায়াশক্তিঃ স্বাত্মাবরণং শিবস্যৈতৎ॥
মায়াপরিগ্রহবশাৎ বোধো মলিনঃ পুমান্ পশুর্ভবতি॥'—
—তন্ত্রালোক টীকায় জয়রথ কর্তৃক উদ্ধৃত শ্লোক

'চৈতন্যং দৃকক্রিয়ারূপং তদস্ত্যাত্মনি সর্ব্বদা।
সর্ব্বতশ্চ যতো মুক্তৌ শ্রূয়তে সর্ব্বতোমুখম্॥ ৩৭॥
তদপ্যভাসমানত্বাৎ তন্নিরুদ্ধং প্রতীয়তে।
বন্ধোঽনাবৃতবীর্য্যস্য প্রোক্ত এবাতবিমোক্ষণাৎ॥' ৩৮॥
—মৃগেন্দ্র সূত্র : শতরত্ন সংগ্রহে উদ্ধৃত, পৃঃ ৬০

'পরমেশ্বর এব হি সর্ব্বজ্ঞতাদ্যপহ্নবেন প্রাপিতস্য স্বাত্মনঃ পুনরপি কলাদি যোগং কৃতবান্, যেনাস্য নিয়তং জ্ঞত্বকর্তৃত্বাদ্যভিযুক্তম্।'

—তন্ত্রালোক : ১ আ ৩৭ শ্লোকের টীকা।

পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম শিবই সর্ব্বজ্ঞত্বাদি শক্তি দূরীভূত করে নিজেকে অণুতে পরিণত করার পর নিজের সঙ্গে পুনরায় কলা প্রভৃতির যোগ সাধন করেছেন, যার ফলেই জীবাত্মার জ্ঞত্বকর্তৃত্বাদির অনুভূতির সঙ্গতি হয়।

পরমেশ্বর বা পরম শিবের এই কলাদিযোগ-সম্বন্ধীয় তত্ত্বের বিশদ্ ব্যাখ্যা জয়রথ-উল্লিখিত শ্লোকে নিম্নরূপ পাওয়া যায় :

'অসূত সা কলাতত্ত্বং যদ্যোগাদভবৎপুমান্।
জাতকর্তৃত্বসামর্থ্যো বিদ্যারাগৌ ততোঽসৃজৎ ॥
বিদ্যা বিবেচয়ত্যস্য কর্ম্ম তৎকার্য্যকারণে।
রাগোঽপি রঞ্জয়ত্যেনং স্বভোগেষ্বশুচিষ্বপি ॥
নিয়তির্যোজয়ত্যেনং স্বকে কর্ম্মণি পুদ্গলম্।
কালোঽপি কলয়ত্যেনং তুট্যাদিভিরবস্থিতঃ ॥'

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক ৩৭ শ্লোকের টীকা।

তিনি অর্থাৎ শক্তি কলা নামক তত্ত্বের সৃষ্টি করলেন, যার যোগে জীবাত্মা কর্তৃত্ববিশিষ্ট হ'ল। তারপর বিদ্যা ও রাগের সৃষ্টি হ'ল। বিদ্যার বলেই জীবাত্মা কর্ম্মসম্পাদনের অবসরে কর্ম্ম বিচার করতে সক্ষম হয়। রাগ জীবকে অশুচি অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যোগহেতু অপবিত্র হ'লেও আপন ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্ত করে। নিয়তিই জীবকে বন্ধক কর্ম্মের সঙ্গে যুক্ত করে। কাল জীবকে কলন করে অর্থাৎ ছয় প্রকার ভাববিকার প্রাপ্ত করায়।

জয়রথ-উল্লিখিত আণবমলের স্বরূপ স্বায়ম্ভুবসূত্রে নিম্নরূপ নির্ণীত হয়েছে :

'অথাঽনাদিমলঃ পুংসাং পশুত্বং পরিকীর্ত্তিতম্।
তুষকম্বুকবৎ জ্ঞেয়ং মায়ারাগাঙ্কুরস্য তৎ ॥' ১৯।

—শতরত্নসংগ্রহ, পৃঃ ৩৬

অনাদি মলের সঙ্গে যোগই জীবাত্মার পশুত্ব। এই অনাদি মল তুষকম্বুকের

মতো। মায়ার প্ররোহাভিমুখ অঙ্কুর তুষকম্বুককল্প এই অনাদি মলেই লুক্কায়িত থাকে।[১]

শ্রীমৎ উমাপতি শিবাচার্য্য তাঁর শতরত্ন-সংগ্রহের টীকায় মল শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করেছেন—মলিনীকরোতি দৃক্‌ক্রিয়াত্মকং তেজঃ প্রচ্ছাদয়তীতি মলঃ—জ্ঞানক্রিয়ারূপ শক্তি মলিন অর্থাৎ আচ্ছন্ন করে যা তাই মল। যেমন একটি ধান্যকণার আভ্যন্তরীণ অংশ থেকে ধান্যের অঙ্কুর উদ্গত হয়, তেমনি জীবাত্মার এই অনাদি মলকে আশ্রয় করে মায়াপরিকল্পিত সংসারের উদ্ভব হয়।

অজ্ঞান জ্ঞানক্রিয়াশক্তিকে আচ্ছন্ন করে, তাই অজ্ঞান মল। অজ্ঞানের জন্যই জীবাত্মার বন্ধ, জ্ঞান মোক্ষের কারণ।

তন্ত্রালোকে শ্রীমৎ অভিনব গুপ্ত অজ্ঞান ও জ্ঞানের লক্ষণ নিম্নরূপ নিরূপিত করেছেন :

'ইহ তাবৎ সমস্তেষু শাস্ত্রেষু পরিগীয়তে।
অজ্ঞানং সংসৃতের্হেতুর্জ্ঞানং মোক্ষৈককারণম্‌॥' ২২।

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক

অজ্ঞান যে সংসারের এবং জ্ঞান যে মোক্ষের একমাত্র কারণ, তা সমস্ত শাস্ত্রেই অভিহিত হয়েছে।

'মলমজ্ঞানমিচ্ছন্তি সংসারাঙ্কুরকারণম্‌।
ইতি প্রোক্তং তথা চ শ্রীমালিনীবিজয়োত্তরে॥' ২৩।

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক

শ্রীমালিনীবিজয়োত্তর নামক গ্রন্থে অজ্ঞানকে সংসারের উৎপাদক মল বলে বিবৃত করা হয়েছে।

অজ্ঞানের লক্ষণ তন্ত্রালোকের টীকায় আচার্য্য জয়রথ এইভাবে নির্ণীত করেছেন :

'অজ্ঞানং তিমিরং পারমেশ্বরস্বাতন্ত্র্যমাত্রসমুল্লাসিতস্বরূপগোপনাসতত্ত্বম আত্মা-

---

১। 'স্বাতন্ত্র্যহানির্বোধস্য স্বাতন্ত্র্যস্যাপ্যবোধতা।'
দ্বিধাণবং মলমিদং স্বস্বরূপাপহানিতঃ॥'
—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক ২য় শ্লোকের টীকায় জয়রথ-উদ্ধৃত শ্লোক

নাত্মনোঃ অন্যথাভিমানস্বভাবম্ অপূর্ণং জ্ঞানং, তদেব চাণবং মলং ন তু ..... দ্রব্যরূপম্'।[১]

—তন্ত্রালোকঃ প্রথমাহ্নিক—২৩ শ্লোকের টীকা

অজ্ঞান অন্ধকারের মতো আচ্ছাদক, পরমেশ্বর অর্থাৎ পরম শিবের স্বাতন্ত্র্যরূপ স্বরূপকে লুক্কায়িত করে, অজ্ঞান অসৎ তত্ত্ব, অজ্ঞানের ফলে আত্মাকে অনাত্মা ও অনাত্মাকে আত্মা বলে মনে হয়, অজ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান, তাই অণু অর্থাৎ জীবভাবাপন্ন পরম শিবের মল......এই অজ্ঞান দ্রব্য নয়।

অজ্ঞানের অর্থ জ্ঞানাভাব মাত্র নয়, অজ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান। অজ্ঞানের অর্থ তন্ত্রালোকে অভিনব গুপ্ত এইভাবে নিরূপিত করেছেন:

'অজ্ঞানমিতি ন জ্ঞানাভাবশ্চাতিপ্রসঙ্গতঃ।
স হি লোষ্ট্রাদিকেঽপ্যস্তি ন চ তস্যাস্তি সংসৃতিঃ॥' ২৫।

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—২৫ শ্লোক

অজ্ঞান জ্ঞানাভাব হতে পারে না। কারণ লোষ্ট্রাদির তো জ্ঞানাভাব আছে, তাই বলে তাদের অজ্ঞানের বা জ্ঞানাভাবের কার্য্য সংসার নাই কেন?

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উল্লিখিত বৃত্তান্তে আমরা দেখি যে, সুরথ রাজা যখন মেধা ঋষিকে প্রশ্ন করলেন, 'তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি'—হে মহাভাগ! জ্ঞানবিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও মোহগ্রস্ত হওয়ার তাৎপর্য্য কি? তখন মেধা ঋষি তাঁকে বললেন যে, বিষয়জ্ঞান জ্ঞান নয়, তাও অজ্ঞানের নামান্তর মাত্র।[২]

১। 'মলোঽজ্ঞানং তমোঽজ্ঞত্বং তিরস্কারকরস্তথা।
পতিঃ পশুরবিদ্যেতি মলপর্য্যায়বাচকঃ॥' ইতি সুপ্রভেদঃ

—শতরত্ন-সংগ্রহের ১৯নং শ্লোকের টীকায় উমাপতি শিবাচার্য্য কর্তৃক উদ্ধৃত

২। 'ঋষিরুবাচ—। ৪৬

জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে। ৪৭
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্॥
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে। ৪৮
কেচিৎ দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ॥
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্। ৪৯
যতো হি জ্ঞানিনঃ সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ।
জ্ঞানঞ্চ তন্মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্। ৫০
মনুষ্যাণাং চ যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ॥'

অতএব অজ্ঞান জ্ঞানাভাব নয়, অজ্ঞান অপূর্ণ জ্ঞান। তন্ত্রালোকে শ্রীমৎ অভিনব গুপ্ত এক্ষেত্রে শিবসূত্রের প্রমাণের উল্লেখ করেছেন :

'অতো জ্ঞেয়স্য তত্ত্বস্য সামস্ত্যেনাপ্রথাত্মকম্।
জ্ঞানমেব তদজ্ঞানং শিবসূত্রেষু ভাষিতম্॥' ২৬

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—২৬ শ্লোক।

শিবই জ্ঞেয়ের তত্ত্ব।[১] জাগতিক বস্তুকে শিব থেকে ভিন্ন বলে যে জ্ঞান তা অপূর্ণ জ্ঞান। শিবই যে বস্তুরূপে প্রকাশমান, এই জ্ঞান অদ্বৈতজ্ঞান, অতএব পূর্ণজ্ঞান। কিন্তু শিবভিন্নরূপে বস্তু প্রকাশমান, এই জ্ঞান দ্বৈতজ্ঞান, অতএব অপূর্ণজ্ঞানই শিবসূত্রে অজ্ঞান নামে কথিত হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে দুটি শিবসূত্র অভিনব গুপ্ত বিচার করেছেন। এ দুটি হ'লো 'চৈতন্যমাত্মা' ও 'জ্ঞানং চ বন্ধঃ'। ব্যাকরণশাস্ত্রসম্মত সন্ধিকে কেন্দ্র করে 'জ্ঞানং চ বন্ধঃ' এই সূত্রটিকে দুটি আকার দেওয়া হয়েছে—'জ্ঞানং চ বন্ধঃ' এবং 'অজ্ঞানং চ বন্ধঃ'।[২]

জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান পতগাঞ্ছবচঞ্চুষু। ৫১
কর্ণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি। ৫২
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি॥
তথাপি মমতাবর্তে মোহগর্তে নিপাতিতাঃ। ৫৩
মহামায়াপ্রভাবেন সংসারস্থিতিকারিণা॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। ৫৪
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। ৫৫
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী : প্রথম চরিত্র—প্রথম অধ্যায়, ৪৬—৫৫ই শ্লোক

১। 'জ্ঞেয়স্য হি পরং তত্ত্বং যঃ প্রকাশাত্মকঃ শিবঃ।
ন হ্যপ্রকাশরূপস্য প্রাকাশ্যং বস্তুতাপি বা॥' ৫১

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—৫২ শ্লোক

২। 'চৈতন্যমাত্মা জ্ঞানং চ বন্ধ ইত্যত্র সূত্রয়োঃ
সংশ্লেষেতরযোগাভ্যাময়মর্থঃ প্রদর্শিতঃ॥' ২৭

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—২৭ শ্লোক

'চৈতন্যমাত্মা' এই সূত্রের ব্যাখ্যা অভিনব গুপ্তের কারিকায় নিম্নরূপ পাওয়া যায়:

'চৈতন্যমিতি ভাবান্তঃ শব্দঃ স্বাতন্ত্র্যমাত্রকম্।
অনাক্ষিপ্তবিশেষং সদাহ সূত্রে পুরাতনে ॥' ২৮

—তন্ত্রালোক: প্রথমাহ্নিক—২৮ শ্লোক

টীকাকার জয়রথ এই কারিকার গূঢ়ার্থ এইভাবে উদ্ঘাটিত করেছেন: যিনি সর্ব্বস্বকে চেতিত অর্থাৎ প্রকাশিত করেন, তিনিই চেতন অর্থাৎ প্রকাশাত্মক শিব। সেই চেতনের ভাব চৈতন্য। চেতনের অর্থ পূর্ণজ্ঞান-ক্রিয়াবান্। অতএব চৈতন্য বলতে পূর্ণজ্ঞানক্রিয়াবত্ত্বরূপ ধর্ম্মকেই বুঝায়। যেহেতু 'চৈতন্য' শব্দটি ভাববাচক, সেহেতু 'চৈতন্য' শব্দটি পূর্ণজ্ঞানক্রিয়াবত্ত্বরূপ ধর্ম্ম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম্মকে বুঝায় না। এই পূর্ণজ্ঞানক্রিয়াবত্ত্বই পরমেশ্বর অর্থাৎ পরমশিবের স্বাতন্ত্র্যরূপ ঐশ্বর্য্য।[১]

আচার্য্য অভিনব গুপ্ত 'জ্ঞানং চ বন্ধঃ' এই সূত্রের অর্থ এইভাবে কারিকায় সঙ্কেতিত করেছেন:

'দ্বিতীয়েন তু সূত্রেণ ক্রিয়াং বা করণং চ বা।
ব্রুবতা তস্য চিন্মাত্ররূপস্য দ্বৈতমুচ্যতে ॥ ২৯
দ্বৈতপ্রথা তদজ্ঞানং তুচ্ছত্বাৎ বন্ধ উচ্যতে।
তত এব সমুচ্ছেদ্যমিত্যাবৃত্ত্যা নিরূপিতম্ ॥' ৩০।

—তন্ত্রালোক: প্রথমাহ্নিক—২৯-৩০ শ্লোক

১। ইহ ন কিঞ্চিদপি অচেতিতং ভবতি ইতি চিতিক্রিয়া সর্ব্বসামান্যরূপা ইতি। চেতয়তি ইতি চেতনঃ পূর্ণজ্ঞানক্রিয়াবান্, তস্য ভাবঃ চৈতন্যং পূর্ণজ্ঞানক্রিয়াবত্ত্বং তদেব চ পরমৈশ্বর্য্যস্বভাবং স্বাতন্ত্র্যমুচ্যতে। তদাহ স্বাতন্ত্র্যমাত্রকম্ ইতি। স্বাতন্ত্র্যমেব কেবলং স্বাতন্ত্র্যমাত্রকম্, অত এবাহ অনাক্ষিপ্তবিশেষম্ ইতি, অনাক্ষিপ্তাঃ স্বসহচারিণোঽপি নিত্যত্বব্যাপকত্বাদয়ো বিশেষা ভেদা যেন তৎ। ভাবপ্রত্যয়ান্তো হি শব্দঃ সহচারিধর্ম্মান্তরনিবৃত্তিমেব ব্রূতে, অতএব দ্রব্যাভিধায়িনঃ শব্দস্য বিশেষঃ। যদাহুঃ

'ধর্ম্মান্তর-প্রতিক্ষেপাপ্রতিক্ষেপৌ তয়োর্দ্বয়োঃ।
সঙ্কেতভেদস্য পদং জ্ঞাতৃবাঞ্ছানুরোধতঃ ॥
ভেদোঽয়মেব সর্ব্বত্র দ্রব্যভাবাভিধায়িনোঃ।'

—তন্ত্রালোকের প্রথমাহ্নিকের ২৮ শ্লোকের জয়রথ-কৃত ভাষ্য

'জ্ঞানং চ বন্ধঃ'—এই সূত্রে 'জ্ঞান' শব্দটির অর্থ দুটি :—(১) জ্ঞপ্তি অর্থাৎ প্রকাশক্রিয়া এবং (২) যার দ্বারা জ্ঞান অর্থাৎ প্রকাশ সম্ভব হয়, অতএব প্রকাশক্রিয়ার করণ।

প্রথম সূত্র 'চৈতন্যমাত্মা'—এখানে উক্ত 'চৈতন্য' শব্দ চেতন অথাৎ প্রকাশ ক্রিয়ার কর্তাকে বুঝাচ্ছে। সুতরাং দুটি সূত্রকে যোগ করে, অর্থাৎ 'চৈতন্যমাত্মা জ্ঞানং চ বন্ধঃ' এইভাবে যুক্ত অবস্থায়, সূত্র দুটির অর্থ প্রণিধান করলে দেখা যাবে যে, সূত্র দুটিতে—প্রকাশক্রিয়ার কর্তা পরমাত্মাকে প্রকাশক্রিয়া বা প্রকাশক্রিয়ার করণরূপে জানাই দ্বৈতজ্ঞান, এই জ্ঞান পরমাত্মার পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত না করার জন্য অপূর্ণজ্ঞান অতএব অজ্ঞানপদবাচ্য এবং বন্ধের কারণ —এই গভীর অর্থ আভাসিত হয়েছে।[1]

আপন আত্মা এবং জাগতিক বস্তু পরমশিব থেকে ভিন্ন, এই অপূর্ণজ্ঞানই অজ্ঞান এবং এই অজ্ঞানই বন্ধ। অপূর্ণজ্ঞান পূর্ণতাপ্রাপ্ত হ'লে অর্থাৎ আপন আত্মা এবং জাগতিক বস্তু যে পরমশিব থেকে অভিন্ন এই পূর্ণজ্ঞান উদিত হ'লে আত্মার স্বরূপাবস্থান সম্ভব হয়। আত্মার এই স্বরূপাবস্থানই মোক্ষ।[2]

১। দ্বিতীয়েন ইতি অর্থাৎ দ্বিতীয সূত্রবর্ত্তিনা জ্ঞানশব্দেন, জ্ঞপ্তিং জ্ঞানং জ্ঞাযতে যেন ইতি জ্ঞানং চ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা ক্রিযা, করণং চ প্রাধান্যেনাভিদধতা তস্য চৈতন্যমাত্মা—ইত্যুক্তস্বরূপস্য, অতএব চেতয়তে ইতি চিৎ চিতিক্রিয়ায়াং কর্ত্তা, তন্মাত্রমেব কেবলং রূপং যস্য তস্য দ্বৈতমুচ্যতে কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কর্ত্তৃকর্ম্মক্রিযাণাং চ ভিন্নানামবচ্ছেদকানামাগূরণাৎ দ্বৈতপ্রথাসূত্রণং ক্রিযতে, পূর্ণমস্য রূপং নাখ্যাতি ইত্যর্থঃ। তৎ তস্মাৎ সংবিদদ্বৈতাত্মনঃ পূর্ণস্য রূপস্য আখ্যানাৎ দ্বৈতপ্রথা এব অজ্ঞানম্ অপূর্ণং জ্ঞানম্ অপূর্ণত্বাচ্চ তদেব অপূর্ণংমন্যতা—শুভাশুভবাসনাশরীরভুবনাকার-স্বভাববিবিধসঙ্কুচিতজ্ঞানরূপতযা মলত্রয়াত্মা বন্ধ ইতি উচ্যতে, বন্ধরূপত্বাদেব চ তদজ্ঞানং সমুচ্ছেদ্যম্।

মলং কর্ম্ম চ মায়ীয়মাণবমখিলং চ যৎ।
সর্ব্বং হেয়মিতি প্রোক্তং……… ॥

ইত্যুক্ত্যা হেয়মিত্যর্থঃ। নন্বত্র দ্বৈতপ্রথাত্মকত্বাদপূর্ণং জ্ঞানমেব অজ্ঞানম্ ইত্যেতৎ কুতোঽবগতম ইত্যাশঙ্ক্যোক্তম্ ইত্যাবৃত্ত্যা নিরূপিতম্ ইতি। আবৃত্ত্যা ইতি অজ্ঞানম্ ইতি সংহিতাপাতত পুনরাবর্ত্তনেন ইত্যর্থঃ॥ —তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক ২৯—৩০ শ্লোক, আচার্য্য জয়রথ-কৃত ভা

২। 'যত্তু জ্ঞেয়সতত্ত্বস্য জ্ঞানং সর্ব্বাত্মনোজ্ঝিতম্।
অবচ্ছেদৈর্ন তৎ কুত্রাপ্যজ্ঞানং সত্যমুক্তিদম্॥' ৩৫ —তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—৩৫ শ্লো
'মোক্ষো হি নাম নৈবান্যঃ স্বরূপপ্রথনং হি সঃ।
স্বরূপং চাত্মনঃ সংবিৎ…… …॥'

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—৩১ কারিকা, জয়রথের ভাষ্যে উদ্ধৃ

তন্ত্রাচার্য্যগণ এই অজ্ঞানরূপ অনাদিমলকে দুই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা দেখেছেন। ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মার বন্ধদশার ব্যবহারিক দৃষ্টিতে এই অজ্ঞানরূপী অনাদিমলের নানা বৈচিত্র্য। কিন্তু পারমেশ্বরিক লীলার পারমার্থিক দৃষ্টিতে এই অজ্ঞানাত্মক অনাদিমল একই।

মৃগেন্দ্রসূত্রে এই তাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত উপনিবদ্ধ হয়েছে :

'তদেকং সর্বভূতানামনাদি নিবিড়ং মহৎ।
প্রত্যাত্মস্থ-স্বকালান্তা-পায়িশক্তিসমূহবৎ ॥' ২০

—উমাপতি শিবাচার্য্যের শতরত্নসংগ্রহ, ২০ কারিকা

প্রাণীর আবরক সেই অনাদিমল একই। তা নিবিড় অর্থাৎ অভেদ্য এবং জীবাত্মাসমূহের চৈতন্যকে সীমিত করে বলে মহৎ। তার অনন্ত শক্তি আছে। ঐ শক্তিগুলি প্রতিজীবাত্মায় এক-একটি করে বিদ্যমান থাকে এবং স্বস্বপরিণামকালে অপসৃত হয়।

কিন্তু এই মলশক্তিগুলি জীবাত্মাকে স্বাধীনভাবে আচ্ছন্ন বা পরিণামকালে মুক্ত করতে পারে না। পরমেশ্বরের রোধশক্তি বা অনুগ্রাহকশক্তির গুণেই এই মলশক্তিগুলি জীবাত্মাকে বদ্ধ বা মুক্ত করে।

মৃগেন্দ্রসূত্র এস্থলে প্রণিধানযোগ্য :—

'তাসাং মাহেশ্বরী শক্তিঃ সর্ব্বানুগ্রাহিকা শিবা।
ধর্ম্মানুবর্ত্তনাদেব পাশ ইত্যুপচর্য্যতে ॥' ২১

—শতরত্নসংগ্রহ : ২১ কারিকা

মহেশ্বরের শক্তি স্বভাবতঃই সকল জগতের কল্যাণকারিণী। তিনি পাশ অর্থাৎ বন্ধনরজ্জু হ'তে পারেন না। তবে তিনি যখন মলশক্তির ধর্ম্ম অনুসরণ করেন, তখনই তাঁকে গৌণরূপে পাশ বলা হয়। পরমশিবের জ্ঞানক্রিয়াশক্তিকে আবৃত করাই মলশক্তির ধর্ম্ম। পরমশিবের শক্তি যখন পরমশিবের জ্ঞানক্রিয়ারূপ ঐশ্বর্য্যকে আচ্ছন্ন করেন, তখনই তিনি পাশ এই সংজ্ঞায় অভিহিতা হন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে এই মাহেশ্বরী শক্তি যে একাধারে জীবের বন্ধদশাবিধান ও মোক্ষপ্রদানে সমর্থা সে কথা বলা হয়েছে :

'সা বিদ্যা পরমা মুক্তেহে্তুভূতা সনাতনী। ৫৭
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী॥' ৫৮॥

—শ্রীশ্রীচণ্ডী : প্রথম চরিত্র—প্রথম অধ্যায়, ৫৭—৫৮ শ্লো

তিনি সংসার থেকে মুক্তির কারণ পরমব্রহ্মবিদ্যারূপিণী। তিনি সনাতনী আবার তিনিই সংসারবন্ধের কারণভূতা অবিদ্যারূপিণী। তিনি ব্রহ্মা, বি ইত্যাদি সকল ঈশ্বরেরই ঈশ্বরী।

মাহেশ্বরী শক্তির এই লীলারহস্যই শাক্ত কবির আকূতিতে রসালেখ্য লা করেছে :

'জানি, জানি গো জানি, যেমন পাষাণের মেয়ে।
আমারই অন্তরে থাক মা, আমারে লুকায়ে॥
প্রকাশি আপন মায়া, সৃজিলে অনেক কায়া,
বান্ধিলে নিগুর্ণ ছায়া, ত্রিগুণ দিয়ে।
কার প্রতি সুমতি, কুমতি হও মা কার প্রতি,
আপনারো দোষ ঢাক কারে দোষ দিয়ে॥' —ক. বি. শা. প. : ভক্তের আকূতি

কিন্তু ভক্তযোগী কবি কমলাকান্ত নির্ব্বাণ বা স্বর্গসুখের অভিলাষী নন তিনি সর্ব্বসাধনস্তন্তরূপা শরণাগতিকে আশ্রয় করে মাহেশ্বরীর লীলাশুক হবার জন্য ব্যাকুল, তাই জগজ্জননীর কাছে তাঁর স্নেহের দাবি :

'মা, না করি নির্ব্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিরখি চরণদুটি হৃদয়ে রাখিয়ে।
কমলাকান্তের এই নিবেদন ব্রহ্মময়ী,
তাহে বিড়ম্বনা কর মা, কি ভাব ভাবিয়ে॥'

—ক. বি শা. প. : ভক্তের আকূতি

অজ্ঞানের স্বরূপ সম্বন্ধে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত এবং পাতঞ্জল বেদান্তের সিদ্ধান্তের মধ্যে গভীর ঐক্য লক্ষ্য করা যায়।

অবিদ্যার লক্ষণ যোগসূত্রের ব্যাসভাষ্যে এইভাবে নির্ণীত হয়েছে :

'তস্যাশ্চ অবিদ্যায়াশ্চ অমিত্রাগোষ্পদবৎ বস্তুসতত্ত্বং বিজ্ঞেয়ম্, যথা নামিত্রো মিত্রাভাবো ন মিত্রমাত্রম্ কিন্তু তদ্বিরুদ্ধঃ সপত্নঃ, তথাঽগোষ্পদং ন গোষ্পদাভাবো

ন গোষ্পদমাত্রং কিন্তু দেশ এব বিপুলং তাভ্যামন্তং বস্ত্বন্তরম্, এবমবিদ্যা ন প্রমাণং ন প্রমাণাভাবঃ কিন্তু বিদ্যাবিপরীতং জ্ঞানান্তরমবিদ্যেতি।'—'অনিত্যাশুচিদুঃখানাত্মসু নিত্যশুচিসুখাত্মখ্যাতিরবিদ্যা'—এই যোগ সূত্রের ব্যাসভাষ্য।

অমিত্র, অগোষ্পদ শব্দের মতো অবিদ্যা শব্দও অন্যার্থবাচী। যেমন অমিত্র শব্দ মিত্রের অভাব বা কোন মিত্রবিশেষকে না বুঝিয়ে মিত্রের বিপরীত শত্রুকেই বুঝিয়ে থাকে, যেমন অগোষ্পদ শব্দ গোষ্পদের অভাব বা কোন গোষ্পদবিশেষকে না বুঝিয়ে গোষ্পদের অভাব বা গোষ্পদবিশেষ থেকে স্বতন্ত্র এক বিপুল ভূখণ্ডকে বুঝিয়ে থাকে, তেমনি অবিদ্যা শব্দ প্রমাণকেও বুঝায় না, প্রমাণাভাবকেও বুঝায় না কিন্তু জ্ঞানের বিপরীত এক স্বতন্ত্র জ্ঞানকে বুঝিয়ে থাকে।

অজ্ঞান শব্দের লক্ষণ যোগীন্দ্র সদানন্দ তাঁর বেদান্তসার গ্রন্থে এইরূপে নির্ণীত করেছেন :

'অজ্ঞানন্তু সদসদ্ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং, ত্রিগুণাত্মকং, জ্ঞানবিরোধি, ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি।'

এই অজ্ঞান সৎ কি অসৎ? সৎ হ'তে পারে না, কারণ অজ্ঞান আকাশকুসুম বা খরগোসের শিঙয়ের মতো অলীককল্পনা। কিন্তু অজ্ঞান অসৎও হ'তে পারে না, কারণ অসৎ হ'লে অজ্ঞান সংসারের কারণ হয় কিভাবে? সুতরাং অজ্ঞানকে সৎ বা অসৎ কিছুই বলা যায় না। তাই অজ্ঞান অনির্ব্বচনীয়। অজ্ঞান সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণে মণ্ডিত।[১]

অজ্ঞান আত্মসাক্ষাৎকারের ফলে নিবৃত্ত হয়। তাই অজ্ঞান জ্ঞানবিরোধী অর্থাৎ জ্ঞাননাশ্য।[২] নৈয়ায়িকদের মতে অভাব সপ্তম পদার্থ।[৩] তাঁরা

১। অজ্ঞানের ত্রিগুণাত্মকত্বের প্রতিপাদক শ্রুতি—
'অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং স্বরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥'—শ্বেতাশ্বতর ৪।৫

২। 'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥' —গীতা ৭।১৪

৩। 'দ্রব্যং গুণস্তথা কর্ম্ম সামান্যং সবিশেষকম্।
সমবায়স্তথাভাবঃ পদার্থা সপ্ত কীর্ত্তিতাঃ॥ —ভাষা-পরিচ্ছেদ পদার্থ নিরূপণ

অজ্ঞানকে জ্ঞানাভাব বলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। কিন্তু অজ্ঞান অভাবরূপ নয় অজ্ঞান ভাবরূপ। অজ্ঞানের স্বরূপ ঠিক ঠিক আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় না। তাই যোগীন্দ্র সদানন্দ অজ্ঞানকে যৎকিঞ্চিৎ এইভাবে লক্ষিত করেছেন।

এইজন্যই অজ্ঞান অঘটিতঘটনাপটীয়ঃ অর্থাৎ অঘটনঘটনে সক্ষম।[১]

তন্ত্রাচার্য যেমন মলাত্মক অজ্ঞানকে পারমেশ্বরী ভূমি থেকে এক এবং জৈবী ভূমি থেকে অনন্ত বলেছেন, বৈদান্তিকও তেমনি অজ্ঞানকে, সমষ্টি ও ব্যষ্টি, এই দুই দৃষ্টিকোণ থেকে, এক ও অনন্ত, বলে বর্ণনা করেছেন।

যোগীন্দ্র সদানন্দ তাঁর বেদান্তসার গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে এইরূপ মন্তব্য করেছেন

'ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণৈকমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে? তথাহি— যথা বৃক্ষাণাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ বনমিত্যেকত্বব্যপদেশঃ, যথা বা জলানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ, তদেকত্বব্যপদেশঃ। যথা বনস্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ বৃক্ষ ইত্যনেকত্বব্যপদেশঃ, যথা বা জলাশয়স্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ জলানীতি, তথাঽজ্ঞানস্য ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদনেকত্ব-ব্যপদেশঃ।'

এই অজ্ঞানকে সমষ্টি ও ব্যষ্টি, এই দুই দৃষ্টিকোণ, থেকে এক ও অনেক বলা হয়। যেমন সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বৃক্ষসমূহকে বনসংজ্ঞায় অভিহিত করে একক সত্তারূপে কল্পনা করা হয় বা অনুরূপ চিন্তাসূত্র অনুসরণ করেই প্রভূত জলকে জলাশয় বলা হয়—তেমনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান জীবাত্মাসমূহের অজ্ঞাননিচয়ের এক অখণ্ড সামগ্রিক রূপের কথা চিন্তা করেই অজ্ঞানকে এক বলা হয়। যেমন বনকে বিচ্ছিন্ন বা খণ্ড দৃষ্টিতে দেখে বৃক্ষসমূহ বলে বনের

১। 'অবিদ্যায়া অবিদ্যাত্বমিদমেব তু লক্ষণম।
যৎ প্রমাণাসহিষ্ণুত্বমন্যথা বস্তু সা ভবেৎ॥ —বৃঃ ভাষ্যবার্ত্তিক ১৮১
সেয়ং ভ্রান্তির্নিরালম্বা সর্ব্বন্যায়বিরোধিনী।
সহতে ন বিচারং সা তমো যদ্বদ্দিবাকরম্॥ —নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি ৩।৬৬
দুর্ঘটত্বমবিদ্যায়া ভূষণং ন তু দূষণং।
কথঞ্চিৎ ঘটমানত্বেঽবিদ্যাত্বং দুর্ঘটং ভবেৎ॥' —সৌরসংহিতা ৪

তস্মাৎ সত্ত্বেনাসত্ত্বেন সদসত্ত্বেন বা সাবয়বনিরবয়বোভয়াত্মকত্বেন বা ভিন্নাভিন্নোভয়রূপত্বেন বা নির্ব্বক্তুমশক্যত্বেনানির্ব্বাচনীয়জ্ঞানং সবিতরি দিবান্ধপরিকল্পিতান্ধকারবৎ যৎকিঞ্চিৎ ইতি বদন্তি বৃদ্ধা ইতি সিদ্ধম্। — বেদান্তসারের শ্রীমৎ রামতীর্থযতি কৃত বিদ্বন্মনোরঞ্জিনী টীকা

সদানন্দপ্রযুক্ত যৎকিঞ্চিৎ পদটির বিশদ ব্যাখ্যা শ্রীমৎ রামতীর্থযতি উপরি-উৎকলিত অংশে সন্নিবেশিত করেছেন।

অনেকত্ব সূচিত করা হয়, কিংবা যেমন এই খণ্ডদৃষ্টিতেই জলাশয়কে জলসমূহ বলে বর্ণনা করা হয়—তেমনি অজ্ঞানকেও খণ্ডদৃষ্টিতে অনেক অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জীবাত্মানিষ্ঠ বলে ভিন্ন ভিন্ন বলা হয়ে থাকে।

এই সমষ্টি অজ্ঞান উৎকৃষ্ট উপাধি। এই উপাধিতে উপহিত চৈতন্যই জগৎ-কারণ ঈশ্বর। কিন্তু ব্যষ্টি অজ্ঞান নিকৃষ্ট উপাধি। এই উপাধিতে উপহিত চৈতন্যই জীবাত্মা।[১]

বন ও বৃক্ষ অথবা জল ও জলাশয় যেমন অভিন্ন, সেরূপ ব্যষ্টি অজ্ঞান ও সমষ্টি অজ্ঞানও পরস্পর অভিন্ন। আবার যেমন বন এই উপাধি দ্বারা খণ্ডিত আকাশ ও বৃক্ষ এই উপাধি দ্বারা খণ্ডিত আকাশ অভিন্ন—অথবা জলাশয়ে প্রতিবিম্বিত আকাশ ও জলে প্রতিবিম্বিত আকাশ যেমন অভিন্ন—তেমনই সমষ্টি অজ্ঞান রূপ উপাধিতে ঈশ্বর ও ব্যষ্টি অজ্ঞান রূপ উপাধিতে উপহিত জীবাত্মাও পরস্পর অভিন্ন।[২]

তন্ত্রাচার্য্য অভিনব গুপ্তও এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে তাঁর তন্ত্রালোকগ্রন্থের পঞ্চমাহ্নিকে লিখছেন :

'জীবঃ শক্তিঃ শিবস্যৈব সর্ব্বত্রৈব স্থিতাপি সা ॥ ৯ ॥
স্বরূপপ্রত্যয়ে রূঢ়া জ্ঞানস্যোন্মীলনাৎ পরা ॥'

চিন্মাত্রাত্মক পর-প্রকাশ-রূপ শিবের বিশ্বাবভাসনরূপ শক্তি সর্ব্বত্র পার্থিব বস্তুতে বিদ্যমান হ'লেও অহংজ্ঞান ও কর্তৃত্বজ্ঞানের উদয়হেতু যখন আমি এই বিষয়কে জানছি এইরূপ প্রত্যয়ে বিকশিত হয়ে উঠে, তখনই তাকে জীবসংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়।[৩]

১। ইয়ং সমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা. এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বগুণকং, সদসদব্যক্তমন্তর্য্যামি, জগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে।.........ইয়ং ব্যষ্টি-নিকৃষ্টোপাধিতয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা। এতদুপহিতচৈতন্যমল্পজ্ঞত্বানীশ্বরত্বাদিগুণকং প্রাজ্ঞ ইত্যুচ্যতে।
—সদানন্দ : বেদান্তসার

২। অনয়োর্ব্যষ্টিসমষ্ট্যোর্ব্বনবৃক্ষয়োরিব জলজলাশয়োরিব চাভেদঃ। এতদুপহিতয়োরীশ্বর-প্রাজ্ঞয়োরপি বনবৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশয়োরিব জলাশয়জলগতপ্রতিবিম্বাকাশয়োরিব চাভেদঃ।
—সদানন্দ : বেদান্তসার

৩। কারিকায় উল্লিখিত জ্ঞানকে টীকাকার জয়রথ বলছেন প্রাণাদিরূপাহন্তাত্মককর্তৃতারূপ

জীবভাবের ভিত্তি অহংজ্ঞান ও কর্তৃত্বজ্ঞান। এই দুটি জ্ঞান বিকল্পজ্ঞান থেকে উদ্ভূত। বিকল্পজ্ঞানে একের অপোহ ও অন্যের নিশ্চয় বোধের বিষয়ীভূত হয়। যেমন—এইটি ঘট, এই বিকল্পজ্ঞানে অঘটের অপোহ ও ঘটের নিশ্চয় বুঝা যায়। বিকল্পজ্ঞানের এই নিশ্চয়াংশই জীবের স্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ অহংজ্ঞান ও কর্তৃত্বজ্ঞানের অবভাস রচনা করে।

তন্ত্রালোকের পঞ্চমাহ্নিকে অভিনব গুপ্ত তাঁর পঞ্চমকারিকা উপন্যাস করছেন :

'বিকল্পো নাম চিন্মাত্রস্বভাবো যদ্যপি স্থিতঃ।
তথাপি নিশ্চয়াত্মাসৌ অণোঃ স্বাতন্ত্র্য-যোজকঃ॥' ৫ ॥

যদিও বিকল্প চিন্ময়স্বরূপ তথাপি এই জ্ঞান নিশ্চয়াত্মক এবং এইজন্যই এই জ্ঞানের মাধ্যমে জীবের স্বাতন্ত্র্যের অবভাস সম্ভবপর হয়।[১]

শতরত্নসংগ্রহে উমাপতি শিবাচার্য জীবাত্মার লক্ষণ-সমন্বিত নিম্নরূপ কারিকা সন্নিবেশিত করেছেন :

'দেহাদ্যোঽনশ্বরো ব্যাপী বিভিন্নঃ সমলোঽজড়ঃ।
স্বকর্মফলভুক্ কর্তা কিঞ্চিজ্‌জ্ঞঃ সেশ্বরঃ পশুঃ॥' ১৮ ॥

'দেহাদ্যঃ' পদের দেহশব্দ শুধু শরীরকে বুঝায় না, শরীরসম্বন্ধী দেহাদ্যঃ ইন্দ্রিয়াদিগকেও বুঝায়। সুতরাং জীবাত্মা যে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি থেকে ভিন্ন, সে-কথা প্রথমেই উক্ত হ'ল।

ও স্বরূপপ্রত্যয়কে বলছেন—স্বস্যাত্মনো রূপস্য চ নীলাদেঃ অহমিদং জানামি ইত্যেবংরূপঃ সঙ্কুচিত প্রমাতৃব্যাপারস্বভাবো বিকল্পাত্মা প্রত্যয়ঃ। —তন্ত্রালোক : পঞ্চমাহ্নিক, জয়রথ টীকা

১। যদ্যপ্যেবং তথাপি অসৌ বিকল্পো নাযমঘটো ভবতি ইতি অন্যাপোহেন ঘটোঽয়মিতি নিশ্চয়াত্মকত্বাৎ অণোঃ সঙ্কুচিতস্য প্রমাতুঃ স্বাতন্ত্র্যং যোজয়তি বিকল্প্যমানেঽর্থে তস্যৈব স্বাতন্ত্র্যোপপত্তেঃ। অতএব ক্ষেত্রজ্ঞব্যাপারো বিকল্পঃ ইত্যুক্তম্। তথাহি ঘটাবভাসেঽনবভাতমপি ঘটবিপর্যায়ং ব্যবহারোপযোগ্যতয়া স্বস্বাতন্ত্র্যাদেব প্রমাতা প্রতিপদ্যতে, অন্যথা হি মায়াপদে পরস্পরপরিহারপ্রতীতিং বিনা গ্রাহ্যগ্রাহকভাবাত্মা ব্যবহার এব ন সিদ্ধ্যেৎ।

— তন্ত্রালোক : পঞ্চমাহ্নিক—৫ম কারিকা, জয়রথটীকা

অভিনব গুপ্ত দেহের চেষ্টিতে প্রাণনা-শক্তির বিস্ময়কর বিকাশ প্রত্যক্ষ করে বলছেন :

'সা প্রাণবৃত্তিঃ প্রাণাদ্যৈ রূপৈঃ পঞ্চভিরাত্মসাৎ।
দেহং যৎ কুরুতে সংবিৎপূর্ণস্তেনৈষ ভাসতে ॥'

—তন্ত্রালোক : ৬ষ্ঠ আহ্নিক—১৪ কারিকা

যখন সেই সামান্যপরিস্পন্দনরূপ প্রাণবৃত্তি প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান—এই পাঁচপ্রকার রূপে ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত দেহকে পরিব্যাপ্ত করে, তখন সেই দেহ সংবিৎপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়। এইজন্যই দেহ চেতন আত্মার মতোই কর্ম্মাদি করে। মূঢ়গণ দেহের এই চেষ্টিতকে দেখেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকে যে, দেহব্যতিরিক্ত আত্মা নাই।[১]

সুতরাং 'দেহান্যঃ' পদটি বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। চার্ব্বাক দর্শনের মতের খণ্ডন এই পদটিতে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে।[২]

আত্মা ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্ততি নয়, আত্মা নিত্য। 'অনশ্বরঃ' এই উক্তির

অনশ্বরঃ — মাধ্যমে আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বৌদ্ধ দার্শনিক মত খণ্ডিত হ'ল।

আত্মা জিন দর্শনের মতানুযায়ী শরীর-পরিমাণ অব্যাপক নয়। আত্মা

ব্যাপী — ব্যাপক।

অহঙ্কারযুক্ত কর্ত্তৃতাবোধ-বিমণ্ডিত জীবাত্মা বিভিন্ন। কিন্তু যে অর্থে

বিভিন্নঃ — সাংখ্যদর্শন পুরুষকে বহু বলছেন, সেই অর্থে তন্ত্রাচার্য্যগণ জীবাত্মাকে বিভিন্ন বলছেন না।[৩] কারণ সাংখ্যদর্শনে পুরুষ স্বতন্ত্র, কিন্তু সেশ্বর শক্তিদর্শনে মাহেশ্বরী শক্তির লীলাতেই জীবভাবের উদ্ভব।

জীবাত্মা পরমশিবের স্বতন্ত্রশক্তিকে মলিন করে এইরূপ মলসংজ্ঞক

সমলঃ — অজ্ঞানযুক্ত।

১। প্রাণনাবৃত্তিতাদাত্ম্যসংবিৎখচিতদেহজাং। চেষ্টাং পশ্যন্ত্যতো মুগ্ধা নাস্ত্যান্যদিতি মন্যতে ॥ ১৫
—তন্ত্রালোক : ৬ষ্ঠ আহ্নিক—১৫ কারিকা

২। তামেব বালমূর্খস্ত্রীপ্রায়বেদিতৃসংশ্রিতাম্। মতিং প্রমাণীকুর্ব্বন্তশ্চার্ব্বাকাস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ ১৬
—তন্ত্রালোক : ৬ষ্ঠ আহ্নিক—১৬ কারিকা

৩। জন্মমরণকরণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎপ্রবৃত্তেশ্চ। পুরুষবহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব ॥ ১৮
—ঈশ্বরকৃষ্ণ : সাংখ্যকারিকা

অজড়ঃ জীবাত্মা জড় নয়, জীবাত্মা চেতন। চৈতন্য না থাকলে জীবাত্মার কর্তৃতার উপপত্তি হয় না।[১]

স্বকর্ম্মফলভুক জীবাত্মা আপন কর্ম্মের ধর্ম্মাধর্ম্মাত্মক ফল ভোগ করে। কর্ম্মবিপাকহেতু জাতি, আয়ু ও ভোগ—এই তিন প্রকার ফলের উৎপত্তি হয়।[২] শতরত্নসংগ্রহে জীবের ভোগোৎপত্তিতে কর্ম্মের ভূমিকা সম্বন্ধে তাৎপর্য্যপূর্ণ কারিকা পাওয়া যায়।

'কর্ম্মতশ্চ শরীরাণি বিষয়াঃ করণানি চ।
ভোগসংসিদ্ধয়ে ভোক্তুর্ভবন্তি ন ভবন্তি চ॥' ৪২

—শতরত্নসংগ্রহ : ৪২ কারিকা

জীবাত্মার ভোগ যাতে সম্ভবপর হয় তার জন্য কর্ম্ম থেকে লব্ধরূপ স্থূলশরীর, শব্দাদি বিষয় ও বুদ্ধ্যাদি ইন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়। কর্ম্মের অভাবে এগুলির উদ্ভব হয় না।

কর্ত্তা অচেতন শরীরাদির কর্তৃত্ব যুক্তিগ্রাহ্য নয়। জীবাত্মাই কর্ত্তা। অবশ্য জীবাত্মার এই কর্তৃত্বাভিমান ঔপাধিক।

কিঞ্চিজ্ জ্ঞঃ জীবাত্মার জ্ঞান অপূর্ণজ্ঞান। পূর্ণজ্ঞান তার নাই বলেই সে কিঞ্চিজ্ জ্ঞঃ অর্থাৎ স্বল্পজ্ঞানযুক্ত।

সেশ্বরঃ জীবাত্মা সাংখ্যদর্শনের মতো নিরীশ্বর নয়। তার একজন প্রেরক ঈশ্বর আছেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে পশু বা জীবকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রলয়াকল বা কেবল, সকল এবং বিজ্ঞানাকল বা অমল—পশুর এই তিন ভাগ।

১। পৌষ্করে এইরূপ কথিত হয়েছে :

প্রবর্তমানো দেহাদিশ্চেতনাধিষ্ঠিতঃ সদা।
স্বতঃ প্রবৃত্তিশূন্যত্বাৎ জড়ত্বেন পটাদিবৎ॥
বস্তু প্রবর্তকঃ সোঽয়মাত্মেতি পরিপঠ্যতে॥

—শতরত্নসংগ্রহে উমাপতি শিবাচার্য্য কর্তৃক উদ্ধৃত

২। সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ—পাতঞ্জল যোগদর্শন : ১৩ সূত্র

'জন্মপ্রায়ণান্তরে কৃতঃ পুণ্যাপুণ্যকর্ম্মাশয়প্রচয়ো বিচিত্রঃ প্রধানোপসর্জ্জনভাবেনাবস্থিতঃ প্রায়ণাভিব্যক্ত একপ্রঘট্টকেন মিলিত্বা মরণং প্রসাধ্য সংমূর্চ্ছিত একমেব জন্ম করোতি, তচ্চজন্ম তেনৈব কর্ম্মণা লব্ধায়ুষ্কং ভবতি, তস্মিন্ আয়ুষি তেনৈব কর্ম্মণা ভোগঃ সম্পদ্যতে ইতি।'

—পাতঞ্জল যোগদর্শন : ১৩ সূত্রের ব্যাসভাষ্য

প্রলয়াকল বা কেবল পশুর লক্ষণ শতরত্নসংগ্রহে নিম্নরূপ নির্ণীত হয়েছে :

'অচেতনো বিভুর্নিত্যো গুণহীনোঽক্রিয়োঽপ্রভুঃ।
ব্যাঘাতভাগশক্তশ্চ শোধ্যো বোধ্যোঽকলঃ পশু॥' ৩৫

কাঠ, পাথর যে অর্থে অচেতন, কেবল পশু বা জীব সেই অর্থে অচেতন নয়। এইজাতীয় জীবের জ্ঞানরূপ চৈতন্য মলের দ্বারা আবৃত থাকার জন্য ভোগ্যার্থকে অবভাসিত করতে পারে না। কিন্তু এই জীবের আত্মা ব্যাপক ও উৎপত্তি-রহিত। এই জীবের ক্ষেত্রে মায়া, কলা, বিদ্যা, রাগ, নিয়তি, কাল প্রভৃতি অনুদ্রিক্ত; তাই এই জীবকে গুণহীন বলা হয়েছে। করণ-ব্যাপাররূপ ক্রিয়া এই জীবের পক্ষে সম্ভব নয়। এই জীব যেমন স্বতন্ত্র-কর্ত্তা নয়, তেমনি হেতুকর্ত্তাও নয়। শিবশক্তিতিরস্কারই ব্যাঘাত। এই জীবের কাছ থেকে শিবশক্তি তিরোহিত। এরূপ জীব ইন্দ্রিয়কে অর্থে প্রবৃত্ত করতে সক্ষম নয়। এই কারণেই এই জীব শিবের দ্বারা শোধ্য ও বোধ্য, অর্থাৎ শিব এই জীবের মল দূরীভূত করে পূর্ণজ্ঞান বিকশিত করেন।

সকল পশুর কতকগুলি উচিতার্থক নাম শতরত্নসংগ্রহে লিপিবদ্ধ হয়েছে :

'সংসারী বিষয়ী ভোক্তা ক্ষেত্রী ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
শরীরী চেতি বদ্ধাত্মা সকলঃ সোচ্যতে বুধৈঃ॥' ৪৪

এই জীবের বদ্ধই আত্মা। সে কলাদির সঙ্গে বিদ্যমান থাকে, তাই সে সকল। সে ক্রমান্বয়ে শরীরের গ্রহণ ও বর্জ্জনের মাধ্যমে সংসরণ করে, তাই সে সংসারী। বিষয় তার ভোগ্য হিসাবে বিদ্যমান, তাই বিষয়ী। তার সুখদুঃখ-মোহাত্মক[১] ভোগ আছে, তাই সে ভোক্তা। তার স্বশক্তি-বিকাশের ক্ষেত্র আছে, তাই সে ক্ষেত্রী। পাশজালরূপ ক্ষেত্রকে সে ভোগ্য বলে জানে, তাই সে ক্ষেত্রজ্ঞ।[২] তার স্বভাবায়তন শরীর আছে, তাই সে শরীরী।

১। 'ভোগোঽস্য বেদনা পুংসঃ সুখদুঃখাদিলক্ষণঃ।
তাং সমর্থিতচৈতন্যঃ পুমানভ্যেতি কর্ম্মতঃ॥' ৪১ —শতরত্নসংগ্রহ : ৪১ কারিকা

২। ক্ষেত্রজ্ঞঃ ক্ষেত্রং পাশজালং ভোগ্যত্বেনোপস্থিতং জানাতীতি ক্ষেত্রজ্ঞঃ।
—শতরত্নসংগ্রহ : ৪৪ কারিকার টীকা

বিজ্ঞানাকল বা অমল জীবের মোক্ষপ্রাপ্তিক্রম শতরত্নসংগ্রহে উপদিষ্ট হয়েছে :

'তমঃশক্ত্যধিকারস্থ নিবৃত্তেস্তৎপরিচ্যুতৌ।
ব্যনক্তি দৃক-ক্রিয়ানন্ত্যং জগদ্বন্ধুরণোঃ শিবঃ॥' ৪৫ কারিকা

অন্ধকারের মতো আবরক মল। মাহেশ্বরী তিরোধানশক্তির অধিকার অবসিত হ'লে তারা নিবৃত্ত হয়। তখন জগদ্বন্ধু অর্থাৎ অনুগ্রাহক শিব অণু বা জীবের অনন্ত জ্ঞানক্রিয়ারূপ ঐশ্বর্য্য অভিব্যক্ত করেন।

যে জীবের উপর শিবের এই অনুগ্রহকরী শক্তি পতিত হয় তার মোক্ষে ঔৎসুক্য, সংসারস্থিতিতে দ্বেষ, শিবভক্তে ভক্তি ও আগমাদি শিবশাস্ত্রে শ্রদ্ধা উদিত হয়। তার অকস্মাৎ বিবেক, অর্থাৎ আমি অনিত্য, অশুচি, দুঃখময়, অনাত্মভূত প্রকৃতি থেকে ভিন্ন স্বয়ং দীপ্যমান পরমেশ্বরাধীন চেতনাত্মক পুরুষ—এইরূপ বোধ জাগরিত হয়। এইরূপে বিবেক ও বৈরাগ্যের অভ্যুদয় হ'লে জীবের আত্মতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্বে জিজ্ঞাসা দেখা দেয়। তখন শিব সেই পুরুষের সদ্‌গুরুসঙ্গ বিধান করেন। সদ্‌গুরুর নিকট দীক্ষা লাভ করে পুরুষ বিচ্ছিন্নবন্ধন হয়ে শিবসাযুজ্য লাভ করে। সাধকের আত্মার সঙ্গে পরমশিবের এই অনুগ্রাহ্য-অনুগ্রাহক-লক্ষণ সম্বন্ধ শৈবী শক্তির বলেই সম্ভবপর হয়। শতরত্নসংগ্রহকার এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন :

'একৈব বস্তুতঃ শৈবী যা শক্তির্নিমলা পরা।
অবিনাভাবিনী শম্ভোঃ শুচেরুষ্ণমিব প্রভো॥ ৬৫
তয়া আত্মশিবয়োঃ সম্বন্ধঃ শিববোধ-পরাপরা॥' ৬৬

মলরহিতা উৎকৃষ্টা শিবসম্বন্ধিনী যে শক্তি পরমার্থতঃ শিব থেকে অভিন্না। অগ্নি থেকে তার দাহিকা শক্তিকে যেমন পৃথক করা যায় না, সেরূপ শিব

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ক্ষেত্র শব্দের যে অর্থ করা হয়েছে, সে অর্থ এখানে গৃহীত হয় নাই।

'ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।' —গীতা : ১৩ অধ্যায় ॥ ১

'মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ॥ ৫
ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥' ৬ —গীতা : ১৩ অধ্যায়

থেকে শক্তিকে ভিন্ন ভাবা যায় না। শিবের এই অবিনাভাবিনী শক্তিই সমবায়িনী শক্তি। এই শক্তিই শিবজ্ঞানস্বরূপিণী। এই শক্তি দ্বারাই শিব মুমুক্ষু জীবকে অনুগ্রহ করেন।

দীক্ষায় পুরুষগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হ'লেও বুদ্ধিগত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না। কারণ, যতক্ষণ দেহ থাকে ততক্ষণ বুদ্ধিতে পুরুষের আত্মবুদ্ধি নিবারিত হয় না। সুতরাং দীক্ষায় যে পুরুষের পৌরুষেয় অজ্ঞান দূরীভূত হয়েছে, সেই পুরুষের দেহান্তের পর বুদ্ধিতে আত্মগ্রহের নিবৃত্তির মাধ্যমেই মোক্ষ লাভ হয়। যতক্ষণ ভেদপ্রথাত্মক বিকল্প থাকে, ততক্ষণ মোক্ষ হ'তে পারে না। কারণ এই বিকল্পই অখ্যাতিরূপ অতএব অজ্ঞান। বুদ্ধিতে পুরুষের যতক্ষণ আত্মগ্রহ থাকে, ততক্ষণ অজ্ঞানস্বরূপ বিকল্পও থাকে। বুদ্ধিতে এই আত্মগ্রহ নিবৃত্ত হ'লেই বিকল্প বিলীন হয়, অর্থাৎ অপূর্ণজ্ঞানের তিরোভাব ও পূর্ণজ্ঞানের আবির্ভাবের ফলে আত্মা স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়—যে স্বরূপস্থিতিই আত্মার মোক্ষ।[১]

আত্মস্থিত সাধকের মহানুভূতি তন্ত্রালোকের দ্বিতীয় আহ্নিকে অভিনব গুপ্ত বিবৃত করেছেন :

'তেষামিদং সমাভাতি সর্ব্বতো ভাবমণ্ডলম্।
পুরঃস্থমেব সংবিত্তিভৈরবাগ্নিবিলাপিতম্॥' ৩৫

যাঁরা পরম পদবীতে আরূঢ় হয়েছেন, তাঁদের কাছে এই পরিদৃশ্যমান ভাবসমূহ দেহাদি থেকে অতিরিক্ত রূপে সম্মুখে প্রতীয়মান হ'লেও ভৈরব-

---

১। দীক্ষয়া গলিতেপ্যন্তরজ্ঞানে পৌরুষাত্মনি।
ধীগতস্যানিবৃত্তত্বাদ্বিকল্পোঽপি হি সম্ভবেৎ॥ ৪৮
দেহসদ্ভাবপর্য্যন্তমাত্মভাবো যতো ধিয়ি।
দেহান্তেঽপি ন মোক্ষঃ স্যাৎ পৌরুষাজ্ঞানহানিতঃ॥ ৪৯

—তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক, ৪৮—৪৯ কারিকা

"দীক্ষিতস্যাপি হি নিয়তকালং বুদ্ধাবাত্মগ্রহো ভবেৎ ইতি তয়োরভেদাৎ বৌদ্ধমপ্যজ্ঞানমাত্মন্যু-পচিতং সম্ভবেৎ ইতি ভাবঃ। অতএব দেহান্তে বুদ্ধাবাত্মগ্রহব্যুপরমাৎ পৌরুষস্যাজ্ঞানস্য দীক্ষাদিনা পূর্ব্বমেব প্রধ্বস্তত্বান্মোক্ষঃ ইতি যুক্তমুক্তং তচ্ছরীরান্তে তজ্‌জ্ঞানং ব্যজ্যতে স্ফুটম্ ইতি।"

—তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক, ৪৯ কারিকার জয়রথ টীকা

'বৌদ্ধাজ্ঞাননিবৃত্তৌ তু বিকল্পোন্মূলনাদ্ধ্রুবম্।
তদৈব মোক্ষ ইত্যুক্তং ধাত্রা শ্রীমন্নিশাটনে॥' ৫০ —তন্ত্রালোক : ৫০ কারিকা

সম্বন্ধীয় অগ্নির মতো উজ্জ্বল সংবিত্তত্ত্বে পূর্ণ বলে জ্ঞান হয়। তাঁর তৎকালীন মনোভাব জয়রথের টীকায় উদ্ধৃত শ্লোকে সুব্যক্ত হয়েছে :

'মত্ত এবোদিতমিদং ময্যেব প্রতিবিম্বিতম্।
মদভিন্নমিদং চ.................. ॥'

ভাবসমূহ আমা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে, আমাতেই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, এগুলি আমা থেকে পৃথক নয়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই অবস্থা এইরূপে বিবৃত হয়েছে :

'সর্ব্বভূতস্থমাত্মানাং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥'—ষষ্ঠ অধ্যায় : ২৯ শ্লোক

যোগী সর্ব্বভূতে আত্মাকে ও আত্মায় সর্ব্বভূতকে নিরীক্ষণ করেন, তিনি সর্ব্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন।

শাক্ত কবিও আত্মতত্ত্ব অনুসন্ধানকেই জীবনের চরম লক্ষ্য বলে মেনে নিয়েছেন। 'আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ'—এই ঔপনিষদিক সুরে সুর মিলিয়েই সাধক কবি কমলাকান্ত গেয়েছেন :

'আপনারে আপনি দেখ, যেও না মন, কারু ঘরে।
যা চাবে, এইখানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরম ধন পরশমণি—যে অসংখ্য ধন দিতে পারে,
এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে ॥
তীর্থগমন, দুঃখভ্রমণ, মন উচাটন হয়ো না রে,
তুমি আনন্দ-ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হও না মূলাধারে।
কি দেখ কমলাকান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে,
ওরে, বাজিকরে চিনলে না, সে তোমার ঘটে বিরাজ করে ॥'
—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য : ক. বি. শা. প.—মনোদীক্ষা

মাহেশ্বরী শক্তির কৃপায় যিনি আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে শিব-শক্তির অখণ্ড যামল তত্ত্বের অনুভূতি লাভ করেন, তিনি দেহান্তে সমস্ত জীবভাব পরিত্যাগ করে শিবভাব প্রাপ্ত হন। পরমশিবের মতো তখনই তিনি অঘটন-ঘটনপটীয়সী মহাশক্তির লীলামহিমা অনুভব করতে পারেন—বলতে পারেন :

'অনন্তরূপিণী কালী, কালীর অন্ত কেবা পায় ?
কিঞ্চিৎ মাহাত্ম্য জেনে শিব পড়েছেন রাঙা পায় ॥'
—রামকৃষ্ণ রায় মহারাজ : ক. বি. শা. প.—নামমহিমা

শক্তিদর্শন ও শাক্ত কবি

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কে জানে কালী কেমন

"শ্রীরামকৃষ্ণ—বেদান্তবাদী ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলে, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীব-জগৎ এ-সব শক্তির খেলা। বিচার করতে গেলে, এ-সব স্বপ্নবৎ, ব্রহ্মই বস্তু আর সব অবস্তু, শক্তিও স্বপ্নবৎ, অবস্তু।

কিন্তু হাজার বিচার কর, সমাধিস্থ না হ'লে শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নেই। আমি ধ্যান করছি, আমি চিন্তা করছি—এ-সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশ্বর্য্যের মধ্যে।

তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এককে মানলেই আর একটিকে মানতে হয়। যেমন অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি,—অগ্নি মানলেই দাহিকা-শক্তি মানতে হয়, দাহিকা-শক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না, আবার অগ্নিকে বাদ দিয়ে দাহিকা-শক্তি ভাবা যায় না। সূর্য্যকে বাদ দিয়ে সূর্য্যের রশ্মি ভাবা যায় না, সূর্য্যের রশ্মিকে ছেড়ে সূর্য্যকে ভাবা যায় না।

দুধ কেমন? না, ধোবো ধোবো। দুধকে ছেড়ে দুধের ধবলত্ব ভাবা যায় না। আবার দুধের ধবলত্ব ছেড়ে দুধকে ভাবা যায় না।

তাই ব্রহ্মকে ছেড়ে শক্তিকে, শক্তিকে ছেড়ে ব্রহ্মকে ভাবা যায় না। নিত্যকে ছেড়ে লীলা, লীলাকে ছেড়ে নিত্য, ভাবা যায় না।[১]

আদ্যাশক্তি লীলাময়ী, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করছেন। তাঁরই নাম কালী। কালীই ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী! একই বস্তু, যখন তিনি নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় কোন কাজ করছেন না, এই কথা যখন ভাবি, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন তিনি এই সব কার্য্য করেন, তখন তাঁকে কালী বলি, শক্তি বলি, একই ব্যক্তি, নাম রূপ ভেদ।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত: ১ম ভাগ—চতুর্থ পরিচ্ছেদ, পাদটীকা শ্রীম

যেমন জল water পানি। এক পুকুরে তিন চার ঘাট, এক ঘাটে হিন্দুরা জল খায় তারা বলে জল। এক ঘাটে মুসলমানেরা জল খায় তারা বলে পানি। আর এক ঘাটে ইংরাজেরা জল খায় তারা বলে water। তিনিই এক, কেবল নামে তফাৎ! তাঁকে কেউ বলছে আল্লা, কেউ God, কেউ বলছে ব্রহ্ম, কেউ কালী, কেউ বলছে রাম, হরি, যীশু, দুর্গা।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত: ১ম ভাগ—২য় খণ্ড, শ্রীম কথিত চতুর্থ পরিচ্ছেদ

১। নিত্য—The Absolute. লীলা—The Relative phenomenal world.

ভগবান পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কথামৃতে শক্তি-তত্ত্বের যে স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেই স্বরূপই তন্ত্রাচার্য্যগণ তাঁদের গ্রন্থরাজিতে নানা যুক্তির সাহায্যে প্রতিপাদিত করতে ব্রতী হয়েছেন।

শক্তি শক্তিমান

পরমশিবের বিভুতা, নিত্যত্ব, বিশ্বাকৃতিত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মাবলীর উল্লেখ করে তন্ত্রাচার্য্য অভিনব গুপ্ত তাঁর তন্ত্রালোকের প্রথমাহ্নিকে মন্তব্য করেছেন :

'এক এবাস্য ধর্ম্মোঽসৌ সর্ব্বাক্ষেপেণ বর্ত্ততে ॥ ৬৭ ॥
তেন স্বাতন্ত্র্যশক্ত্যৈব যুক্ত ইত্যাঞ্জসো বিধিঃ ॥'

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—৬৭ কারিকা

পরমশিবের স্বভাবভূত ধর্ম্ম মাত্র একটি, সেটি হ'ল অহংপ্রত্যবমর্শ। এই ধর্ম্মটি থেকেই বিভুত্বাদি ধর্ম্মসমূহের আক্ষেপ সম্ভব হয়। তাহ'লে আসল কথা হ'ল এই যে, পরমশিবের অহংপ্রত্যবমর্শ নামক স্বাতন্ত্র্যশক্তি মাত্র আছে।

এ প্রসঙ্গে জয়রথের টীকা প্রণিধানযোগ্য :

'অত্রায়মর্থঃ—অয়ং হি নাম প্রকাশস্য অহংপ্রত্যবমর্শ উচ্যতে যদয়ং স্বস্য পরস্য বা প্রকাশনে পরং নাপেক্ষতে ইতি। অত এবাস্য স্বাতন্ত্র্যরূপং তত্তদ্দেশকালাদ্যবভাসসহস্রোল্লাসনসামর্থ্যং স্যাৎ, যেনাস্য স্বসমুল্লাসিতোঽপি সঙ্কুচিতঃ প্রমাতৃবর্গঃ স্বাপেক্ষয়া ব্যাপকত্বনিত্যত্বাদি ব্যবহরেৎ বস্তুতঃ পুনরূপাহং-প্রত্যবমর্শাখ্যা স্বাতন্ত্র্যশক্তিরেবাস্যাস্তি।'

প্রকাশাত্মক পরমশিবের অহংপ্রত্যবমর্শ বলতে বুঝা যায় যে, এই শৈবী প্রকাশ নিজেকে বা পরকে প্রকাশিত করতে পরের অপেক্ষা রাখে না। সুতরাং পরমশিবের স্বাতন্ত্র্য হ'ল প্রসিদ্ধ দেশ, কাল ইত্যাদির নানাপ্রকার অবভাসসমূহকে ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা। এই স্বাতন্ত্র্যের ক্রিয়াকারিতাতেই প্রমাতাগণ পরমশিবের দ্বারা বিকাশিত হ'লেও নিজেদিগে সীমিত মনে করে ও পরমশিবকে নিজের চেয়ে ব্যাপক নিত্য ইত্যাদি বিবেচনা করে। প্রকৃতপক্ষে পরমশিবের অহংপ্রত্যবমর্শ নামক স্বাতন্ত্র্যশক্তিটিই আছে।

এই স্বাতন্ত্র্যশক্তিই প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ উপাধি আশ্রয়ের মাধ্যমে ইচ্ছাশক্তি,

জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদি বিবিধ নামে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং এক স্বাতন্ত্র্যশক্তিযোগের দ্বারাই পরমশিবের অনন্তশক্তিযোগ সম্ভব হয়।[১]

'যা সা শক্তির্জগদ্ধাতুঃ কথিতা সমবায়িনী।
ইচ্ছাত্বং তস্য সা দেবি সিসৃক্ষোঃ প্রতিপদ্যতে ॥
একাপি সত্যোনেকত্বং যথা গচ্ছতি তচ্ছৃণু।
... ...
এবমেষা দ্বিরূপাপি পুনর্ভেদৈরনন্ততাম্।
অর্থোপাধিবশাৎ যাতি চিন্তামণিরিবেশ্বরী।'

জগৎধারক পরমশিবের যে শক্তি সমবায়িনী নামে অভিহিত, জগৎ-সৃষ্টির কালে সেই শক্তিই ইচ্ছাশক্তির রূপ ধারণ করে। এই শক্তি এক হয়েও কিভাবে অনেক প্রকার রূপ পরিগ্রহ করে থাকে, তা অবধান কর।......

এইরূপে এই ঈশ্বরী দ্বিরূপা শিবশক্তিরূপা হ'লেও, প্রয়োজনীয় উপাধির মাধ্যমে চিন্তামণির মতো কল্পিতভেদ আশ্রয় করে অনন্ত রূপ ধারণ করেন।

এই স্বাতন্ত্র্যশক্তি যে পরমশিবের স্বরূপের অতিরিক্ত কোন সত্তা নয়, তা আচার্য্য অভিনব গুপ্ত নিম্নরূপে ব্যক্ত করেছেন :

'শক্তিশ্চ নাম ভাবস্য স্বং রূপং মাতৃকল্পিতম্।
তেনাদ্বয়ঃ স এবাপি শক্তিমৎপরিকল্পনে ॥' ৬৯

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—৬৯ কারিকা

শক্তি পদার্থের প্রমাতা-কল্পিত স্বরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। সেইজন্য শক্তি ও শক্তিমানের পরিকল্পনায় একটি দ্বৈতরহিত পদার্থমাত্রই বোধগম্য হয়। ফলভেদবশতঃ ভেদ আরোপ করে যে-কোন অস্তিত্বযুক্ত পদার্থের স্বরূপকেই শক্তি বলা হয়ে থাকে।[২] এইজন্যই বলা হয়েছে :

১। বহুশক্তিত্বমপ্যস্য তচ্ছক্ত্যৈবাবিযুক্ততা ॥ ৬৮ —তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—৬৮ কারিকা

২। যতো ভাবস্য যস্য কস্যচন সতঃ পদার্থস্য স্বমেব রূপং ফলভেদাৎ ভেদারোপেণ শক্তিঃ ইতি প্রমাতৃভিঃ পরিকল্প্যতে, ন ত্বসৌ বস্তুতঃ পদার্থান্তরং কিঞ্চিৎ, অতঃ শক্তিশক্তিমৎপরিকল্পনেঽপি ক্রিয়মাণে, স এব অদ্বয়ময়ো বিভুঃ ন কাচিদদ্বয়খণ্ডনা।

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—৬৯ কারিকার জয়রথ টীকা

'ফলভেদারোপিতভেদঃ পদার্থাত্মা শক্তিঃ'

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—৬৯ কারিকা, জয়রথ-উদ্ধৃ

ফলভেদবশতঃ ভেদ আরোপ করে পদার্থের স্বরূপকেই শক্তি বলা হয়।

যেরূপ শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে কোন ভেদ নাই, সেরূপ শক্তিদের মধ্যে পারস্পরিক কোন ভেদ নাই।

'মাতৃকল্পেত্বে হি দেবস্য তত্র তত্র বপুষ্যলম্।
কো ভেদো বস্তুতো বহ্নের্দগ্ধৃপক্তৃত্বয়োরিব ॥' ৭০ ॥

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নি

অগ্নির দাহিকা-শক্তির ফল দাহ ও পাচিকা-শক্তির ফল পাক। এখা দাহ ও পাক—এই দুটি ফলগত ভেদকে আশ্রয় করে অগ্নির দাহিকা পাচিকা এই দুই শক্তির মধ্যে ভেদ কল্পনা করা হয়। কিন্তু যেহেতু অগ্নি বাদ দিয়ে তার দাহিকা ও পাচিকা এই দুই শক্তির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না, সেহেতু দাহিকা ও পাচিকা এই দুই শক্তির মধ্যেও কো পারমার্থিক ভেদ থাকতে পারে না। এই দৃষ্টান্ত অনুযায়ী বলা যেতে পা যে, পরমেশ্বরের কল্পিত অনন্ত শক্তিগুলির মধ্যেও পারস্পরিক কোন প্রকৃ ভেদ নাই বা এই শক্তি-বৈচিত্র্যের জন্য পরমেশ্বরের অদ্বৈতসত্তারও কো দ্বৈতাপত্তি হয় না।[১]

'সাকারাপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা। ৩৪।
অতস্তে কথিতং ভদ্রে ব্রহ্মমন্ত্রেণ দীক্ষিতঃ।
যৎ ফলং সমবাপ্নোতি তৎ ফলং তব সাধনাৎ ॥' ৩৫ ॥

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র : চতুর্থোল্লাস, ৩৪—৩৫ শ্লোক

১। 'যথা বহ্নিঃ দাহপাকাদিফলভেদাদ্ দাহিকা পাচিকা চ শক্তির্ভেদেন কল্পিতাপি বস্তুতঃ শক্তিমদেকস্বভাবত্বায় পরস্পরস্য স্বরূপং ভেত্তুমলম্। পৃথক্‌সিদ্ধ হি বস্তু বস্তন্তরং ভিনত্তি নহি শক্তেঃ শক্তিমদতিরেকেণ পৃথক্‌সিদ্ধিরেবাস্তি ইতি কিং কেন ভেদ্যং বহ্নেরেব চি দাহাদিসমর্থং স্বরূপং তথা পরিকল্পিতম্। এবং পরমেশ্বরস্য পরিকল্পিতেঽপি শক্তীনামানন্ত্যে ন কশ্চিদ্‌ভেদঃ ইতি ন কদাচিদদ্বয়বাদক্ষতিঃ ॥ ৭০

—তন্ত্রালোক : প্রথমআহ্নিক ৭০ কারিকায় জয়রথ টীকা

একই স্বাতন্ত্র্যশক্তি কল্পিত ভেদ আশ্রয় করে ইচ্ছাদি অবান্তর শক্তির আকারে অবভাসিত হয়।

'স্বশক্ত্যুদ্রেকজনকং তাদাত্ম্যাদ্বস্তুনো হি যৎ।
শক্তিস্তদপি দেব্যেবং ভান্ত্যপ্যন্যস্বরূপিণী॥' ৭২ ॥

—তন্ত্রালোক : প্রথমাহ্নিক—৭২ শ্লোক

বহ্নিতে সামর্থ্যলক্ষণা শক্তি নিহিত আছে। এই শক্তিকেই দাহ ও পাক ক্রিয়া দাহিকা ও পাচিকা এই দুটি শক্তির আকারে অবভাসিত করছে। যেহেতু দাহ ও পাক ক্রিয়া দহনপচনক্ষম বহ্নির দ্বারাই নিষ্পন্ন হওয়া সম্ভব, সেহেতু দাহিকা ও পাচিকা এই দুটি শক্তি বহ্নির কোন নতুন শক্তি নয়, বহ্নির সামর্থ্যলক্ষণা শক্তিরই দুটি নামান্তর মাত্র। এইরূপে পরমেশ্বরের সঙ্গে অভিন্না স্বাতন্ত্র্যশক্তি ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদি অবান্তর শক্তিসমূহের আকারে অবভাস লাভ করলেও আসলে এক ও অবিকৃতই থাকে।[১]

সাধক কবি রামপ্রসাদ শিবশক্তিতত্ত্বের অদ্বৈতভাবের অনুভূতিতেই মূলতঃ উদ্বুদ্ধ হয়ে শক্তিতত্ত্ব-প্রকাশকে লক্ষ্য করে পদ রচনা করেছেন :

'কে জানে গো কালী কেমন
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন ॥
কালী পদ্মবনে হংসসনে, হংসীরূপে করে রমণ ॥
তাঁকে সহস্রারে মূলাধারে, সদা যোগী করে মনন।
আত্মারামের আত্মা কালী, প্রমাণ প্রণবের মতন।
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন।
মায়ের উদরে ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ড, প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
মহাকাল জেনেছেন কালীর মর্ম্ম, অন্য কেবা জানে তেমন ॥

১। 'সমর্থো হি বহ্নিঃ সর্ব্বং দাহাদিকার্য্যজাতং কুর্য্যাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ। এবং পরমেশ্বরস্যাপি ইচ্ছাদ্যবান্তরশক্তিরূপতয়াবভাসমানাপি শক্তির্দেবী তত্তদ্ভেদোল্লাসেঽপি পরপ্রকাশাভিন্নস্বভাবত্বাৎ একাত্মানাবভাসা স্বাতন্ত্র্যাখ্যৈব ইতি যুক্তমুক্তম্ এক এবাস্য ধর্ম্মোঽসৌ সর্ব্বাক্ষেপেণ বর্ত্ততে ইতি। এবমেকৈবাস্য স্বাতন্ত্র্যাখ্যা শক্তিস্তথা তথা স্ফুটেন ভেদেন ভায়াৎ ইতি সিদ্ধম্॥' ৭২
—তন্ত্রালোক প্রথমো আহ্নিকঃ ৭২ শ্লোক, জয়রথ টীকা।

প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু তরণ।
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন ॥[১]

—রামপ্রসাদ : ক. বি শা. প ব্রহ্মময়ী মা

কালী অর্থাৎ শিবের কালকর্ষিণী শক্তির স্বরূপ দুরধিগম্য। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্যযোগ, মীমাংসা বেদান্তের যুক্তিসমূহের গহন অরণ্য অতিক্রম করে গেলেও, এই অবাঙ্‌মনসগোচর তত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয় না। পদ্মবনে হংসী যেমন হংসের সঙ্গে সুখে রমণ করে, কালীও তেমনি পরমচমৎকারময় শিব-তাদাত্ম্যে শিবসামরস্যে মগ্ন।

এক অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ভৈরবীয় সত্তাই বিশ্বোত্তীর্ণরূপে শিব ও বিশ্বময়রূপে শক্তি।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের দেবী সূক্তে শক্তিবাদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। দেবী সূক্তের ঋষি অম্ভৃণ মহর্ষির কন্যা ব্রহ্মবিদুষী বাক, দেবতা পরমাত্মা।

শক্তিবাদের সূচনা

সূক্তটিতে আটটি ঋক্। তার মধ্যে শুধু দ্বিতীয়টি জগতী-ছন্দে রচিত, বাকীগুলি সমস্তই ত্রিষ্টুপ ছন্দের। সূক্ত-দ্রষ্ট্রী ব্রহ্মা বাক এর যে আত্মস্তুতি সূক্তটিতে পাওয়া যায়, সে সম্বন্ধে সায়ণাচার্য তাঁর ভাষ্যে এইরূপ মন্তব্য করেছেন :

'সচ্চিৎসুখাত্মকঃ সর্ব্বগতঃ পরমাত্মা দেবতা। তেন হ্যেষা তাদাত্ম্যমনুভবন্তী সর্ব্বজগদ্রূপেণ সর্ব্বস্যাধিষ্ঠানত্বেন চাহমেব সর্ব্বং ভবামীতি।'

—দেবীসূক্তের সায়ণভাষ্য

সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা দেবতা। তাঁর সঙ্গে অম্ভৃণকন্যা বাক নিজের তাদাত্ম্য অনুভব করে আমি সর্ব্বজগৎস্বরূপ ও সমস্ত জগতের আশ্রয়, অতএব আমিই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চে অনুস্যূত—এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বাক নিজের স্তুতি করছেন।

সায়ণাচার্য্য-প্রযুক্ত 'সর্ব্বজগদ্রূপেণ' ও 'সর্ব্বস্যাধিষ্ঠানত্বেন' এই দুটি পদ বিশেষ তাৎপর্য্যপূর্ণ। প্রথম পদটির দ্বারা অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ সত্তার বিশ্বময় রূপ ও দ্বিতীয় পদটির মাধ্যমে সেই একই সত্তার বিশ্বোত্তীর্ণ রূপ ব্যঞ্জিত হয়েছে।

১। 'আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে না'—এই প্রকার পাঠও পাওয়া যায়।

দেবীসূক্তে অম্ভৃণকন্যা বাক বলছেন, আমি ব্রহ্মময়ীরূপে রুদ্র, বসু, আদিত্য ও বিশ্বদেবদের সঙ্গে সঞ্চরণ করি। আমি মিত্র, বরুণ, অগ্নি, ইন্দ্র ও অশ্বিনদ্বয়কে ধারণ করি।[১]

'ধারণ করি' এই ক্রিয়াপদের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য্য তাঁর ভাষ্যে এইরূপ মন্তব্য করছেন :

'ময়ি হিঃ সর্ব্বং জগৎ শুক্তৌ রজতমিবাধ্যস্তং সৎ দৃশ্যতে। মায়া চ জগদাকারেণ বিবর্ত্ততে।[২] তাদৃশ্যা মায়ায়ঃ আধারত্বেনাসঙ্গস্যাপি ব্রহ্মণ উক্তস্য সর্ব্বস্যোৎপত্তিঃ।

শুক্তিতে যেমন রজত অধ্যস্ত হয়ে পরিলক্ষিত হয়, আমাতে তেমনি জগৎ অধ্যস্ত অবস্থায় পরিদৃশ্যমান হয়ে বিরাজিত রয়েছে। ব্রহ্মের মায়াশক্তি জগতের আকারে বিবর্ত্ত লাভ করেছে। ব্রহ্ম যেহেতু সেই মায়াশক্তির আধার, সেই হেতু ব্রহ্ম অসঙ্গ হলেও ব্রহ্ম থেকে জগৎপ্রপঞ্চের উদ্ভব হয়েছে একথা বলা হয়।

ব্রহ্মবিদুষী বাক-এর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কথাগুলি হলো :

'অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্॥
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥' [৩]

—দেবীসূক্ত। ৩ ঋক্

আমি সর্ব্ব জগতের ঈশ্বরী, উপাসকদের ধনের প্রাপয়িত্রী। আমি পরব্রহ্মকে আমার আত্মা বলে অনুভব করেছি। আমি যজ্ঞার্হদের মুখ্য। আমি বিচিত্র জগৎপ্রপঞ্চ-রূপে অবস্থান করি। আমার স্বরূপ সমস্ত জীবাদির ধারক। এইজন্যই দেবগণ আমাকে বহু স্থানে স্থাপন করেছেন, অর্থাৎ আমাকে বিশ্বরূপিণী বলে জানেন।[৩]

১। অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ॥
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১ —দেবীসূক্ত ১ ঋক

২। সতত্ত্বতোঽন্যথাবৃত্তিঃ বিকারঃ অতত্ত্বতোঽন্যথাবত্তিঃ বিবর্ত্তঃ।

৩। 'যা এবং গুণবিশিষ্টাহং তাং মাং ভূরিস্থাত্রাম্ বহুভাবেন প্রপঞ্চাত্মনাঽবতিষ্ঠমানাম। ভূরি ভূরীণি বহূনি ভূতজাতানি আবেশয়ন্তীম্। জীবভাবেনাত্মানং প্রবেশয়ন্তীমীদৃশীং মা পুরুত্রা বহুষু দেশেষু ব্যবধুঃ দেবা বিদধতি কুর্ব্বন্তি। উক্তপ্রকারেণ বৈশ্বরূপোণাবস্থানাৎ। যদ্‌যৎ কুর্ব্বন্তি তৎ সর্ব্বং মামেব কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ। —দেবীসূক্তের তৃতীয় ঋকের সায়ন ভাষ্য।

'ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্ ॥
অমন্তবো মাং ত উপ ক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি ॥' ৪

যে অন্ন আহার করে সে আমার দ্বারাই অন্ন আহার করে। কারণ আমিই ভোক্তৃশক্তি। এইরূপ দর্শন, প্রাণন বা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের বর্জ্জন, গ্রহণ ও শ্রবণ —এই ক্রিয়াগুলিও আমার দ্বারাই সংসাধিত হয়। কারণ আমিই সেই সেই ক্রিয়ার শক্তিরূপিণী। যারা আমার এই বিশ্বময় রূপ জানে না, তারা সংসারী হয়ে হীনদশা লাভ করে। হে অধ্যাত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু বন্ধু, শোনো, তোমাকে আমি শ্রদ্ধাযত্নে লভ্য সেই ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করছি।[১]

দেবীসূক্তে শুধু মহাশক্তির আলেখ্যই চিত্রিত হয় নাই, শক্তিহীন শিবের কর্ম্মাক্ষম পঙ্গু রূপটিও ফুটে উঠেছে। প্রমাণ হিসাবে আমরা ষষ্ঠ ঋকটির উল্লেখ করতে পারি।

'অহং রুদ্রায় ধনুরা তনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ ॥
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবাপৃথিবী আ বিবেশ ॥' ৬

ব্রাহ্মণগণের দ্বেষক হিংসক ত্রিপুরনিবাসী অসুরকে হত্যা করার জন্য আমি ত্রিপুরবিজয় সময়ে রুদ্র বা মহাদেবের ধনুকে জ্যাতত অর্থাৎ ছিলার দ্বারা বক্র করি। তাৎপর্য্য হ'ল—শক্তিকে বাদ দিয়ে শিবের ধনুতে শর সন্ধান করার ক্ষমতা নাই। স্তোতৃজনের কল্যাণে তার শত্রুর সঙ্গে আমিই সংগ্রাম করে থাকি। অন্তর্যামী বলে আমি আকাশ ও পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করি।[২]

শাক্ত কবির মাতৃরূপ-পরিকল্পনার বীজও দেবীসূক্তে অন্তর্নিহিত রয়েছে :

'অহং সুবে পিতরমস্য মূর্বন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে ॥
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি ॥' ৭

১। 'যোঽন্নমত্তি স ভোক্তৃশক্তিরূপয়া ময়ৈবান্নমত্তি। যশ্চ বিপশ্যতি আলোকয়তীত্যর্থঃ। যশ্চ প্রাণিতি শ্বাসোচ্ছ্বাসাদিব্যাপারং করোতি সোঽপি ময়ৈব ॥'
—দেবীসূক্তের চতুর্থ ঋকের সায়ণভাষ্য

২। পুরা ত্রিপুরবিজয়সময়ে রুদ্রায় রুদ্রস্য। ষষ্ঠ্যর্থে চতুর্থী। মহাদেবস্য ধনুঃ চাপম্ অহম্ আ তনোমি জ্যয়া আততং করোমি। কিমর্থম্? ব্রহ্মদ্বিষে ব্রাহ্মণানাং দ্বেষ্টারং শরবে শরুং হিংসকং ত্রিপুরনিবাসিনমসুরং হন্তবৈ—হন্তুং হিংসিতুম্।······স্তোতৃজনার্থং শত্রুভিঃ সহ সংগ্রামমহমেব কৃণোমি—করোমি। তথা দ্যাবাপৃথিবীং দিবঞ্চ পৃথিবীঞ্চ অন্তর্যামিতয়া অহমেব আবিবেশ প্রবিষ্টবতী। —দেবীসূক্তের ষষ্ঠ ঋকের সায়ণভাষ্য।

শ্রুতিতে আছে 'দ্যৌঃ পিতা'। অতএব পিতা শব্দের অর্থ আকাশ। আমি পরমাত্মার মাথার উপরে আকাশকে প্রসব করি। ভাষ্যে সায়ণাচার্য্য এরূপ মন্তব্য করেছেন ঃ 'কারণভূতে তস্মিন্ পরমাত্মনি হি বিয়দাদিকর্য্যাজাতম্ সর্ব্বং বর্ত্ততে তন্তুষু পট ইব'—যেমন সুতায় কাপড় আছে তেমনি আকাশাদি কার্য্য কারণরূপ পরমাত্মায় বিদ্যমান। ঋক্-প্রযুক্ত 'সুবে' এই কথাটির মধ্যেই পরবর্ত্তীকালের শক্তিমাতৃকা পরিকল্পনার বীজ নিহিত। ব্রহ্মাভিন্ন এই ব্রহ্মময়ী শক্তির অধিষ্ঠান উৎস যা কিছু সবই ব্রহ্ম। 'সমুদ্রে' 'সমুদ্রবন্তি অস্মাৎ ভূতজাতানি ইতি সমুদ্রঃ পরমাত্মা অর্থাৎ পরমাত্মায়, জলে, ব্যাপনশীল ধীবৃত্তিতে আমার উৎস। যা ব্রহ্মচৈতন্য তাই আমার কারণ, যেহেতু আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী 'যৎ ব্রহ্মচৈতন্যং তন্মম কারণমিত্যর্থঃ। যত ঈদৃগ্ ভূতাহমস্মি'—সায়ণভাষ্য। এই ব্রহ্মশক্তি সমস্ত ভূতজাতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে তদ্‌গত অসংখ্য বৈচিত্র্যকে ব্যাপ্ত করে বিরাজিত। তাছাড়া, এই ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি বিপ্রকৃষ্টদেশে অবস্থিত সমস্ত বিকারজাতকে তার কারণভূত মায়াত্মক শরীরের দ্বারা স্পর্শ করে।[১]

রাত্রি সূক্ত

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে দশম অনুবাকে ১২৭ সূক্তটি রাত্রি সূক্ত। এই সূক্তটির ঋষি কুশিক, দেবতা রাত্রি, ছন্দ গায়ত্রী, বিনিয়োগ হ'ল বিশ্বজননীর প্রীতির জন্য অনুষ্ঠীয়মান চণ্ডীপাঠের প্রারম্ভে ক্রিয়মান জপে। চণ্ডীপাঠের পুর্বে এই রাত্রি সূক্ত পাঠ করলে জগন্মাতা প্রীতা হন।[২]

রাত্রির সংজ্ঞানির্ণয়ে ভক্তপ্রবর স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর অনূদিত ও সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থের রাত্রিসূক্তের প্রথম ঋকের পাদটীকায় এরূপ মন্তব্য করছেন ঃ

১। 'ততো হেতোর্বিশ্বা বিশ্বানি সর্ব্বাণি ভুবনানি ভূতজাতানি অনুপ্রবিশ্য বিতিষ্ঠে বিবিধং ব্যাপ্য তিষ্ঠামি। উত—অপি চ অমূং দ্যাম্ বিপ্রকৃষ্টদেশে অবস্থিতং স্বর্গলোকম্ উপলক্ষণমেতৎ। এতদুপলক্ষিতং কৃৎস্নং বিকারজাতং বর্ষ্মণা কারণভূতেন মায়াত্মকেন মদীয়েন দেহেন উপস্পৃশামি।

—দেবীসূক্তের সপ্তম ঋকের সায়নভাষ্য

২। রাত্রিসূক্তস্য কুশিক ঋষি রাত্রির্দেবতা, গায়ত্রী ছন্দঃ, শ্রীজগদম্বাপ্রীত্যর্থে সপ্তশতীপাঠাদৌ জপে বিনিয়োগঃ—রাত্রিসূক্ত স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী।

'রাতি দদাতি—দান করেন অভীষ্টম্ ইতি রাত্রিঃ'। রাত্রি দ্বিবিধ, জীবরাত্রি ও ঈশ্বররাত্রি। জীবরাত্রিরূপ সুষুপ্তিতে প্রতিদিন জীবগণের ব্যবহার লুপ্ত হয় ও ঈশ্বররাত্রিরূপ প্রলয়কালে ঈশ্বরব্যবহার লুপ্ত হয়। দেবীপুরাণে আছে—

"ব্রহ্মমায়াত্মিকা রাত্রিঃ পরমেশলয়াত্মিকা।
তদধিষ্ঠাতৃদেবী তু ভুবনেশী প্রকীর্ত্তিতা॥"

অর্থাৎ রাত্রি ঈশ্বরলয়রূপা ও ব্রহ্মমায়াত্মিকা। তাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবীই ভুবনেশ্বরী আদ্যাশক্তি রূপে প্রসিদ্ধা।

ঈশ্বররাত্রিরূপ প্রলয়কালে ঈশ্বরব্যবহারের লোপের কথা ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও বলেছেন ঃ

'যখন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তখন মা সৃষ্টির বীজ সকল কুড়িয়ে রাখেন। গিন্নীর কাছে যেমন একটি ন্যাতাক্যাতার হাঁড়ি থাকে, আর সেই হাঁড়িতে গিন্নী পাঁচরকম জিনিস তুলে রাখে।'

'হ্যাগো! গিন্নীদের ঐ রকম একটা হাঁড়ি থাকে। ভিতরে সমুদ্রের ফেনা, নীল বড়ি, ছোট ছোট পুঁটলি-বাঁধা শশাবীচি, কুমড়াবীচি, লাউবীচি এই সব রাখে, দরকার হলে বার করে। মা ব্রহ্মময়ী সৃষ্টিনাশের পর ঐ রকম সব বীজ কুড়িয়ে রাখেন। সৃষ্টির পর আদ্যাশক্তি জগতের ভিতরেই থাকেন। জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে উর্ণনাভির কথা, মাকড়সা আর তার জাল। মাকড়সা ভিতর থেকে জাল বার করে. আবার নিজে সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর জগতের আধার আধেয় দুই।'

—রামকৃষ্ণকথামৃত :—১ম ভাগ চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

এই রাত্রিসূক্তের প্রথম ঋকেই আছে ঃ

'ওঁ রাত্রী ব্যখ্যদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ বিশ্বা অধি শ্রিয়োঽধিত॥'১

—রাত্রিসূক্ত ঃ প্রথম ঋক

ওঁকারময়ী ভুবনেশ্বরী রাত্রিদেবী সৰ্ব্বদেশে তাঁর চক্ষুস্থানীয় মহাদাদিতত্ত্ব দ্বারা সর্ব্ববস্তুর প্রকাশিকা হয়ে জগৎ-প্রপঞ্চ বিশেষরূপে দেখলেন। অনন্তর সকল জীবের স্ব স্ব কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান করলেন।[১]

১। সৰ্ব্বকারণভূতা মহামায়া পূর্ব্বকল্পীয় সকল প্রাণীর সদসদ্ কর্ম্মসমূহের ফলপ্রদানের সময় আগত না হওয়ায় তাঁহাদিগকে জীব ও জগৎপ্রপঞ্চকে ফলপ্রদানের সময় পর্য্যন্ত স্বীয় কারণশরীরে

এই ভুবনেশ্বরী রাত্রিদেবী সম্বন্ধে রাত্রিসূক্তে আরো কথিত আছে যে, তিনি বিশ্বপ্রপঞ্চের অন্তর্গত বৃক্ষলতাগুল্মাদি পর্যন্ত স্বীয় আত্মচৈতন্যে পরিব্যাপ্ত করলেন।[১]

রাত্রিসূক্তে শুধু ঈশ্বররাত্রির নয় জীবরাত্রিরও স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে ; যেমন :

'নি গ্রামাসো অবিক্ষত নিপদ্বন্তো নিপক্ষিণঃ। নি শ্যেনাসশ্চিদর্থিনঃ' ॥ ৫

— রাত্রিসূক্ত : পঞ্চম ঋক

ভুবনেশ্বরী রাত্রিদেবীর কৃপায় সমস্ত গ্রামবাসিগণ, গবাশ্বাদি পশু, শ্যেনাদি পক্ষি ও কামার্থিগণও সুখে শয়ন করে।[৩]

চণ্ডীমঙ্গলের পশুবৃত্তান্ত

আদ্যাশক্তির বৃক্ষলতাগুল্মাদি[৩] ও পশুসমাজের উপর আপন প্রভাব-বিস্তারের বৈদিক কাহিনী পরবর্তী যুগের লৌকিক চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে বোধ হয় নবকলেবর লাভ করেছিল। তাই আমরা দেখি যে; চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডী মূলতঃ আরণ্যদেবী, অনার্য্য হিংসক রাঢ়সম্প্রদায় তাঁর পূজক। অরণ্যে মৃগয়ারত কালকেতু ব্যাধ তাঁর কৃপালাভে ধন্য হয়েছিল। তাছাড়া, পশুসমাজের উপরও চণ্ডীর প্রভাব কম নয়। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে এইরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়।

কলিঙ্গদেশে কলিঙ্গরাজের পূজা নিয়ে মহাদেবী চণ্ডী যখন কৈলাসে প্রত্যাবর্ত্তন করছিলেন, তখন পথিমধ্যে বিজুবনে পশুদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মুকুন্দরামের লেখনীতে জগন্মাতার পশুসমাজকে অনুগ্রহ বিতরণ করার বৃত্তান্ত নিপুণ রসমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে :

প্রলীন করিলেন। পরে ফলপ্রদানের কাল উপস্থিত হইলে মহদাদি দ্বারা জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টি করিয়া প্রাণিগণের কর্ম্মফলপ্রদানে প্রবৃত্তা হইলেন।

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনুদিত ও সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী রাত্রিসূক্ত প্রথম ঋক।

১। 'ওর্বপ্রা অমর্ত্ত্যা নিবতো দেব্যুদ্বতঃ। জ্যোতিষা বাধতে তমঃ ॥২॥ —ঐ দ্বিতীয় ঋক।

২। 'মূঢ় বালকগণ যেমন জননীর অসীম করুণায় নিশ্চিন্ত হইয়া নির্বিঘ্নে শয়ন করে, সেইরূপ প্রাণিগণ করুণাময়ী রাত্রিদেবীকে না জানিয়াও তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় আশ্বস্থ হয়।'

—ঐ পঞ্চম ঋক

৩। রাত্রিসূক্ত থেকে আদ্যাশক্তির কৃষিঘনিষ্ঠতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। মার্কণ্ডেয়চণ্ডীর শাকম্ভরী ভ্রামরী ইত্যাদি বিশেষণ কৃষির ইঙ্গিত দেয়। দুর্গাপূজার নবপত্রিকার উপাদানও কৃষিশস্য 'কদলী দাড়িমী ধান্যঃ হরিদ্রা মানকং কচুঃ। বিল্বাশোকজয়ন্ত্যশ্চ ইত্যেতে নবপত্রিকাঃ ॥'

'শঙ্কর সদনে চণ্ডী যান নিজবেশে।
অংশরূপে পূজা নিয়া কলিঙ্গের দেশে॥
বিজুবন নিকটে ছিল যত পশুগণ।
পথে যাইতে চণ্ডীর পাইল দরশন॥
কেশরী শার্দ্দুল গণ্ডার তুরঙ্গ বারণ।
শরভ করভ গজ মহিষ দুর্জ্জন॥
একে একে পশুর কতেক নিব নাম।
অভয়ার পদে আসি করিল প্রণাম॥
ঊর্দ্ধমুখে পশুগণ করয়ে গোহারি।
কৃপা করি মোর পূজা নেহ মহেশ্বরী॥
অপরাধ বিনে পশু সদাই সশঙ্ক।
বর দিয়া ভগবতী কর নিরাতঙ্ক॥
শুনিয়া পশুর বাণী দেবী ভগবতী।
পূজা করিবারে সবে দিলা অনুমতি॥
আজ্ঞা পাইয়া পশুগণ আনন্দে আকুল।
বনে বনে খুঁজিয়া আনিলা নানা ফুল॥'

পশুগণের দেবীপূজাও মনুষ্যসমাজের দেবীপূজারই অনুরূপ। তাই আমরা দেখি

'আম জাম শেয়াকুল বকুলের ফল।
নৈবেদ্য দিলেন পাদ্য কংসনদীর জল॥
প্রদক্ষিণ নমস্কার করে বারে বারে।
নিরাতঙ্ক আশীর্ব্বাদ দিলা সবাকারে॥
বাঘে না খাইবে মৃগে, কেশরী বারণে।
তুরঙ্গ মহিষ দোঁহে থাক এক বনে॥
অবিরোধে দোঁহে থাক শশারু খটাশ।
স্মরণ করিলে দুঃখ করিব বিনাশ॥'

পরিশেষে পশুগণের প্রতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের উপদেশদানের মাধ্যমে

দেবীর চরিত্র মানবিকতার স্পর্শসঞ্চারে চরম সজীবতা ও পরম রমণীয়তা লাভ করেছে :

'যেজন যাহার শত্রু থাক মিত্রভাবে।
থাকিবে আনন্দে সবে কেহো না হিংসিবে॥'

—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত কবিকঙ্কণ চণ্ডী : প্রথম ভাগ পশুদিগের প্রতি দেবীর বরদান শীর্ষক অংশ

কালকেতু ব্যাধের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজয়ের পর দেবীকে স্মরণ করে পশুগণের ক্রন্দন-বৃত্তান্তেও আমরা পশুসমাজের উপর দেবীর অমোঘ প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত হয়ে থাকি। মুকুন্দরামের লেখনীতে পশুগণের ক্রন্দন-বৃত্তান্তে তৎকালীন সমাজের পটভূমিকায় পশুসমাজের চিত্র পরম রমণীয়তা লাভ করেছে :

'কাঁদে সিংহ আদি পশু সোঙরি অভয়া।
অপরাধ বিনে কেনে দূর কৈলে দয়া॥
ভালে টীকা দিয়া মাগো করিলে মৃগরাজ।
করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ॥
প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক।
উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক॥
হাতে পদে দড়ি দিয়া বান্ধে দুই তোক।
গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক॥
দয়াসিন্ধু পার কর অপার সংসার।
তোমার স্মরণে মাতা আপন উদ্ধার॥
উই চারা খাই আমি নামেতে ভালুক।
নেউগী চৌধুরী নই না করি তালুক॥
সাত পুত্র নিলা বীর বান্ধিয়া জাল পাশে।
সবংশে মজিনু মাতা তোমার আশ্বাসে॥
প্রতিদিন মহাভয় বীরের তরাসে।
মাগু মৈল পো মৈল দুটি নাতি শেষে॥
কান্দয়ে ভল্লুক শিরে মারে করাঘাতি।
জরাকালে হইল মোর এতেক দুর্গতি॥

বরাহ বলেন মুথা আমার ভক্ষণ।
কার হিংসা নাহি করি নাহি প্রয়োজন ॥
ধরণী লোটায়ে কান্দে বীর আত্ম বরা।
অরুণ লোচনযুগে বহে জলধারা ॥
শাশুড়ী ননদ মরে দেওর ভাসুর।
পতি গেল রতিসুখ বিধি কৈল দূর ॥
ছিল মাত্র অভাগীর কোলে এক পো।
পাশরিতে নারিগো তাহার মায়া মো ॥
ধূলায়ে ধূসর হইয়া কান্দয়ে হস্তিনী।
সোঙরে ভৈরবী ভীমা ভবানী ভাবিনী ॥
শ্যামল সুন্দর পুত্র কমললোচন।
ভ্রূযুগল কামধনু মদন-গঞ্জন ॥
কানন করিত আলা কপালের ছান্দে।
ভাবিতে ভাবিতে রূপ প্রাণ মোর কান্দে ॥
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর।
লুকাইতে স্থল নাহি অরণ্য ভিতর ॥
কি করিব কোথা যাবো কোথা গেলে তরি
আপনার দন্ত হইল আপনার বৈরী ॥
শুণ্ডে ধরি মহাবীর উপাড়ে দশন।
এত অপমান মাতা সহে কোন জন ॥
হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কটে।
মিরাসে নাহিক কাজ বীর সনে হটে ॥
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম-সেনাপতি।
সাগর বান্ধিয়া কৈল শ্রীরামের হিতি ॥
কি মোর দারুণ বিধি লিখিল কপালে।
সাত পুত্র মহাবীর বান্ধি নিল জালে ॥
বারশিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু ঢোলকান।
ধরণী লোটাইয়া কান্দে করি অভিমান

কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপবংশে।
হরিণ ভুবনে বৈরী আপনার মাংসে ॥
ভূমে গড়াগড়ি কান্দে শশারু শজারু।
দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু ॥
গড়ের ভিতরে থাকি লুকি ভালে জানি।
কি করি উপায় বীর তথি দেয় পানী ॥
চারি পুত্র মৈল মোর মৈল চারি ঝি।
মাগু মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ কি ॥
কান্দয়ে নকুল সুত-দারার হাব্যাসে।
সবংশে মজিনু আমি তোমার আশ্বাসে ॥
পশুগণ সোঙরে সবে চণ্ডীর চরণ।
ধেয়ানে জানিল মাতা পশুর রোদন ॥'

পশুগণের এই দুঃখ-নিবেদনে মহাদেবী বিচলিত হলেন ও তাদের কাছে পদ্মাবতী সখীসহ সমুপস্থিত হলেন।

'পদ্মাবতী সঙ্গে মাতা করেন যুকতি।
পশুগণে রাখিতে উরিলা ভগবতী ॥
পদ্মাবতী বলে মাতা চলহ ত্বরিত।
বিজুবনে যাইয়া পশুর কর হিত ॥
উত্তরিলা ভগবতী পশুর সমাজ।
লজ্জাতে মলিন হইয়া বলেন মৃগরাজ ॥
অন্যের সেবক হইলে সর্ব্বত্রেতে তরি।
তোমার সেবক হয়্যা সবংশেতে মরি' ॥

—ক. বি. কবিকঙ্কণ চণ্ডী কালকেতু খণ্ড—চণ্ডীর নিকটে পশুগণের দুঃখ নিবেদন

পশুগণের স্তুতিতে প্রসন্না মহাদেবী শেষে তাদিগে এই বর দিলেন:

'আজি হইতে মনে কিছু না করিহ ভয়।
না বধিবে মহাবীর কহিনু নিশ্চয় ॥'

—ক. বি. কবিকঙ্কণ চণ্ডী: কালকেতু খণ্ড—পশুগণকে ভগবতীর অভয়দান ও গোধিকারূপধারণ

সামবিধান ব্রাহ্মণের তৃতীয় মণ্ডলের অষ্টম অনুবাকের অন্তর্গত দ্বিতীয় অংশটিও রাত্রিসূক্ত নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ঐ অংশে আছে :

'ওঁ রাত্রিং প্রপদ্যে পুনর্ভূং ময়োভূং কন্যাং শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীমাদিত্যঃ শ্রীচক্ষুষে বায়ুঃ প্রাণায় সোমো গন্ধায় আপঃ স্নেহায় মনঃ অনুজ্ঞায় পৃথিব্যৈ শরীরম্।'

ওঙ্কাররূপিণী অর্থাৎ ব্রহ্মরূপিণী যে মহামায়া অসুরহননের জন্য পুনঃপুনঃ আবির্ভূতা হন, যিনি প্রাণিগণকে সুখ দান করেন, যিনি কন্যারূপিণী, ময়ূর-পুচ্ছভূষণা, বা স্ত্রী-পুরুষ সংজ্ঞার অতীতা ও পাশধারিণী, যিনি বাল্য-বার্দ্ধক্য রহিতা ও যিনি কুমারী প্রভৃতি শক্তিসমূহের সমষ্টিভূতা, সেই রাত্রিরূপা দেবীর শরণাপন্ন হই। তাঁর প্রভাবে সূর্য্য চক্ষুদ্বয়কে শ্রীযুক্ত করে রক্ষা করুন, বায়ুদেবতা পঞ্চপ্রাণ রক্ষা করুন, সোমদেবতা ঘ্রাণেন্দ্রিয় রক্ষা করুন, বরুণদেব তরল পদার্থসকল রক্ষা করুন, চন্দ্রদেব প্রতিভা রক্ষা করুন এবং পৃথিবীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী আমার শরীর রক্ষা করুন।

তান্ত্রিক রাত্রিসূক্ত

মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রথম চরিত্র প্রথম অধ্যায়ে মধুকৈটভ দৈত্যদ্বয় কর্ত্তৃক নিরাকৃত ব্রহ্মা মহাবিষ্ণুর প্রবোধের জন্য যোগনিদ্রার স্তুতি করেছিলেন।

'ওঁ ঐঁ বিশ্বেশ্বরাং জগদ্ধাত্রীং স্থিতিসংহারকারিণীম্। ৭১
নিদ্রাং ভগবতীং বিষ্ণোরতুলাং তেজসঃ প্রভুঃ॥ ৭১

প্রভু অর্থাৎ প্রজাপতি ব্রহ্মা তেজঃস্বরূপ বিষ্ণুর নয়নাশ্রয়কারিণী অতুলা তামসীশক্তি বিশ্বেশ্বরী জগদ্ধাত্রী স্থিতিসংহারকারিণী ভগবতী সেই যোগনিদ্রার স্তব করতে লাগলেন।

বিশ্বেশ্বর্য্যাদিসূক্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক দৃষ্ট। এই সূক্তে মহাদেবীকে স্তুতি করে এইরূপ বলা হয়েছে :

'প্রকৃতিস্ত্বং হি সর্ব্বস্য গুণত্রয়বিভাগিনী।
কালরাত্রির্মহারাত্রির্মোহরাত্রিশ্চ দারুণা॥' ৭৮-৭৯

তুমিই সর্ব্বভূতের প্রকৃতি ও সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের তারতম্য বিধায়িনী। তুমি সত্ত্বগুণের লয়কারিণী বিশুদ্ধসত্ত্বময় বিষ্ণুর যোগনিদ্রারূপিণী কালরাত্রি, যেখানে কাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় না। তুমি মহৎ বা রজোগুণরূপী

ব্রহ্মার রাত্রি অর্থাৎ বিলয়স্থল, তাই তুমি মহারাত্রি। তুমি অনতিক্রমণীয়া মোহ বা তমোগুণের কার্য্য বিষয়ভোগলালসার লয় বিধান করে জীবকে বন্ধনমুক্ত কর, সেজন্য তুমি মোহরাত্রি।[১]

কালরাত্রি, মহারাত্রি ও মোহরাত্রি এই তিনটি শব্দের উল্লেখ থাকায় এই সূক্তটিকে তান্ত্রিক রাত্রিসূক্ত বলা হয়।[২]

প্রাধানিক রহস্যে কথিত আছে যে, কালরাত্রি মহাকালীর নামবিশেষ। মূলা দেবী মহালক্ষ্মী থেকে উদ্ভূতা তামসী মহাকালীকে মহালক্ষ্মীই বললেন, 'দদামি তব নামানি যানি কর্ম্মাণি তানি তে'—তোমার যে যে কর্ম্ম আছে, সেই

১। 'হে মাতঃ! তুমি কালেরও কাল বা রাত্রি স্বরূপা। অর্থাৎ কাল বা মৃত্যুও তোমার সংস্পর্শে আপন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে। এজন্য তুমি মহাকালরূপিণী কালরাত্রি বা মহাকালী। সত্ত্বগুণের বিশুদ্ধ বিকাশ দ্বারা সাধক কালের ভয় হইতে মুক্ত বা কালাতীত হইয়া এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান রূপ কালের বিভাগত্রয় বিস্মৃত হইয়া তোমারই অভয়কোলে চিরাশ্রিত বা লীন হয়। এজন্য তুমি সত্ত্বগুণেরও বিলয়রূপা কালরাত্রি, আবার তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণময় বিষ্ণুরও যোগনিদ্রারূপ কালরাত্রি। হে মাতঃ! রজোগুণরূপী ব্রহ্মাকেও তোমাতে বিলয় কর, এজন্য তুমি মহৎ বা ব্রহ্মারও রাত্রিরূপিণী মহারাত্রি।......মা! তুমিই সংসারলীলায় বন্ধনকারিণী মহামায়ারূপিণী অনতিক্রমণীয়া মোহরাত্রিস্বরূপা......হে করুণাময়ী মা! এইরূপে কালরাত্রিরূপে তুমি ভক্তের মৃত্যুভয় দূর করিয়া অমৃতত্ব প্রদান কর, মহারাত্রিরূপে রজোগুণাত্মক দুঃখময় অসত্যের চাঞ্চল্য দূর করিয়া ভক্তকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত কর, আর মোহরাত্রিরূপে তমোগুণাত্মক পরিচ্ছিন্ন বিষয়ানন্দভোগের মোহ চিরতরে লয় করিয়া তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে আনন্দের প্রদীপ জ্বালিয়া দাও—ভক্তের আত্মস্বরূপ প্রকটিত করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ কর।'

—শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব ও সাধন রহস্য: প্রথম খণ্ড—মধুকৈটভবধ, উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা

২। লক্ষ্মীতন্ত্রে আছে—

'বিশ্বেশ্বর্য্যাদিকং সূক্তং দৃষ্টং তদ্ ব্রাহ্মণা তদা।
স্তুতয়ে যোগনিদ্রায়াঃ সমং দেব্যাঃ পুরন্দরঃ॥
অস্যাঃ দেব্যাঃ সমুৎপত্তিশ্চরিতং স্তোত্রমিত্যপি।
হিতায় সর্ব্বভূতানাং ধার্য্যতে ব্রহ্মবাদিভিঃ॥'

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী: প্রথম চরিত্র—প্রথম অধ্যায়, ৭০-৭১ শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য

সেই কর্ম্ম অনুযায়ী তোমার বিভিন্ন নাম দিচ্ছি। মহালক্ষ্মী-দত্ত মহাকালীর নামগুলির অন্যতম হ'ল কালরাত্রি।[১]

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে নির্ব্বাণ-প্রকরণের উত্তরভাগ একাশীতিতম সর্গে বশিষ্ঠদেব শ্রীরামচন্দ্রকে কালরাত্রি দেবীর বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন। 'অনন্ত মহাকাশে নৃত্যশীল কালভৈরবের দেহ হইতে ভগবতী কালরাত্রির আবির্ভাব হইল। কালরাত্রি করালবদনা, দীর্ঘাঙ্গী, কজ্জলবৎ শ্যামলা ও শীর্ণদেহা। সূর্য্যাদি দেব ও দানবগণের নানাবর্ণময় মস্তকাবলীর দ্বারা কমলমালার ন্যায় মালা গাঁথিয়া তিনি গলে পরিধান করিয়াছেন।...তাঁহার লম্বমান কর্ণযুগল ভুজঙ্গলম্বিত এবং নরমুণ্ডময় কুণ্ডলশোভিত।...তিনি কখনও একবাহু, কখনও বহুবাহু, কখনও বা বাহুহীনা। কখনও অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হ্রস্বকায়, আবার কখনও অসীম আকাশব্যাপিনী অনন্তমূর্ত্তি।...তিনি কখনও একবক্ত্র, কখনও বহুবক্ত্র, কখনও বা বক্ত্রবিহীন।' ইত্যাদি।

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী: প্রাধানিক রহস্য—একাদশ শ্লোকের 'কালরাত্রি' শব্দের পাদটীকা

সামবেদীয় কেনোপনিষৎ

শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ, এই শাক্ত সিদ্ধান্তটি সামবেদীয় কেনোপনিষদের একটি উপাখ্যানে সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত হয়েছে। ব্রহ্মশক্তির প্রভাবে দৈত্যগণের সঙ্গে যুদ্ধে দেববৃন্দের বিজয় হ'ল। কিন্তু ব্রহ্মশক্তির কার্য্যকারিতা অনুভব করতে না পেরে দেবতারা নিজেদের শক্তিতেই জয়লাভ হয়েছে মনে করলেন ও অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠলেন।

তখন তাঁদের 'অস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমা' আমাদেরই এই জয় আমাদেরই এই মহিমা এই মিথ্যাভিমান অপনোদন করার জন্য ব্রহ্ম আপন শক্তিপ্রভাবে তাঁদের কাছে বিস্ময়কর মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হলেন।

দেবগণ বুঝতে পারলেন না 'কিমিদং যক্ষমিতি', এই পূজ্যরূপ কে?

তাঁরা অগ্নিকে বললেন, 'জাতবেদ এতদ্বিজানীহি'—'কিমেতদ্‌যক্ষমিতি' অগ্নি! জেনে এসো তো এই পূজ্যরূপ কে?

১। 'মহামায়া মহাকালী মহামারী ক্ষুধা তৃষা।
নিদ্রা তৃষ্ণা চৈকবীরা কালরাত্রির্দুরত্যয়া॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী: প্রাধানিক রহস্য—একাদশ শ্লোক

অগ্নি সেই ছদ্মবেশী ব্রহ্মের কাছে গেলে তিনি অগ্নিকে প্রশ্ন করলেন, কোঽসীতি' 'ত্বয়ি কিং বীর্য্যমিতি', তোমার নাম ও শক্তি কি ?

অগ্নি উত্তর দিলেন, 'অগ্নির্বা অহমস্মীতি অপীদং সর্ব্বং দহেয়ম্ যদিদং পৃথিব্যামিতি', আমি অগ্নি এই নামে প্রসিদ্ধ, পৃথিবীতে যা কিছু আছে সমস্ত কিছু আমি দগ্ধ করতে পারি।

ছদ্মবেশী ব্রহ্ম অগ্নির সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করে বললেন, 'এতৎ দহেতি' এটিকে দগ্ধ কর।

অগ্নি সর্ব্বশক্তি প্রয়োগেও সেই তৃণটিকে দগ্ধ করতে পারলেন না।

তিনি ব্যর্থমনোরথ হয়ে দেবতাদের কাছে ফিরে এসে বললেন, নৈতদশকং বিজ্ঞাতুং যদেতৎ যক্ষমিতি' এই পূজ্যরূপ কে তা আমি বুঝতে পারলাম না।

এইরূপে বায়ুও ছদ্মবেশী ব্রহ্মের স্বরূপ জানতে তাঁর কাছে গেলে, তিনি পূর্ব্ববৎ বায়ুকে তাঁর নাম ও শক্তি জিজ্ঞাসা করলেন।

বায়ুও অগ্নির মতো দম্ভভরে উত্তর দিলেন, 'বায়ুর্বা অহমস্মীতি অপীদং সর্ব্বমাদদীয়ং যদিদং পৃথিব্যামিতি', আমি বায়ু, আমি পৃথিবীর সব-কিছু উড়িয়ে নিতে সক্ষম।

ছদ্মবেশী ব্রহ্মও পূর্ব্ববৎ বায়ুর সম্মুখে একটি তৃণ স্থাপন করে বললেন, 'এতৎ আদৎস্বেতি' এটিকে উড়িয়ে দাও।

বায়ুও অগ্নির মতো সর্ব্বশক্তি প্রয়োগ করেও সেটিকে উড়িয়ে ফেলতে সমর্থ হলেন না। তিনিও অগ্নির মতো সেই পূজ্যরূপের স্বরূপ বুঝতে না পেরে ব্যর্থমনোরথ হয়ে দেবতাদের কাছে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন।

তখন দেবগণ তাঁদের রাজা ইন্দ্রকে বললেন, 'মঘবন্ এতৎ বিজানীহি—কিমেতৎ যক্ষমিতি', হে ইন্দ্র! এই পূজ্যরূপ কে তা নির্দ্ধারণ করুন।

ইন্দ্র সেই ছদ্মবেশী ব্রহ্মের সম্মুখে উপস্থিত হ'লে ব্রহ্ম তিরোহিত হলেন।

'স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং'

তিনি যে আকাশে ছদ্মবেশী ব্রহ্মের অস্তিত্ব ও তিরোধান প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই আকাশপ্রদেশেই অবস্থিত থাকলেন, অগ্নি বা বায়ুর মতো ভগ্নমনোরথ

হয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন না। সেই পূজ্যরূপে ইন্দ্রের ভক্তি বুঝতে পেরে শোভনতমা স্ত্রীরূপিণী হিমাচল-নন্দিনী বিদ্যা উমা আবির্ভূতা হলেন।[১] উমা ব্রহ্মের সহচারিণী শক্তি, তিনি ব্রহ্মকে জানতে সমর্থ, এই মনে করে ইন্দ্র তাঁর কাছে গেলেন।[২]

তাঁকে ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিমেতৎ যক্ষমিতি' 'ব্রূহি কিমেতৎ দর্শয়িত্বা তিরোভূতং যক্ষমিতি', এই পূজ্যরূপ কে? বলুন তো যিনি এই সব লীলা দেখিয়ে অন্তর্হিত হলেন সেই পূজ্যরূপ কে?

তিনি বললেন, 'ব্রহ্মেতি' এই পূজ্যরূপই ব্রহ্ম 'ঈশ্বরেণৈব জিতা অসুরাঃ, যূয়ং তে নিমিত্তমাত্রং, তস্যৈব বিজয়ে যূয়ং মহীয়ধ্বম্'—ঈশ্বরই অসুরগণকে পরাজিত করেছেন, তোমরা উপলক্ষ্যমাত্র, ঈশ্বরের গৌরবেই তোমরা গৌরব লাভ করেছ, 'মিথ্যাভিমানস্তু যুষ্মাকময়মস্মাকমেবায়ং বিজয়োঽস্মাকমেবায়ং মহিমেতি'—আমরাই দৈত্যগণকে পরাজিত করেছি, এই কাজে আমাদেরই গৌরব—এইরূপ জ্ঞান তোমাদের মিথ্যাভিমান ছাড়া আর কিছুই নয়।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদেও শক্তিতত্ত্ব আলোচিত হয়েছে।

কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

ঋষি শ্বেতাশ্বতর তপস্যার প্রভাবে ও নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা আরাধিত পরমেশ্বরের প্রসাদে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয়েছিলেন। তিনিই এই ব্রহ্মতত্ত্ব সন্ন্যাসীগণকে নিজের অনুভূতি অনুযায়ী উপদেশ করেছিলেন।

ব্রহ্মবাদীগণ একত্রিত হয়ে পরস্পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাম্'? সুখ চায় না বা দুঃখ চায়, এমন জীব

১। ইন্দ্রায় তৎ যক্ষং যস্মিন্নাকাশ আকাশপ্রদেশ আত্মনং দর্শয়িত্বা তিরোভূতম্ ইন্দ্রশ্চ ব্রহ্মণস্তিরোধানকালে যস্মিন্নাকাশ আসীৎ স ইন্দ্র তস্মিন্নেবাকাশে তস্থৌ। কিং তৎ যক্ষমিতি ধ্যায়ন্ ন নিববৃতেঽগ্ন্যাদিবৎ তস্যেন্দ্রস্য যক্ষে ভক্তিং বুদ্ধা বিদ্যা উমারূপিণী প্রাদুরভূৎ স্ত্রীরূপা। স ইন্দ্রস্তামুমাং বহুশোভমানাং সর্ব্বেষাং হি শোভমানানাং শোভনতমা বিদ্যাং তদা বহুশোভমানেতি বিশেষণমুপপন্নং ভবতি।

—কেনোপনিষৎ: তৃতীয় খণ্ড—১২ অংশের শাঙ্কর ভা

২। হৈমবতী নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞে নেশ্বরেণ সহ বর্ত্তত ইতি জ্ঞাতুং সমর্থেতি কৃ তামুপজগাম। —কেনোপনিষৎ: তৃতীয় খণ্ড—১২ অংশের শাঙ্কর ভা

থিবীতে নাই, তথাপি মানুষের দুঃখময় বিষয়সম্ভোগে প্রবৃত্তির পিছনে কোন্ হাশক্তির প্রেরণা আছে? এই মহাশক্তিটি কে?

তাঁরা বিচার করছেন: সর্ববস্তুর বিকারকারী কাল নিয়মিত বস্তুশক্তি, ণ্যপাপলক্ষণ কর্ম্ম, আকস্মিক ঘটনা, আকাশাদি ভূত ও জীবাত্মা—এদের যে-কান একটি জগতের চালিকা সেই মহাশক্তি হতে পারে না। কারণ ্যবহার ক্ষেত্রে দেখা যায়, দেশকাল প্রভৃতি সংহত হয়েই কার্য্য নিষ্পন্ন করে, সংহতভাবে নয়। আবার কাল প্রভৃতি জড়পদার্থগুলি পরস্পরের সঙ্গে ম্মিলিত হলেই যে কার্য্য সম্পাদন করতে পারে তাও নয়, কারণ সংহতিমাত্রই রার্থ যেমন শয্যাসনাদি। অতএব কাল প্রভৃতির সংযোগজ সংঘাতও পরের ন্যই উদ্দিষ্ট হবে। এই পরই আত্মা। এই কারণে পরাধীন কাল প্রভৃতির ংযোগজ সংঘাতকে মূলা শক্তি বলা যায় না। জীব পাপপুণ্যকর্ম্মের বশীভূত। তএব পরাধীন জীবের পক্ষে জগৎ ব্যাপারের পরিচালনা সম্ভব নয়। ীব নিজেই যদি শক্তিমান হ'ত তাহ'লে সে সুখপ্রদ করেই জগৎ সৃষ্টি করত, ঃখপ্রদ করত না।[১]

এইভাবে তর্ক দ্বারা মহাশক্তির স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হয়ে তাঁরা ধ্যান

১। 'কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ ॥'
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ: প্রথম অধ্যায়—দ্বিতীয় শ্লোক

কালো নাম সর্ব্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ স্বভাবঃ—স্বভাবো নাম পদার্থানাং প্রতিনিয়তা :—অগ্নেরৌষ্ণ্যমিব। নিয়তিঃ অবিষমপুণ্যপাপলক্ষণং কর্ম্ম, ...যদৃচ্ছা আকস্মিকী ঃ। ভূতানি অবকাশাদীনিবা......পুরুষোবা বিজ্ঞানাত্মা......অয়মর্থঃ—কি কালাদীনি ্তোকং কারণম্? উত তেষাং সমূহ? ন চ প্রত্যেক কালাদীনাং কারণত্বং সম্ভবতি, বিরুদ্ধত্বাৎ। দেশকালনিমিত্তানাং সংহতানামেব লোকে কার্য্যকরত্বদর্শনাৎ। ন চাপ্যেষাং ালাদীনাং সংযোগঃ সমূহঃ কারণম্। সমূহস্য সংহতেঃ পরার্থত্বেন শেষত্বেন শেষিণ ত্মনো বিদ্যমানত্বাদস্বাতন্ত্র্যাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়নিয়মলক্ষণ—কার্য্যকারণত্বাযোগাৎ।......... াত্মা জীবোঽপ্যনীশঃ অস্বতন্ত্রো ন কারণম্। অস্বাতন্ত্র্যাদেব চাত্মনোঽপি সৃষ্টাদিহেতুত্বং ন ম্ভবতীত্যর্থঃ। কথমনীশত্বম? সুখদুঃখহেতোঃ সুখদুঃখহেতুভূতস্য পুণ্যাপুণ্যলক্ষণস্য কর্ম্মণো দ্যমানত্বাৎ, কর্ম্মপরবশত্বেন অস্বাতন্ত্র্যাচ্চ। ত্রৈলোক্যসৃষ্টিস্থিতিনিয়মে সামর্থ্যং ন বিদ্যতে বেত্যর্থঃ।'
—ঐ শাঙ্কর ভাষ্য

আশ্রয় করলেন এবং সেই ধ্যানযোগের সাহায্যে যে এক বস্তু কাল, স্বভা
নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসমূহ ও জীবাত্মাকে পরিচালিত করেন তাঁর স্বগুণাবৃ
শক্তিকে প্রত্যক্ষ করলেন।

'তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্ম শক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥' ৪।৩

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ: প্রথম অধ্যায়—তৃতীয় শ্লো

শাঙ্কর ভাষ্যে দেবাত্ম শক্তি কথাটির তাৎপর্য্য পাঁচভাবে বোঝান হয়েছে

দেবাত্ম শক্তি: প্রথম অর্থ — প্রথমে শঙ্করাচার্য্য বলছেন:

'দেবস্য দ্যোতনাদিযুক্ত স্য মায়িনো মহেশ্বরস্য পরমাত্মন আত্মভূতামস্বত
—ন সাংখ্যপরিকল্পিতপ্রধানাদিবৎ পৃথগ্‌ভূতাং স্বতন্ত্রাং শক্তিং...' স্বপ্রক
মায়াধীশ মহেশ্বর বা পরমাত্মার স্বরূপভূতা অর্থাৎ সাংখ্যদর্শনপরিকল্পিত প্রকৃতি
মতো পৃথগ্‌সত্তাবিশিষ্টা নয় এরূপ শক্তি। এই কারণেই এই শ্বেতাশ্বতরো
পনিষদেরই চতুর্থ অধ্যায়ের দশম শ্লোকে প্রকৃতিকে মায়া ও মহেশ্বরকে মা
বলা হয়েছে।

'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥'

—শ্বে. উ. ৪।

জগতের প্রকৃতি বা উপাদানকে মায়া বলে জানবে। মহেশ্বর মায়াবী অর্থ
মায়ার অধিষ্ঠান ও প্রয়োজক ছাড়া অন্য কেউ নন। এই মহেশ্বরের রজ্জু স
স্থানীয় মায়িক অবয়বের অধ্যাস দ্বারাই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত।[১]

শঙ্করাচার্য্য দ্বিতীয় অর্থ করেছেন:

১। জগৎপ্রকৃতিত্বেন অধস্তাৎ সর্ব্বত্র প্রতিপাদিতা প্রকৃতির্মায়ৈব ইতি বিদ্যাৎ বিজানী
......মহান্তাংসৌ ঈশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরস্তং মায়িনং মায়ায়াঃ সত্তাস্ফূর্ত্যাদিপ্রদতয়া প্রেরয়িতার
বিদ্যাদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ। তস্য প্রকৃতস্য পরমেশ্বরস্য রজ্জ্বাদ্যধিষ্ঠানেষু কল্পিতসর্পাদিস্থানী
র্মায়িকৈঃ স্বাবয়বৈরধ্যাসদ্বারা ইদং ভূরাদি সর্ব্বং ব্যাপ্তমেব পূর্ণমিত্যেৎ।

—শ্বে. উ. ৪।১০ শাঙ্কর

দেবাত্ম শক্তি
দ্বিতীয় অর্থ

'দেবাত্ম শক্তিং দেবতাত্মনা ঈশ্বররূপেণ পরস্থিতাং শক্তিম্...' শক্তিই পরমেশ্বররূপে অবস্থান করেন।[১] শক্তি ও শক্তিমানের এই অভেদ সিদ্ধান্ত শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে উক্ত হয়েছে :

'একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থু
র্যইমাঁল্লোকান্ ঈশত ঈশনীভিঃ।
প্রত্যংজনাংস্তিষ্ঠতি সঞ্চু কোপান্তকালে
সংসৃজ্য বিশ্বা ভরনানি গোপাঃ ॥' —শ্বে. উ. ৩।২

একমাত্র রুদ্রই আছেন, দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি এই সমস্ত লোককে ঈশিনী অর্থাৎ স্বীয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে অবস্থান করেন। তিনি বিশ্বের স্রষ্টা, রক্ষিতা ও সংহর্ত্তা।[২]

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকেও এই একই তত্ত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে :

'য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাৎ
বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ স দেবঃ
স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুমক্তু ॥' —শ্বে. উ. ৪।১

সৃষ্টির পূর্ব্বে যিনি এক অদ্বিতীয় ও ব্রাহ্মণত্বাদিজাতিরহিত তিনিই বিনা প্রয়োজনে অর্থাৎ লীলারসে স্বীয় বিচিত্র শক্তিস্ফারে ব্রাহ্মণাদি জাতি সৃষ্টি করেন অর্থাৎ তিনি বিশ্বের স্রষ্টা। তিনিই বিশ্বের ধারক ও প্রলয়কালে বিশ্বের সংহারক। সেই প্রকাশ-স্বভাব সত্তা আমাদিগে শুভ বুদ্ধি দান করুন।[৩]

১। 'সর্ব্বভূতেষু সর্ব্বাত্মন্ যা শক্তিরপরা তব।
গুণাশ্রয়া নমস্তস্যৈ শাশ্বতায়ৈ পরেশ্বর ॥
যাহতীতাঽগোচরা বাচাং মনসাং চাবিশেষণা।
জ্ঞ'নধ্যানপরিচ্ছেদ্যা তাং বন্দে দেবতাং পরাম্ ॥' শ্বে. উ. ১।৩-এর শাঙ্কর ভাষ্য

২। এতদুক্তং ভবতি—অদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা, ন চাসৌ কুম্ভকারবদাত্মানং কেবলং মৃৎপিণ্ডস্থানীয়মুপাদানকারণমুপাদত্তে, কি তর্হি? স্বশক্তি বিক্ষেপং কুর্ব্বন্ স্রষ্টা নিয়ন্তা বাভিধীয়তে ইতি— —শ্বে. উ. ৩।২-এর শাঙ্কর ভাষ্য

৩। 'য একোঽদ্বিতীয়ঃ পরমাত্মা অবর্ণো জাত্যাদিরহিতো নির্বিশেষ ইত্যর্থঃ। বহুধা শক্তিযোগাৎ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থোঽগৃহীতপ্রয়োজনঃ স্বার্থনিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ।'
—শ্বে. উ. ৪।১-এর শাঙ্কর ভাষ্য

দেবাত্ম শক্তি এই পদটির তৃতীয় প্রকার অর্থ নিরূপণকালে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে পারমার্থিক কোন ভেদ নাই, এ-কথা শঙ্করাচার্য্য সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর ভাষ্যে উল্লেখ করেছেন :

দেবাত্ম শক্তি তৃতীয় অর্থ

'দেবস্য পরমেশ্বরস্য আত্মভূতাং তু জগদুদ্ভব-স্থিতিলয়-হেতু-ভূতাং ব্রহ্মাবিষ্ণু-শিবাত্মিকাং শক্তিমিতি। তথাচোক্তম্

'শক্তয়ো যস্য দেবস্য ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবাত্মিকাঃ।' ইতি
'ব্রহ্মাবিষ্ণুশিবা ব্রহ্মন্ প্রধানা ব্রহ্ম শক্তয়ঃ।' ইতি চ।

পরমেশ্বরের স্বরূপভূতা বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা শক্তি। এই কথা বলা হয়েছে—পরমেশ্বরের শক্তিগুলি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক, হে ব্রহ্মন্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবই ব্রহ্মের তিন প্রধান শক্তি।

শক্তি-শক্তিমানের অভেদমূলক এই শাক্ত সিদ্ধান্তটিকেই প্রকাশ করার অভিপ্রায় নিয়ে শঙ্করাচার্য্য শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের স্বগুণৈঃ পদের গুণ শব্দের অন্যতম ব্যাখ্যায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের উল্লেখ করেছেন :[১]

'স্বগুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভিঃ। সত্ত্বেন বিষ্ণুঃ, রজসা ব্রহ্মা, তমসা মহেশ্বরঃ' সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি স্বকীয় গুণ। এক পরমেশ্বরই সত্ত্বগুণাশ্রয়ে বিষ্ণু, রজোগুণাশ্রয়ে ব্রহ্মা ও তমোগুণাশ্রয়ে মহেশ্বর এই ত্রিবিধ আখ্যায় অভিহিত হয়ে থাকেন।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকের দেবাত্ম-শক্তিং ও স্বগুণৈঃ এই দুটি পদের উপরি অভিহিত রূপ ব্যাখ্যা করে শঙ্করাচার্য্য তাঁর ভাষ্যে মন্তব্য করছেন :

'সত্ত্বাদ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ স্বরূপেণ নিরুপাধিকপূর্ণানন্দাদ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মনৈবাবুপলভ্য-মানাঃ পরস্যৈব ব্রহ্মণঃ সৃষ্ট্যাদিকার্য্যং কুর্ব্বতোঽবস্থাভেদমাশ্রিত্য—শক্তি-ভেদব্যবহারঃ, ন পুনস্তত্ত্বভেদমাশ্রিত্য। তথাচোক্তম্—'

১। স্বগুণৈঃ পদের ভাষ্যকার-কৃত অন্য চার প্রকার অর্থ :—(১) স্বগুণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যভূতৈঃ পৃথিব্যাদিভিশ্চ নিগূঢ়াং সংবৃতাম্ কার্য্যকারেণ কারণাকারস্যাভিভূতত্বাৎ কার্য্যাৎ পৃথক্স্বরূপেণোপলব্ধমযোগ্যামিত্যর্থঃ। তথা চ প্রকৃতকার্য্যত্বং গুণানাং দর্শয়তি ব্যাসঃ—

'সর্গস্থিত্যন্তকারিণীং ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবাত্মিকাম্।
স সংজ্ঞাং যাতি ভগবানেক এব জনার্দ্দনঃ ॥'

আসল উপাধিশূন্য, পূর্ণানন্দ, দ্বিতীয়-রহিত ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তির মধ্যে কোন তফাৎ নাই। যখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন উপাধি সংসর্গে একই কূটস্থ ব্রহ্মকে পালয়িতা, স্রষ্টা ও সংহর্ত্তা বলে মনে হয়, তখন ব্রহ্মের সেই সেই অবস্থাগত ব্যবহারিক ভেদকে লক্ষ্য করেই ব্রহ্ম-শক্তি ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন এইরূপ কল্পনা করা হয়। কিন্তু এরূপ কল্পনার বলে ব্রহ্ম ও তাঁর শক্তির মধ্যে কোন পারমার্থিক ভেদ সিদ্ধ হয় না। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

একই পরমেশ্বর সৃষ্টিকালে ব্রহ্মা, স্থিতিকালে বিষ্ণু ও সংহারকালে শিব এই তিন প্রকার নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব শক্তি-শক্তিমানের এই তত্ত্বগত অভেদই ভক্তগণকে উপদেশ করে গেছেন:

শ্রীরামকৃষ্ণ—যিনি ব্রহ্ম, তিনিই কালী মা আদ্যাশক্তি! যখন নিষ্ক্রিয়, তাঁকে ব্রহ্ম বলে কই। যখন সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় এই সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলে কই। স্থির জল ব্রহ্মের উপমা। জল হেল্‌চে দুল্‌চে, শক্তি বা কালীর উপমা। কালী কি না—যিনি মহাকালের ব্রহ্মের সহিত রমণ করেন। কালী সাকার আকার নিরাকারা। ....
যিনি ব্রহ্ম, তিনিই শক্তি, তিনিই মা।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত: ১ম ভাগ—১২শ খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ

সাধক কবি রামপ্রসাদ একই অনুভূতির প্রতিধ্বনি করেছেন:

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ ইতি। (২) স্বগুণৈরীশ্বরগুণৈঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিভির্ব্বা সত্ত্বাদিভির্নিগূঢ়াং কার্য্যকারণবিনির্মুক্ত পূর্ণানন্দা দ্বিতীয় ব্রহ্মাত্মনৈবানুপলভ্যমানাম্। (৩) রগুণৈর্ব্রহ্মাপরতন্ত্রৈঃ প্রকৃত্যাদিবিশেষণৈরুপাধিভির্নিগূঢাম্। তথা চ দর্শয়িষ্যতি একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ ইত্যাদি। (৪) স্বগুণৈঃ স্বব্যষ্টিভূতৈঃ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেপিতৃত্বাদিভির্নিগূঢ়াং তত্ত্বদ্বিশেষরূপেণাবস্থিতত্বাৎ স্বরূপেণ শক্তিমাত্রেণানুপলভ্যমানাম্ ॥

এই চার প্রকার অর্থ দেবাত্ম শক্তি পদটির উপরি আলোচিত প্রথম, দ্বিতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অর্থের ক্ষেত্রে পর পর প্রযোজ্য।

'ষড়দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতয়ে কি ভাঙবো হাড়ি, বুঝ রে মন ঠারে ঠোরে॥'

—ক. বি. শা. প.: মনোদী

শেষ দু'পংক্তির তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যাখ্যা রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এরূপে করছে 'আমি তত্ত্ব করি যারে অর্থাৎ আমি সেই ব্রহ্মের তত্ত্ব করছি। তাঁ মা মা বলে ডাকছি।'

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত: ১ম ভাগ—১২শ খণ্ড, ৯ম পরি

সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁর একটি পদে শক্তি-শক্তিমানের অভিন্ন স্ব বোঝাতে কালীব্রহ্ম এই শব্দটির প্রয়োগ করেছেন:

প্রসাদ বলে, ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি।
আমি কালী ব্রহ্ম জেনে ধর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি॥[১]

—ক. বি. শা. প.: ব্রহ্মময়ী

কিন্তু পূর্ণ জ্ঞানের আগে শক্তি-শক্তিমানের এই অভেদতত্ত্ব উপলব্ধি যায় না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাণীই এ প্রসঙ্গে প্রকৃষ্ট প্রমাণ:

ব্রহ্মভক্ত—তিনি আর তাঁর শক্তি কি তফাৎ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—পূর্ণজ্ঞানের পর অভেদ। যেমন মণির জ্যোতিঃ আর অভেদ। মণির জ্যোতিঃ ভাবলেই মণি ভাবতে হয়। দুধ আর দু ধবলত্ব যেমন অভেদ। একটাকে ভাবলেই আর একটাকে ভাবতে হয়। এ অভেদজ্ঞান—পূর্ণজ্ঞান না হলে হয় না। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্ব্বিংশ তত্ত্ব ছেড়ে চলে যায়—তাই অহংতত্ত্বও থাকে না। সমাধিতে কি বোধ হয়

১। অধর্ম্ম কি না অসৎ কর্ম্ম। ধর্ম্ম কি না বৈধী কর্ম্ম—এতো দান করতে হবে ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে হবে, এই সব কর্ম্ম।

—রামপ্রসাদের উক্তির ব্যাখ্যায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ: শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত—১ম
১২শ খণ্ড, ৯ম পরি

বলা যায় না। নেমে একটু আভাসের মত বলা যায়। যখন সমাধিভঙ্গের পর ওঁ ওঁ বলি, তখন আমি একশো হাত নেমে এসেছি। ব্রহ্ম বেদবিধির পার মুখে বলা যায় না। সেখানে আমি ও তুমি নাই।

যতক্ষণ আমি তুমি আছে, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা কি ধ্যান কোচ্ছি এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ তুমি ঈশ্বর প্রার্থনা শুনছো, এ জ্ঞানও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে। তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি পূর্ণ, আমি অংশ, তুমি মা, আমি ছেলে, এ বোধ থাকবে। এই ভেদবোধ, আমি একটি, তুমি একটি। এ ভেদবোধ তিনিই করাচ্ছেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব বোধ হচ্ছে। যতক্ষণ এই ভেদবোধ, ততক্ষণ শক্তি (Personal God) মানতে হবে। তিনিই আমাদের ভিতর আমি রেখে দিয়েছেন। হাজার বিচার কর আমি আর যায় না। আর তিনি ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন।

তাই যতক্ষণ আমি আছে—ভেদবুদ্ধি আছে—ততক্ষণ ব্রহ্ম নির্গুণ বলবার যো নাই। ততক্ষণ সগুণ ব্রহ্ম মানতে হবে। এই সগুণ ব্রহ্মকে বেদ, পুরাণ, তন্ত্রে কালী বা আদ্যাশক্তি বলে গেছে।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত : ১ম ভাগ—১২শ খণ্ড, ৯ম পরিচ্ছেদ

কিন্তু দেবাত্ম শক্তিম্ এই পদটির চতুর্থ প্রকার অর্থ নির্ণয়াবসরে শঙ্করাচার্য্য তন্ত্র-প্রতিপাদিত আত্মতত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব ও শিবতত্ত্ব এই তিনটি তত্ত্বেরই উল্লেখ করেছেন :

দেবাত্ম শক্তি চতুর্থ অর্থ

'দেবশ্চ আত্মা চ শক্তিশ্চ যস্য পরস্য ব্রহ্মণোঽবস্থাভেদাঃ তাং প্রকৃতিপুরুষেশ্বরাণাং স্বরূপভূতাং ব্রহ্মরূপেণাবস্থিতাং পরাৎপরতরাং শক্তিম্' পরমাত্মা, জীবাত্মা ও শক্তি পরব্রহ্মেরই অবস্থা, এই তিনের স্বরূপভূতা সর্ব্বোৎকৃষ্টা শক্তিই ব্রহ্ম।[১]

'দেবাত্মনো দ্যোতনাত্মনঃ প্রকাশরূপস্য জ্যোতিষাং জ্যোতীরূপস্য প্রজ্ঞানঘনস্বরূপস্য পরমাত্মনো জগদুৎপত্তিস্থিতিলয়নিয়মনবিষয়াং শক্তিং সামর্থ্যম্' দ্যোতনস্বভাব অর্থাৎ প্রকাশশীল দীপ্তিরও দীপ্তিদানকারী প্রজ্ঞানঘনরূপ পরমাত্মার জগতের সৃষ্টিস্থিতিসংহার নিয়ন্ত্রণ করবার ক্ষমতাই হ'ল শক্তি।

দেবাত্ম শক্তি পঞ্চম অর্থ

১। তথাচ ত্রয়াণাং স্বরূপভূতং প্রদর্শয়িষ্যতি—ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মমেতৎ। এবং যদা বিদ্বতে ব্রহ্মমেতৎ ইতি॥ —শ্বে. উ. ১৷১২ শাঙ্কর ভাষ্য

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদে দুর্গার নাম ও স্বরূপ সম্বন্ধে নিম্নমতো শ্লোক পাওয়া যায় :

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদ্

'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্
দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥'

আমি সেই বৈরোচনী অর্থাৎ পরমাত্মা কর্তৃক দৃষ্ট, অগ্নির মতো দীপ্তিসম্পন্না, স্বীয়তেজঃবশতঃই উজ্জ্বলা অর্থাৎ আপন বীরত্বে শত্রুনাশকারিণী, কর্ম্মফলের জন্য অন্বেষিতা অর্থাৎ কর্ম্মফলদাত্রী দুর্গা দেবীর শরণ লই। হে সংসারত্রাণকারিণি, উদ্ধার যাতে পাই তার জন্য তোমাকে নমস্কার।

তৈত্তিরীয় আরণ্যেকর যাজ্ঞিকা উপনিষদে দুর্গার গায়ত্রীর উল্লেখ পাওয়া যায় :

ঐ যাজ্ঞিকা উপনিষদ্

'কাত্যায়নায় বিদ্মহে, কন্যাকুমারীং ধীমহি, তন্নো দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ' কাত্যায়নীকে জানি, কন্যারূপিণী সৃষ্টিসম্ভাবনাপূর্ণা তাঁরই ধ্যান করি, সেই দুর্গাই আমাদের উৎসাহ বিধান করুন।[১]

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বের ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে দুর্গার স্তোত্র পাওয়া যায়। যুদ্ধে সমুপস্থিত কৌরব সৈন্যকে দেখে অর্জ্জুনের মঙ্গলের জন্য কৃষ্ণ বললেন :

মহাভারত : ভীষ্মপর্ব্ব—২৩ অধ্যায়

'শুচির্ভূত্বা মহাবাহো! সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ।
পরাজয়ায় শত্রুণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয় ॥'

হে বাহুবলশালী অর্জ্জুন! তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার সময় শত্রুপক্ষের পরাজয়ের জন্য শুদ্ধচিত্ত হয়ে দুর্গাকে স্তব কর।

তখন অর্জ্জুন রথ থেকে অবতীর্ণ হয়ে হাতজোড় করে স্তোত্র পাঠ সুরু করলেন।

হে যোগসিদ্ধিদায়িকা! জরাবিহীনা! কালশক্তি! রুদ্রপত্নী! সংহারক কালরূপী মহাকালী! বিপদুদ্ধারকারিণী! জয় স্বরূপে! শূলচর্ম্মধারিণী! নন্দগোপকুলোদ্ভবে! নানালঙ্কারধারিণী! মহিষাসুররক্তপ্রিয়ে! হে উমা! কৈটভনাশিনী! তোমাকে নমস্কার।

১। সায়নাচার্য্যের ভাষ্যানুযায়ী দুর্গি ও দুর্গা অভিন্ন—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী ভূমিকা।

তুমি বিদ্যার মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা, তুমি দেহীদের সুষুপ্তি ও মৃত্যু, তুমি দেবতার উদ্দেশ্যে হবির্দানের মন্ত্র, পিতৃপুরুষকে পিণ্ডদানের মন্ত্র, তুমি সূক্ষ্ম কাল ও মহাকাল! সকল প্রকার বাক্য তুমিই, তোমাকেই বেদমাতা গায়ত্রী ও বেদান্ত বলা হয়ে থাকে।

তুমি মোহকারিণী রতি, তুমি ত্রিগুণাত্মিকা অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তি, তুমি লজ্জা, লক্ষ্মী, দিনরজনীর সন্ধিকাল, চন্দ্রসূর্যাদির দীপ্তিদানকারিণী প্রকৃতি ও বিশ্বের জয়য়িত্রী।

তুমি চিত্তের সন্তোষাত্মিকা বৃত্তি, বুদ্ধি, ধৈর্য্য, চন্দ্রসূর্য্যাদিতে তেজ-আধায়িণী। তুমিই ঐশ্বর্য্যবানদের ঐশ্বর্য্য। তুমি যোগি ও পরিব্রাজকগণের ধ্যানগম্যা।[১]

মহাভারত : বিরাটপর্ব্ব—ষষ্ঠ অধ্যায়

বিরাটপর্ব্বের ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কর্তৃক দুর্গাস্তবের একটি বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বারো বছর বনবাসের পর বিরাটনগরে অজ্ঞাতবাসের জন্য যাত্রার প্রাকালে অর্জ্জুনসহ রাজা যুধিষ্ঠির ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী দুর্গাকে—

'স্তোতুং প্রচক্রমে ভূয়ো বিবিধৈঃ স্তোত্রসম্ভবৈঃ।
আমন্ত্র্য দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজা দেবী সহানুজঃ ॥' ৬

নানাবিধ স্তোত্রের দ্বারা আমন্ত্রণ করে তাঁর দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষায় তাঁকে পুনরায় স্তব করতে আরম্ভ করলেন।

১। অর্জ্জুন উবাচ

নমস্তে সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি!
কুমারি! কালি! কাপালি! কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে! ॥ ৪
ভদ্রকালি! নমস্তুভ্যং মহাকালি! নমোঽস্তুতে!
চণ্ডি! চণ্ডে! নমস্তুভ্যঃ তারিণি! বরবর্ণিনি! ॥ ৫
কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে, জয়ে!
শিখিপিচ্ছধ্বজধরে! নানাভরণভূষিতে! ॥ ৬
অট্টশূলপ্রহরণে! খড়্গাখেটধারিণি!
গোপেন্দ্রস্যানুজে! জ্যেষ্ঠে! নন্দগোপকুলোদ্ভবে! ॥ ৭
মহিষাসৃক্প্রিয়ে! নিত্য কৌশিকি! পীতবাসিনি
অট্টহাসে কাকমুখি! নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে! ॥ ৮

হে জরাদিহীনা! বালসূর্য্যসদৃশাকারবিশিষ্টা! পূর্ণচন্দ্রনিভাননে! চতুর্ভুজ-ধারিণী! তুমি শত্রুজয়ের জন্য পাশ, ধনু, মহাচক্র ও বিবিধ আয়ুধ ধারণ করে আছ। তোমার কর্ণে কুণ্ডল, মাথায় বিচিত্র মুকুট ও সুন্দর কবরী। তুমি যুদ্ধে জয়প্রদা। তুমি আমাকে বিজয়ী করো। হে মদ্যমাংসবলি প্রিয়ে কালশক্তিসংহারকর্ত্রী কালি! শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত বিন্ধ্যাচলেই তোমার স্থান। রাজ্য থেকে পরিভ্রষ্ট হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হয়েছি। হে পদ্মপত্রাক্ষি! তুমি আমাকে ত্রাণ কর।[২]

স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী দর্শন দান করলেন ও বর দিলেন:

'শৃণু রাজন মহাবাহো মদীয়ং বচনং শুভম্।
ভবিষ্যত্যচিরাদেব সংগ্রামে বিজয়স্তব ॥ ২৭

উমে! শাকম্ভরি! শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি!
হিরণ্যাক্ষি! বিরূপাক্ষি! সুধূম্রাক্ষি! নমোঽস্তুতে! ॥ ৯
বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে! ব্রহ্মণ্যে! জাতবেদসি!
জম্বুকটকচৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে! ॥ ১০
ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্।
স্কন্দমাতর্ভগবতি! দুর্গে! কান্তারবাসিনি! ॥ ১১
স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যসে ॥ ১২
স্তুতাসি ত্বং মহাদেবি! বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎপ্রসাদাদ্রণাজিরে ॥ ১৩
কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানামালয়েষু চ।
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্ ॥ ১৪
ত্বং জম্ভনী মোহিনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ।
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥ ১৫
তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতির্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্যপরিবর্দ্ধিনী।
ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধচারণৈঃ ॥ ১৬

—মহাভারত: ভীষ্মপর্ব্ব—২৩ অধ্যায়, ৪—১৬ শ্লোক
মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণ

'নমস্তেঽস্তু বরদে! কৃষ্ণে! কুমারি! ব্রহ্মচারিণি!
বালার্কসদৃশাকারে পূর্ণচন্দ্রনিভাননে ॥ ৭

মম প্রসাদান্নির্জিত্য হত্বা কৌরববাহিনীম্।
রাজ্যং নিষ্কণ্টকং কৃত্বা ভোক্ষ্যসে মেদিনীং পুনঃ ॥ ২৮

... ...

মৎপ্রসাদাচ্চবঃ সর্ব্বান্ বিরাটনগরে স্থিতান্।
ন প্রভাস্তন্তি কুরবো নরা বা তন্নিবাসিনঃ ॥ ৩৫

হে বাহুবলসম্পন্ন রাজা! আমার কথা শোনো। শীঘ্রই যুদ্ধে তোমার জয় হবে। আমার অনুগ্রহে তুমি কুরুসৈন্যকে পরাজিত করে সসাগরা ধরিত্রীর রাজ্যকে শত্রুশূন্য করে পুনরায় ভোগ করতে পারবে। তাছাড়া, আমার অনুগ্রহে বিরাটনগরে অবস্থানকালে তোমাদের সকলকে কৌরবগণ বা বিরাট-নগরবাসিগণ চিনতে পারবে না।

রামায়ণ

দুর্গাপূজার মন্ত্রে আছে 'রাবণস্য বিনাশায় রামস্যানুগ্রহায় চ অকালে বোধিতা দেবী।' রাবণের বিনাশ ও রামের মঙ্গলের জন্য দেবীর অকাল বোধন হয়েছিল। বাল্মীকির রামায়ণে কিন্তু এ বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না।

চতুর্ভুজে চতুর্ব্বক্ত্রে পীনশ্রোণিপয়োধরে।
ময়ূরপিচ্ছবলয়ে কেয়ূরাঙ্গদধারিণি।
ভাসি দেবী যথা পদ্মা নারায়ণপরিগ্রহা ॥ ৮
স্বরূপং ব্রহ্মচর্য্যঞ্চ বিশদং তব খেচরী।
কৃষ্ণচ্ছবিসমা কৃষ্ণা শঙ্কর্ষণসমাননা ॥ ৯
বিভ্রতী বিপুলৌ বাহু শক্রধ্বজসমুচ্ছ্রয়ৌ।
পাত্রী চ পঙ্কজী ঘণ্টী স্ত্রীবিশুদ্ধা চ যা ভুবি ॥ ১০
পাশং ধনুর্ম্মহাচক্রং বিবিধান্যায়ুধানি চ।
কুণ্ডলাভ্যাং সুপূর্ণাভ্যাং কর্ণাভ্যাঞ্চ বিভূষিতা ॥ ১১
চন্দ্রবিস্পর্দ্ধিনা দেবি! মুখেন ত্বং বিরাজসে।
মুকুটেন বিচিত্রেণ কেশবন্ধেন শোভিনা ॥ ১২
ভুজঙ্গাভোগবাসেন শ্রোণিসূত্রেণ রাজতা।
ভ্রাজসে চাপবিদ্ধেন ভোগেনেবেহ মন্দরঃ ॥ ১৩
ধ্বজেন শিখিপিচ্ছানামুচ্ছ্রিতেন বিরাজসে।
কৌমারং ব্রতমাস্থায় ত্রিদিবং পাবিতং ত্বয়া।
তেন ত্বং স্তুয়সে দেবী ত্রিদশৈঃ পূজ্যসেঽপি চ ॥ ১৪

শক্তি-শক্তিমানের অভেদসম্বন্ধীয় শাক্ত সিদ্ধান্তটি পুরাণে কথিত হয়েছে।

পুরাণে শক্তিতত্ত্ব ভাগবতপুরাণের টীকাকার শ্রীধর স্বামী মন্তব্য করছেন: 'অতো ব্রহ্মণোঽপি স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব পাবকস্য দাহকত্বাদি শক্তিবৎ।' অগ্নির দাহিকা, পাচিকা ইত্যাদি শক্তির মতো ব্রহ্মেরও স্বাভাবিক শক্তি আছে।

ত্রৈলোক্যরক্ষণার্থায় মহিষাসুরনাশিনি।
প্রসন্না মে সুরশ্রেষ্ঠে দয়াং কুরু শিবা ভব ॥ ১৫
জয়া ত্বং বিজয়া চৈব সংগ্রামে চ জয়প্রদা।
মমাপি বিজয়ং দেহি বরদা ত্বঞ্চ সাম্প্রতম্ ॥ ১৬
বিন্ধ্যে চৈব নগশ্রেষ্ঠে তব স্থানং হি শাশ্বতম্।
কালি কালি মহাকালি সীধুমাংসপশুপ্রিয়ে ॥ ১৭
কৃতানুযাত্রা ভূতৈস্ত্বং বরদে কামচারিণি।
ভারাবতারে যে চ ত্বাং সংস্মরিষ্যন্তি মানবাঃ ॥ ১৮
প্রণমন্তি চ যে ত্বাং হি প্রভাতে চ নরাঃ ভুবি।
ন তেষাং দুর্লভং কিঞ্চিৎ পুত্রতো ধনতোঽপি বা ॥ ১৯
দুর্গাত্তারয়সে দুর্গে তত্ত্বং দুর্গা স্মৃতা জনৈঃ।
কান্তারেম্ববসন্নানাং মগ্নানাঞ্চ মহার্ণবে ॥ ২০
দস্যুভির্বা নিরুদ্ধানাং ত্বং গতিঃ পরমানৃণাম।
জলপ্রতরণে চৈব কান্তারেম্বটবীষু চ ॥ ২১
যে স্মরন্তি মহাদেবি! ন চ সীদন্তি তে নরাঃ।
ত্বং কীর্তিঃ শ্রীধৃতিঃ সিদ্ধির্হ্রীর্বিদ্যা সন্ততির্মতিঃ ॥ ২২
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা নিদ্রা জ্যোৎস্না কান্তিঃ ক্ষমা দয়া।
নৃণাঞ্চ বন্ধনং মোহং পুত্রনাশং ধনক্ষয়ম্ ॥ ২৩
ব্যাধিং মৃত্যুং ভয়ঞ্চৈব পূজিতা নাশয়িষ্যসি।
সোঽহং রাজ্যাৎ পরিভ্রষ্টঃ শরণং ত্বাং প্রপন্নবান ॥ ২৪
প্রণতশ্চ যথা মূর্দ্ধ্না তবে দেবি! সুরেশ্বরি!।
ত্রাহি মাং পদ্মপত্রাক্ষি সত্যে সত্যা ভবস্ব নঃ ॥ ২৫
শরণং ভব মে দুর্গে শরণ্যে ভক্তবৎসলে।
এবং হি সা দেবী দর্শয়ামাস পাণ্ডবম্।
উপগম্য তু রাজানমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬

—বিরাটপর্ব্ব: মহাভারত

দেবীভাগবতও অগ্নি ও তার শক্তির ন্যায় পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতির অভেদের কথা বলছেন।[১]

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ত্রয়োদশ অধ্যায়—শ্রীশ্রীচণ্ডীতে—শক্তিতত্ত্বের যে বিশদ্ বিবরণ পাওয়া যায়, তার কিছু কিছু আমরা ইতিপূর্ব্বে প্রথম পরিচ্ছেদেই আলোচনা করেছি।

বেদপুরাণ-প্রতিপাদিত এই অদ্বৈত শক্তিতত্ত্বের অতীন্দ্রিয় অনুভূতি সাধক কবি কমলাকান্তের পদে নিপুণ বাণীরূপ লাভ করেছে :

"মন ! ভ্রমে ভুলেছো কেনে,
তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে।
শ্রীনাথ দত্ত প্রধান তত্ত্ব, দাঢ্য কর সেই চরণে॥
যখন যারে ব্রহ্ম বল, সেই ব্রহ্ম সেই পুরাণে।
তোমার দ্বৈতভাবে দিবস গ্যালো,
চিদানন্দ রয় কেমনে॥
তন্ন তন্ন করি মোলে, কি পেলে ছয় দরশনে।
তুমি বিদ্যা অবিদ্যারে জান, মহাবিদ্যা আরাধনে॥
কমলাকান্ত কালীর তত্ত্ব, অনুমানে কেবা জানে।
যার আদি মধ্য অন্ত নাই,
সে নানা মূর্ত্তি নানা স্থানে।"

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত সাধক কমলাকান্ত : পৃঃ ১১৯

১। দেবীভাগবতের মতে, সর্ব্বভূতে শক্তি আত্মরূপে বিদ্যমান এবং প্রাণী শক্তিহীন হ'লে শববৎ নিষ্ক্রিয় হয়। উক্ত পুরাণ অনুসারে পরম পুরুষ দুই ভাগে বিভক্ত—এক ভাগ সচ্চিদানন্দ এবং দ্বিতীয় ভাগ পরাশক্তি, মায়া প্রকৃতি। কিন্তু দুই ভাগ মূলতঃ অভিন্ন। বহ্নি ও তৎশক্তির ন্যায় পরম পুরুষ ও পরমা প্রকৃতি অদ্বৈত। দেবীভাগবতে আছে—

সেয়ং শক্তি মহামায়া সচ্চিদানন্দরূপিণী।
রূপং বিভর্ত্যরূপা চ ভক্তানুগ্রহহেতবে॥

সেই সচ্চিদানন্দরূপিণী মহামায়া পরাশক্তি অরূপা হইয়াও ভক্তগণকে কৃপা করিবার জন্য রূপ ধারণ করেন। —স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্ত্তৃক অনূদিত ও সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী

তন্ত্রের সিদ্ধান্তানুযায়ী প্রকাশাত্মক পারমেশ্বরী সংবিৎই পরতত্ত্ব। এই সংবিৎ তত্ত্ব ছাড়া আর কোন তত্ত্বেরই পারমার্থিক সত্তা নাই

তন্ত্রে অদ্বয় শক্তিতত্ত্ব

এই পরসংবিদে প্রমাতৃ-প্রমেয় বিভাগ অবলুপ্ত। এইজন্য এই সংবিৎ সকলভাবশূন্য নিরাবরণরূপে স্ফুরিত হয়। তাই এই সংবিৎ শূন্যরূপ।[১]

তন্ত্রাচার্য্য অভিনব গুপ্ত মন্তব্য করেছেন:

'তদেব শূন্যরূপত্বং সংবিদঃ পরিগীয়তে'

—তন্ত্রালোক: ষষ্ঠ আহ্নিক—১০ কারিকা

পরসংবিৎ সকলভাবশূন্য বলেই তাকে শূন্যরূপ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। ভাষ্যকার আচার্য্য জয়রথ শূন্যরূপত্বং পদের ব্যাখ্যা করছেন, শূন্যপ্রমাতৃত্বম্ অর্থাৎ পরসংবিদে কোন জ্ঞেয়ই থাকে না। তাই বলে পরসংবিৎ শশবিষাণের মতো অসৎ পদার্থ নয়।[২]

'অশূন্যং শূন্যমিত্যুক্তং শূন্যং চাভাব উচ্যতে।
অভাবঃ স সমুদ্দিষ্টো যত্র ভাবাঃ ক্ষয়ং গতাঃ।।' —ঐ জয়রথ-ভাষ্য

'সর্ব্বালম্বনধর্ম্মৈশ্চ সর্ব্বসত্ত্বৈরশেষতঃ।
সর্ব্বক্লেশাশয়ৈঃ শূন্যং ন শূন্যং পরমার্থতঃ।।' —ঐ জয়রথ-ভাষ্য

অশূন্যকেই শূন্য বলা হয়েছে, শূন্য কি? না কোন কিছুর অভাব। সংবিদে জ্ঞেয় ভাবের অনুপস্থিতি, এই অর্থে সংবিৎ শূন্য আসলে শূন্য নয়। সংবিৎ সমস্ত আলম্বনধর্ম্ম, সত্ত্ব, ক্লেশ ও আশয় বিবর্জ্জিত বলেই শূন্য, প্রকৃতপ্রস্তাবে শূন্য অর্থাৎ অসৎ নয়।

১। সংবিন্মাত্রং হি যচ্ছুদ্ধং প্রকাশপরমার্থকম্। তন্মেয়মাত্মনঃ প্রোজ্ঝ্য বিবিক্তং ভাসতে নভঃ॥ —তন্ত্রালোক: ষষ্ঠ আহ্নিক—৯ কারিকা

'যন্নাম হীদং প্রমাতৃপ্রমেয়াত্মনো বিশ্বস্য স্বাবিভাগেনৈবাবভাসনাৎ প্রকাশপরমার্থকম্ অতএব তদারূষণাখ্যা অভাবাৎ শুদ্ধং সংবিন্মাত্রং……মেয়ং আত্মনঃ সকাশাৎ প্রোজ্ঝ্য পৃথক্কৃত্য বিশ্বস্মাৎ উত্তীর্ণোঽহম্ ইত্যামৃশ্য বিবিক্তং নভোঽবভাসতে সকলভাবশূন্যত্বাৎ নিরাবরণরূপতয়া প্রস্ফুরতীত্যর্থঃ।' —তন্ত্রালোক: ষষ্ঠ আহ্নিক—১০ কারিকার জয়রথ-ভাষ্য

২। শূন্যত্বং চাস্য সর্ব্বস্য সংবেদ্যস্য সংক্ষয়াৎ ন তু সংবিদোঽপি, তথাত্বে হি নিখিলমিদমন্ধমূকপ্রায়ং স্যাৎ। —তন্ত্রালোক: ষষ্ঠ আহ্নিক—১০ কারিকার জয়রথ-ভাষ্য

একমাত্র যোগিগণই এই পরসংবিদে বিশ্রান্তি লাভ করে থাকেন।

'নেতি নেতি বিমর্শেন যোগিনাং সা পরা দশা ॥'

—তন্ত্রালোক : ষষ্ঠ আহ্নিক—১০ কারিকা

যোগিগণের পরসংবিৎ ভাববিষয়ক নয়, আবার অভাববিষয়কও নয়—এরূপ মধ্যমা প্রতিপত্তি হয়। এইভাবে তাঁরা নির্ব্বাপিত অগ্নির মতো সমস্ত বেদ্যবিবর্জ্জিত শূন্যদশা প্রাপ্ত হন।[১] যোগীর এই অবস্থাই পাতঞ্জল দর্শনে নির্বীজ বা অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলে ব্যাখ্যাত হয়েছে।[২]

এই সমাধিদশাপ্রাপ্ত সাধকের প্রশান্তি অজ্ঞাতনামা শাক্ত কবির পদে যথাযোগ্য বাঙ্ময়তা অর্জ্জন করেছে :

"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি,
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী।
অনন্ত আঁধারকোলে মহানির্ব্বাণ হিল্লোলে,
চির শান্তি পরিমল, অবিরল যায় ভাসি।
মহাকাল রূপ ধরি, আঁধার বসন পরি,
সমাধি মন্দিরে ওমা কে তুমি গো একা বসি।
অভয় পদ কমলে, প্রেমের বিজলী জ্বলে,
চিন্ময় মুখমণ্ডলে, শোভে অট্ট অট্ট হাসি।"

—ক. বি. শা. প. : জগজ্জননীর রূপ

তান্ত্রিক সিদ্ধান্তানুযায়ী শক্তিশক্তিমৎতত্ত্ব অদ্বৈত অথচ জগৎ বহুবিচিত্র।

বিশ্বচিৎ-প্রতিবিম্ববাদ

তার কারণ—

'যঃ প্রকাশঃ স সর্বস্য প্রকাশত্বং প্রযচ্ছতি'

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—২ কারিকা

১। 'শূন্যভাবস্থিতঃ পশ্চাৎ সংবেদনবিবর্জ্জিতঃ। নির্ব্বাণঃ কৃষ্ণবর্ত্মেব নিরূপাখ্যো ভবত্যসৌ ॥' —তন্ত্রালোক : ৬ আহ্নিক—১০ কারিকা, জয়রথ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত শ্লোক

২। 'বিরামপ্রত্যয়াভ্যাসপূর্ব্বঃ সংস্কারশেষোঽন্যঃ ॥' ১৮

—পাতঞ্জল দর্শন : সমাধিপাদ—১৮ সূত্র

'সর্ব্ববৃত্তিপ্রত্যস্তময়ে সংস্কারশেষো নিরোধশ্চিত্তস্য সমাধিরসম্প্রজ্ঞাতঃ......বিরামপ্রত্যয়ো নির্ব্বস্তুক আলম্বনীক্রিয়তে, স চার্থশূন্যঃ'......

—ঐ ব্যাসভাষ্য

প্রকাশশীল পরসংবিৎই সকলকে প্রকাশিত করে। প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয়াত্মব বিশ্ব পরপ্রমাতা পরমেশ্বর থেকে অতিরিক্ত নয়, অথচ অতিরিক্ত বলে যে বো হয় তাই হ'ল লীলা।

'অতোঽসৌ পরমেশানঃ স্বাত্মব্যোমন্যনর্গলঃ
ইয়তঃ সৃষ্টিসংহারাড়ম্বরস্য প্রদর্শকঃ ॥' —ঐ, ৩ কারিক

যেহেতু সংবিদ্ ভিন্ন জগতের উপলব্ধি সম্ভব নয়, সেহেতু পরমেশ্বর আপনা স্বাতন্ত্র্যশক্তির বলে আপনার আকাশকল্প স্বরূপে সৃষ্টিস্থিতিলয়কেন্দ্রিক বিশ্ব বৈচিত্র্যকে অবভাসিত করে থাকেন।[১] এরূপ অবভাসের দ্বারা পরমেশ্বরে স্বরূপে কোন নূতনত্ব সংক্রামিত হয় না। স্বরূপের কূটস্থতা বোঝাবা জন্যই অভিনব গুপ্ত তাঁর তন্ত্রালোকের উপরি-উদ্ধৃত শ্লোকে 'ব্যোম শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। সুতরাং বিশ্ব পারমেশ্বরী সংবিদে প্রতিবি ছাড়া আর কিছুই নয়। এস্থলে উপরোক্ত শ্লোকের জয়রথ-কৃত ভা প্রণিধানযোগ্য :

'যথা হি দর্পণাদৌ পরস্পরব্যাবৃত্তাত্মানঃ প্রতিবিম্বিতা আকারবিশেষা ততোঽনতিরিক্তত্বেঽপি অতিরিক্তা ইব ভাসন্তে তদ্বদিহাপীতি।' যেমন আয়না প্রতিবিম্বিত অবয়ব আয়না থেকে অতিরিক্ত না হ'লেও অতিরিক্ত বলে প্রতীত হয়, সেরূপ পারমেশ্বরী সংবিদে অবভাসিত বিশ্ববৈচিত্র্য ঐ সংবিৎ থেকে অভিন্ন হ'লেও ভিন্ন বলে বোধ হয়।

স্বাতন্ত্র্যশক্তির বলেই যে বিশ্ব পারমেশ্বরী সংবিদে প্রতিবিম্বিত, সে-কথ অভিনব গুপ্ত তাঁর তন্ত্রালোক গ্রন্থের তৃতীয় আহ্নিকে স্পষ্টভাষাতেই উল্লে করেছেন :

'ইত্থং বিশ্বমিদং নাথে ভৈরবীয়চিদম্বরে। প্রতিবিম্বমলং স্বচ্ছে ন খল্বন্য প্রসাদতঃ ॥' —৬৫ শ্লো

এই প্রকারে এই বিশ্ব ভৈরবের স্বচ্ছ আকাশকল্প বিভুচৈতন্যে প্রতিবিম্বজনি

১। 'প্রকাশাতিরিক্তস্য বিশ্বস্য ভানাযোগাৎ পরমেশ্বরো হি অনর্গলত্বলক্ষণ-স্বস্বাতন্ত্র্য মাহাত্ম্যাৎ স্বাত্মভিত্তাবেব অনতিরিক্তমপ্যতিরিক্তায়মানম্ ইয়ৎ বিশ্ববৈচিত্র্যং প্রদর্শয়তি ইতি।'
—তন্ত্রালোক : ৩ আহ্নিক—৩ কারিকার জয়রথ-কৃত ভা

।।লিন্য ছাড়া আর কিছুই নয়। অন্য কোন সত্তার আনুকূল্যে এই প্রতিবিম্ব উদ্ভূত হয় নাই। অভিনব গুপ্ত-প্রযুক্ত 'অন্যপ্রসাদতঃ' শব্দের ব্যাখ্যাকালে চাষ্যকার আচার্য্য জয়রথ মন্তব্য করছেন 'অন্যমুখপ্রেক্ষিত্বে হ্যস্য স্বাতন্ত্র্যং হণ্যেতেতিভাবঃ', ভৈরবকে যদি অন্যের সাহায্য নিতে হয় তাহ'লে তাঁর াতন্ত্র্যশক্তির হানি হবে।[১]

এই পূর্ণপরসংবিত্তত্ত্ব শিব বা শক্তি শব্দব্যপদেশ্য নয়। এই তত্ত্ব তন্ত্রগ্রন্থে কাথাও কোথাও কুলশব্দের দ্বারা আখ্যাত হয়েছে।

'যত্রোদিতমিদং চিত্রং বিশ্বং যত্রাস্তমেতি চ।
তৎকুলং বিদ্ধি সর্ব্বজ্ঞ শিবশক্তিবিবর্জ্জিতম্॥'

—তন্ত্রালোক: ৩য় আহ্নিক—৬৭ শ্লোকের জয়রথ-ভাষ্যে উদ্ধৃত শ্লোক

া থেকে এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্ব উদ্ভূত ও যাতে লয়প্রাপ্ত হয়, সেই শিবশক্তি ব্দদ্বয়ের অব্যপদেশ্য পরসংবিত্তত্ত্বকে কুল বলে জানবে।

পরসংবিত্তত্ত্বের স্বাতন্ত্র্যশক্তিকেই অনুত্তরা প্রতিভা, পরা দেবী বলা হয়।[২] এই তত্ত্ব থেকে শিবশক্তি তত্ত্বের উদ্ভব সম্বন্ধে অভিনব গুপ্তের তন্ত্রালোকের তৃতীয় আহ্নিকের ৬৭ শ্লোকের জয়রথ কৃত ভাষ্যে এইরূপ বিশদ্ বিবৃতি পাওয়া যায়:

১। 'স্বাতন্ত্র্যং হি বিমর্শ ইত্যুচ্যতে, স চাস্য মুখ্যঃ স্বভাবঃ, ন হি নির্বিমর্শঃ প্রকাশঃ সম্ভবতি পপদ্যতে বা, অয়মেব হ্যস্য বিশ্বাকারধারিত্বে জড়েভ্যো বিশেষঃ—

যৎ সর্ব্বমামৃশতীতি, যদ্বক্রমনেনৈব অন্যত্র
অন্তর্বিভাতি সকলং জগদাত্মনীহ
যদ্বদ্বিচিত্ররচনা মকুরান্তরালে।
বোধঃ পুনর্নিজবিমর্শনসারবৃত্ত্যা
বিশ্বং পরামৃশতি নো মকুরস্তথা তু॥ ইতি॥'

—তন্ত্রালোক: তৃতীয় আহ্নিক—৬৫ শ্লোকের জয়রথ-কৃত ভাষ্য

২। 'অনন্যাপেক্ষিতা যাস্য বিশ্বাত্মত্বং প্রতি প্রভোঃ।
তাং পরাং প্রতিভাং দেবীং সংগিরন্তে হ্যনুত্তরাম্॥'

—তন্ত্রালোক: ৩য় আহ্নিক—৬৬ শ্লোক

'ইহ খলু পূর্ণঃ শিবশক্ত্যাদিপ্রতিনিয়তব্যপদেশাসহিষ্ণুঃ অনাখ্যঃ পরপরামর্শাত্মা অনুত্তরঃ প্রকাশ এব পরং তত্ত্বং, স এব চ স্বস্বাতন্ত্র্যাৎ বিশ্বমবভাসয়িষুঃ প্রথমং শিবশক্তিরূপতাং স্বাত্মন্যবভাসয়তি, যদাহুঃ—

শিবশক্তি তত্ত্ব

নৌম্যনুত্তরনাথস্য রশ্মিচক্রং মহৎ সদা।
শিবশক্তীতি বিখ্যাতং পরাপরফলপ্রদম্॥'

প্রকাশই পরতত্ত্ব, এই তত্ত্বকে শিব, শক্তি ইত্যাদি শব্দের দ্বারা অভিহিত করা যায় না। এই তত্ত্বই আপন স্বাতন্ত্র্যশক্তির বলে বিশ্বপ্রপঞ্চকে অবভাসিত করার ইচ্ছা হেতু আপন রূপেই শিবশক্তি রূপ প্রথম অবভাসিত করেন। এইরূপ কথিত আছে: অনুত্তরানামক পরাশক্তির নাথ অর্থাৎ ভৈরবের শিবশক্তি নামে প্রসিদ্ধ পরাপরফলদায়ক জ্যোতিশ্চক্রকে আমি সর্ব্বদাই নমস্কার করি।

এই শক্তিতত্ত্ব কৌলিকী শক্তি—অভিনব গুপ্তের ভাষায় 'কৌলিকী সা পরাশক্তিরবিযুক্তো যয়া প্রভুঃ'—তন্ত্রালোক—তৃতীয় আহ্নিক, ৬৭ শ্লোকার্দ্ধ—বিশ্বকে আপূরণ করা যার স্বভাব সেই শক্তি কৌলিকী শক্তি, এই শক্তির সঙ্গে শিবের অচ্ছেদ্য যোগ। কৌলিকী শব্দটির ব্যাখ্যায় আচার্য্য জয়রথ এইরূপ মন্তব্য করছেন: 'কুলে ভবম্ অকুলাত্ম কৌলং তদ্যস্যামস্তস্তাদাত্ম্যেন অস্তীতি কৌলিকী'—অর্থাৎ পূর্ণপরসংবিত্তত্ত্বরূপ কুলতত্ত্ব থেকে উদ্ভূত অকুলস্বভাব শিবতত্ত্বই কৌলতত্ত্ব। এই কৌলতত্ত্ব যে শক্তির ভিতরে তাদাত্ম্যসম্বন্ধে বিদ্যমান, সেই শক্তিই কৌলিকী শক্তি।

যখন এই শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব পরস্পরের প্রতি উন্মুখ হয়, তখনই উভয়ের যামল রূপ আবির্ভূত হয়। এই যামল রূপেই বিশ্বসৃষ্টির সূচনা।[১]

১। 'যদা পুনঃ

ন শিবঃ শক্তিরহিতো ন শক্তিঃ শিববর্জ্জিতা।
যামলং প্রসরং সর্ব্বং... ... ...॥ ইত্যাদি মহাগুরূদিতনীত্যা
অনয়োঃ পরস্পরৌন্মুখ্যাত্মকং যামলং রূপং স্যাৎ, তদা বিশ্বসর্গঃ।'
—তন্ত্রালোক: তৃতীয় আহ্নিক—৬৭ শ্লোকের জয়রথী টীকা

তন্ত্রাচার্য্য অভিনব গুপ্তের ভাষায় :

যামলতত্ত্ব আনন্দশক্তি

'তয়োর্যদ্যামলং রূপং স সংঘট্ট ইতি স্মৃতঃ।
আনন্দশক্তিঃ সৈবোক্তা যতো বিশ্বং বিসৃজ্যতে ॥'

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৬৮ শ্লোক

শিব ও শক্তির যে যামল রূপ, তাকে শিবশক্তির সংঘট্ট অর্থাৎ সম্যক্ চলন বলেই জানবে। এই সংঘট্টই আনন্দশক্তি যা থেকে ইচ্ছাদি বিশ্বপ্রপঞ্চের সৃষ্টি। স্ত্রীপুরুষের স্থূলদেহজ মিলনের ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে, সংঘট্ট থেকেই আনন্দসঞ্চার ও তা হতেই জীবসৃষ্টি। এ পর্য্যায়ে শিবশক্তির পূর্ণরূপ আচার্য্য জয়রথ তাঁর ভাষ্যে নিম্নমতো প্রকাশ করেছেন :

'ইহ শিবস্য শক্তেশ্চ বিশ্বোত্তীর্ণত্বেন বিশ্বময়ত্বেন চ বিচ্ছিন্নং রূপম্, ইদং পুনঃ বিশ্বময়ত্বেঽপি বিশ্বোত্তীর্ণম্, ইতি নিয়তাবচ্ছেদাভাবাৎ পূর্ণ রূপম্।'

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৬৮ শ্লোকের জয়রথী ভাষ্য

শিব বিশ্ব থেকে উত্তীর্ণ, শক্তি বিশ্বময়—সুতরাং উভয়ের রূপগত পার্থক্য রয়েছে। যামলতত্ত্ব কিন্তু বিশ্বময় হ'লেও বিশ্বোত্তীর্ণ, এইজন্য যামলতত্ত্বের রূপ কোন অবচ্ছেদকের অভাবহেতু সদাই পূর্ণ। এইজন্যই এই তত্ত্ব 'পরাপরাৎ' পরং তত্ত্বম্, শিবতত্ত্ব ও শক্তিতত্ত্ব অপেক্ষা পূর্ণতত্ত্ব।

ইচ্ছাশক্তি

শিবশক্তির সংঘট্টে চৈতন্যের প্রাধান্যহেতু পরপ্রমাতার যে সৃজনেচ্ছা রূপ পরামর্শ উদ্ভূত হয়, তাই হ'ল ইচ্ছাশক্তি।[১]

এই ইচ্ছা দুই প্রকারের হতে পারে—ক্ষোভরহিতা ও প্রক্ষুব্ধা। ক্ষোভরহিতা ইচ্ছার বাহ্য ঔন্মুখ্যমাত্র দেখা যায়, এই ইচ্ছা স্রষ্টব্য বস্তুর দূরবর্ত্তী। প্রক্ষুব্ধা ইচ্ছায় স্রষ্টব্য বস্তুর সম্বন্ধ-কামনা-হেতু প্রযত্ন দেখা যায়, এই ইচ্ছা স্রষ্টব্য বস্তুর সমীপবর্ত্তী।[২] শ্রীপ্রত্যভিজ্ঞার প্রাসঙ্গিক শ্লোক আচার্য্য জয়রথ তাঁর ভাষ্যে উৎকলিত করেছেন :

১। 'সংঘট্টেঽস্মিংশ্চিদাত্মত্বাত্তত্প্রত্যবমর্শনম্ ॥ ইচ্ছাশক্তিঃ ...'

—তন্ত্রালোক : ঐ, ৭১-৭২ শ্লোক

২। '...বহিরৌন্মুখ্যমাত্ররূপিণী স্রষ্টব্যানাক্সষিতেচ্ছামাত্ররূপা বা স্যাৎ তদ্বদীবণীয়-বিষয়াক্ষষণয়া প্রক্ষোভাত্মপ্রযত্নরূপতাং শ্রয়ন্তী বহীরূপতয়া ঐশ্বর্য্যং ভজমানা বা ইত্যস্যা দ্বৈধম্'

—তন্ত্রালোক : ঐ, ৭২ শ্লোকের জয়রথী টীকা

'সা কেবলমিচ্ছামাত্ররূপা স্রষ্টব্যস্থ বিপ্রকৃষ্টা।
কাচিৎ পুনঃ প্রযত্নতামাপন্না সংনিকৃষ্টা॥'

—তন্ত্রালোক: ৩য় আহ্নিক—৭২ শ্লোকের জয়রথী ভাষ্য

ইচ্ছাশক্তি কখনো ইচ্ছা ছাড়া আর কিছুই নয়, তখন সে স্রষ্টব্য বস্তু থেকে দূরে। আবার কখনো ইচ্ছাশক্তি চেষ্টার আকার ধারণ করে স্রষ্টব্য বস্তুর কাছাকাছি এগিয়ে যায়।

ইচ্ছাশক্তি প্রক্ষুব্ধা হ'লে অনন্তশক্তিরূপে বাহিরে অবভাসিত হয়। এইরূপ বাহ্য প্রস্ফুরণই প্রক্ষুব্ধা ইচ্ছাশক্তির ঐশ্বর্য্য।[১]

জ্ঞানশক্তির স্বরূপ অভিনব গুপ্ত এইভাবে নির্ণীত করেছেন:

জ্ঞানশক্তি 'স্বাত্মপ্রত্যবমর্শো যঃ প্রাগভূদেকবীরকঃ॥ ৭৩
জ্ঞাতব্যবিশ্বোন্মেষাত্মা জ্ঞানশক্তিতয়াস্থিতঃ॥'

—তন্ত্রালোক: ৩য় আহ্নিক—৭৩-৭৪ শ্লোকার্দ্ধ

ইচ্ছাশক্তির প্রক্ষোভের পূর্ব্বে সংবিত্তত্ত্ব ব্যতীত কোন কিছুই না থাকায়, সংবিন্মাত্র-সীমাবদ্ধ যে একবীরক পরামর্শ, তার দ্বারাই জ্ঞাতব্য বিশ্বের প্রকাশ সম্ভব হয়। এই পরামর্শই জ্ঞানশক্তি।

ইচ্ছাশক্তির মতো জ্ঞানশক্তিও দুই প্রকারের। জ্ঞান থেকে জ্ঞেয়ের আধিক্য না থাকলে জ্ঞানশক্তির এক প্রকার, জ্ঞান থেকে জ্ঞেয়ের আধিক্য থাকলে জ্ঞানশক্তির আর এক প্রকার। পূর্ব্বোক্ত একবীরক পরামর্শরূপ জ্ঞানশক্তিই প্রথম প্রকারের জ্ঞানশক্তি। দ্বিতীয় প্রকার জ্ঞানশক্তির স্বরূপ অভিনব গুপ্ত নিম্নমতো নির্ণীত করেছেন:

'জ্ঞেয়াংশঃ প্রোন্মিষন্ ক্ষোভং যদৈতি বলবত্ত্বতঃ॥ ৭৫
ঊনতাভাসনং সংবিন্মাত্রত্বে জায়তে তদা॥
রূঢ়ং তজ্‌জ্ঞেয়বর্গস্য স্থিতিপ্রারম্ভ উচ্যতে॥ ৭৬

১। 'সৈব প্রক্ষুব্ধরূপা চেৎ ঈশিত্রী সংপ্রজায়তে॥' —তন্ত্রালোক: ৩য় আহ্নিক—৭২ শ্লোকার্দ্ধ
'এতদেব হি অস্যা ঐশ্বর্য্যং—যৎ তত্তদনন্তশক্তিরূপতয়া বহিরবভাসনমিতি'
—ঐ জয়রথী টীকা

রূঢ়িরেষা বিবোধাব্ধেশ্চিত্রাকারপরিগ্রহঃ।
ইদং তদ্বীজসন্দর্ভবীজং চিন্বন্তি যোগিনঃ॥' ৭৭

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৭৫ শ্লোকার্দ্ধ, ৭৬ ও ৭৭ শ্লোক

যখন জ্ঞানাংশের চেয়ে জ্ঞেয়াংশ অধিকতর প্রস্ফুট হয়ে বাহ্যবস্তু ও আন্তরবস্তু অর্থাৎ সুখদুঃখাদির আকারে আবির্ভূত হয়, তখন জ্ঞেয়াংশের আধিক্যহেতু জ্ঞানের জ্ঞানমাত্ররূপ অংশে অপূর্ণত্বের অনুভূতি হয় অর্থাৎ জ্ঞানাংশকে সঙ্কুচিত বলে মনে হয়। জ্ঞানাংশের এই সঙ্কোচানুভূতিতেই বাহ্যবস্তু ও আন্তরবস্তুর (সুখদুঃখাদির) স্থিতির সূচনা।[১] জ্ঞানাংশের অপূর্ণত্ববোধের সূত্রপাতই চিৎসমুদ্রের বিচিত্ররূপপরিগ্রহ। এই অপূর্ণত্ববোধকে আবার যোগীরা ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি শক্তিগত স্থূলভেদের উদ্বোধক বলে জেনে থাকেন।

ক্রিয়াশক্তির স্বরূপ বুঝতে গেলে প্রথমে মাহেশ্বরী সংবিদের জড় বস্তু থেকে বৈলক্ষণ্য কোথায় তা বুঝে নিতে হবে। আচার্য্য অভিনব গুপ্তের ভাষায় সংবিন্নাথ 'অনন্তশক্তিবৈচিত্র্যলয়োদয়কলেশ্বরঃ', অসীম বিচিত্র শক্তিসমূহের আবির্ভাব ও তিরোভাবের 'কলনে' সমর্থ। 'কলন' শব্দের ব্যাখ্যা জয়রথ তাঁর ভাষ্যে করেছেন : 'কলনং স্বাত্মনো ভেদেন ক্ষেপঃ', আপন স্বরূপ থেকে ভিন্নভাবে অবভাসিত করাই কলন। সংবিত্তত্ত্ব আপন স্বরূপ থেকে শক্তিসমূহের উদ্ভব ও আপন স্বরূপে শক্তিসমূহের বিলয়, এইরূপ ব্যাপার অবভাসিত করে।

ক্রিয়াশক্তি

এই হেতু নিয়ন্ত্রিত কোন রূপের অভাবে সংবিত্তত্ত্ব অসীম। এই অসীমত্বই সংবিত্তত্ত্বকে জড় বস্তু থেকে পৃথক করে। জড়ের লক্ষণ হ'ল অভিনব গুপ্তের ভাষায়—

১। 'সংবিন্মাত্রোন্নতাভাসনং, রূঢ়ং জাতপ্ররোহং সৎ, তত্তন্নীলসুখাদ্যাত্মনো জ্ঞেয়বর্গস্য স্থিতেঃ প্রারম্ভ উচ্যতে, ন পুনঃ সাক্ষাৎস্থিতিরেব—তস্যাঃ ক্রিয়াশক্তৌ ভাবাৎ, কো নাম অস্যাঃ প্ররোহঃ? ইত্যাহ 'রূঢ়িরেষেত্যাদি' অনেন জ্ঞানাত্তিরিক্তং ন কিঞ্চিন্নাম জ্ঞেয়মস্তি অপি তু তদেব তত্তদ্ভাসাত্মনা স্ফুরতি, ইতি সূচিতম্। তৎ—তস্মাৎ বোধস্যৈব চিত্রাকারধারিত্বাৎ প্রতোরিদমেব ব্যাখ্যাতং সংবিন্মাত্রোন্নত্বং ষষ্ঠং চ ভেদসন্দর্ভস্য কারণত্বেন, যোগিনঃ—ন অযোগিনঃ, তেষাং ক্রিয়াশক্ত্যাদ্যস্থূলভেদচেতয়িতৃত্বাৎ, চিন্বন্তি জানন্তীত্যর্থঃ।'

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—৭৬ শ্লোকার্দ্ধ ও ৭৭ শ্লোক, জয়রথী টীকা

'পরিচ্ছিন্নপ্রকাশত্বং জড়স্য কিল লক্ষণম্ ॥ ১০১
জড়াৎ বিলক্ষণো বোধো যতো ন পরিমীয়তে ॥'

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—১০১-১০২ শ্লোকা

যার প্রকাশ পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ যে অন্যের দ্বারা প্রমীয়মাণ হয় সেই জড় বোধ বা সংবিৎ যে কাহারো দ্বারা প্রমীয়মাণ হয় না, এইখানেই জড় থেকে বোধ বা সংবিদের তফাৎ। জড় বস্তুর প্রমাণস্থলে এরূপ সীমিত বোধ জন্মে—এই বস্তু এই স্থানে দেখা যাচ্ছে; কিন্তু পরসংবিত্তত্ত্ব এরূপ সীমিত বোধের বিষয়বস্তু নয়। এক ও অদ্বিতীয় পরসংবিৎ বাহ্যবস্তু সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নানা আকারে পরিস্ফুরিত হয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই এই আকারের অবভাসগুলি এক-একটি বিশেষ বিশেষ সংজ্ঞায় অভিহিত হয়ে থাকে। নানাভাবে নিজেকে অবভাসিত করে তোলাই মাহেশ্বরী সংবিদের বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই তার জড় বৈলক্ষণ্য।[১]

মাহেশ্বরী সংবিদ্ থেকে উল্লসনশীল শক্তিনিচয় পরস্পর লোলীভূত হয়ে

১। 'অস্থাস্যদেকরূপেণ বপুষা চেন্মহেশ্বর ॥ ১০০
মহেশ্বরত্বং সংবিত্ত্বং তদত্যক্ষ্যদ্ঘটাদিবৎ—'

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—১০০-১০১ শ্লোকা

"যদি নাম মহেশ্বরঃ প্রতিনিয়তেন কেনচিৎ রূপেণ অবতিষ্ঠেত, তদাস্য ঘটাদিস্যায়ে মাহেশ্বর্য্যং সংবিদ্রূপত্বং চ ন স্যাৎ, এতদেব হি অস্য মাহেশ্বর্য্যং সংবিদ্রূপত্বং চ য তত্তদনিয়তবাচ্যবাচকাত্মনা পরিস্ফুরেৎ ইতি, তথাহি—'একমেবেদং সংবিদ্রূপং হর্ষবিষাদাদ্য নেকাকারবিবর্ত্তং পশ্যামঃ তত্র যথেষ্টং সংজ্ঞা ক্রিয়ন্তাম্' ইত্যাদ্যুক্তযুক্ত্যা সংবিৎ তাবদনেকাকার তয়া পরিস্ফুরতি, ইতি নাস্ত্যত্র বিবাদঃ, না চাস্যাঃ তত্তদাকারতয়া পরিস্ফুরণে 'তস্যাতিরেকান তিরেকবিকল্পোপহতত্বাৎ' অবিদ্যাদি নিমিত্তং কিং তু স্ব এব স্বভাবো যঃ 'স্বাতন্ত্র্যম্' ইতি 'মাহেশ্বর্য্যম্' ইতি চ সর্ব্বত্রোদ্ঘোষ্যতে, তৎপ্রতিনিয়তেঽস্য স্বরূপে প্রকাশমানে 'মাহেশ্বর্য্য সংবিদ্রূপত্বং চ' ন স্যাৎ, ইতি জাড্যমেবাপতেৎ, জড় এব কি ঘটাদিঃ 'ইদমিদানীমত্র ইত্যেবম্ আত্মনিয়তাবভাসো ভবেৎ, ন পরঃ প্রকাশঃ ॥

এতদেব হি তস্য জড়াৎ বৈলক্ষণ্যং—যৎ স্বপ্রকাশত্বাৎ অন্যেন কেনচিৎ ন পরিচ্ছিদ্যতে অন্যপ্রমীয়মাণত্বমেব হি পরিচ্ছিন্নপ্রকাশত্বং যন্নাম সর্ব্বত্রৈব জড়স্য লক্ষণমুচ্যতে।"

—ঐ জয়রথ-কৃত ভাষ্য

গ্রাহ্যগ্রাহক গ্রহণ অর্থাৎ প্রমেয়-প্রমাতা-প্রমাণরূপে পরিস্ফুরিত হয়।[১] শক্তি-নিচয়ের এইরূপ বৈচিত্র্য-পরিস্ফুরণই ক্রিয়াশক্তির স্বরূপ।

'স্বাত্মসংঘট্টবৈচিত্র্যং শক্তীনাং যৎ পরস্পরম্ ॥ ১০৩
এতদেব পরং প্রাহুঃ ক্রিয়াশক্তেঃ স্ফুটং বপুঃ ॥'

—তন্ত্রালোক: ৩য় আহ্নিক—১০৩-১০৪ শ্লোকার্দ্ধ

শক্তিসমূহের পরস্পরলোলীভাবে যে বৈচিত্র্যস্ফুরণ তাতেই ক্রিয়াশক্তির স্বরূপ সুস্পষ্ট।

অতএব তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, ইচ্ছাশক্তিতে বস্তুসমূহের উৎপত্তি, জ্ঞানশক্তিতে তার অভিব্যক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিতে তার বাহ্যরূপে পরিস্ফুরণ। পরসংবিত্তত্ত্বে সমস্ত বস্তুই সংবিদাকারে বিদ্যমান—ইচ্ছা, জ্ঞান ও ক্রিয়া এই শক্তিত্রয়ীর দ্বারাই বস্তুসমূহের যথাক্রমে উৎপত্তি, অভিব্যক্তি ও বাহ্যরূপে পরিস্ফুরণ সম্ভব হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে শক্তিদর্শনের বীজ, যোনি ও ক্ষোভ, এই তিনটি পারিভাষিক শব্দের তাৎপর্য্য নির্ণয় করা প্রয়োজন। বীজ ও যোনি এই দুটি শব্দের অর্থ অভিনব গুপ্ত নিম্নমতো নির্দ্ধারিত করেছেন: প্রক্ষোভকত্বং বীজত্বং ক্ষোভাধারশ্চ যোনিতা, যা বিশেষভাবে ক্ষোভক তাই বীজ এবং সেই ক্ষোভের ধারক যা তাই যোনি।

সংবিত্তত্ত্ব ক্ষোভক—

'ক্ষোভকং সংবিদো রূপং ক্ষুভ্যতি ক্ষোভয়ত্যপি ॥' ৮২

—তন্ত্রালোক: ৩য় আহ্নিক—৮২ শ্লোক

সংবিৎ ক্ষোভক, সংবিৎ ক্ষুব্ধ হয় ও অপরকে ক্ষুব্ধ করে। সংবিত্তত্ত্ব থেকে মূলতঃ অভিন্ন প্রমেয়বস্তুকে সংবিত্তত্ত্ব থেকে ভিন্নভাবে পরিস্ফুরিত করার জন্য

১। 'তেন বোধমহাসিন্ধোরুল্লাসিন্যঃ স্বশক্তয়ঃ ॥ ১০২
আশ্রয়ন্ত্যূর্মিয় ইব স্বাত্মসংঘট্টচিত্রতাম্ ॥'

—তন্ত্রালোক: তৃতীয় আহ্নিক—১০২-১০৩ শ্লোকার্দ্ধ

'স্বাঃ আত্মভূতাঃ ইচ্ছাদ্যাঃ শক্তয়ঃ স্বাত্মসংঘট্টেন—পরস্পরলোলীভাবেন, চিত্রতামাশ্রয়ন্তি—তত্তদ্‌গ্রাহ্যগ্রাহকাত্মনা তত্তৎপরামর্শরূপতয়া চ পরিস্ফুরন্তি, ইত্যর্থঃ ॥' ১০২

—ঐ জয়রথ-কৃত ভাষ্য

সংবিত্তত্ত্বের যে উদ্যোগ তাই হ'ল ক্ষোভ। প্রমেয়বস্তুকে বাহ্যরূপে অবভাসিত করে তোলাই সংবিত্তত্ত্ব-কৃত অপরের ক্ষোভনা।[১]

এইজন্যই সংবিত্তত্ত্বই বীজ। ইচ্ছা, জ্ঞান, ক্রিয়া ইত্যাদি বিশেষরূপে অনবচ্ছিন্ন অবশ্যজ্ঞাতব্য মাহেশ্বরী সংবিৎই শক্তিদর্শনের পারিভাষিক অর্থে বীজ।[২]

যাকে আশ্রয় করে পরপ্রমাতার ইচ্ছা কৃতার্থ হয়, ক্ষোভের আধার সেই বাহ্যরূপে অবভাসিত প্রমেয়বস্তুই যোনি।[৩]

শাক্ত কবি মাহেশ্বরীর ইচ্ছাশক্তির এই দুর্লঙ্ঘ্যতা অনুভব করে তার বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণ সামর্থ্যের কথার উল্লেখ করেছেন তাঁর পদে :

"সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।
তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লংঘাও গিরি,
কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব পদ, কারে কর অধোগামী॥
যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি,
তুমি যন্ত্র, তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারের সার তুমি॥"

—রামদুলাল নন্দী দেওয়ান : ক. বি. শা. প.—ইচ্ছাময়ী মা

কিন্তু স্নেহের দাবি নিয়ে কবি তাঁর ক্ষুদ্র ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন করতেও কুণ্ঠিত হন নাই :

১। 'ক্ষোভঃ স্যাৎ জ্ঞেয়ধর্ম্মত্বং ক্ষোভণা তদ্বহিষ্কৃতিঃ।
অন্তঃস্থবিশ্বাভিন্নৈকবীজাংশবিসিসৃক্ষুতা॥ ৮৩
ক্ষোভোঽতদিচ্ছে তদ্বেচ্ছাভাসনং ক্ষোভণাং বিদুঃ।
... ...
তস্য বীজস্য সৈবোক্তা বিসিসৃক্ষা য উদ্ভবঃ।
যতো গ্রাহ্যমিদং ভাস্যদভিন্নকল্পং চিদাত্মনঃ॥ ৮৬
এষ ক্ষোভঃ ক্ষোভণা তু তৃষ্ণীভূতাস্যমাতৃগম্।
হঠাদুদোদাসীন্যাংশচ্যাবনং সংবিদো বলাৎ॥' ৮৭ —তন্ত্রালোক

২। 'সংবিদামীষণাদীনামনুদ্‌ভিন্নবিশেষকম্॥ ৮৫
যজ্‌ জ্ঞেয়মাত্রং তদ্বীজং যদ্যোগাদ্বীজতা স্মরে॥'

৩। 'যদৈক্যাপত্তিমাসাদ্য তদিচ্ছা কৃতিনী ভবেৎ॥ ৮৪
ক্ষোভাধারমিমং প্রাহুঃ শ্রীসোমানন্দপুত্রকাঃ॥' ৮৭

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—৮২ শ্লোকার্দ্ধ, ৮৩—৮৭ শ্লোক

'তোমার ইচ্ছা জগৎ কল্প, আমার ইচ্ছা অতি অল্প,
শ্রীচরণে দিব তল্প, জীবনের শেষ বাসরে ॥'

—রসিকচন্দ্র : ঐ

জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি যে জগজ্জননীরই লীলা, তা সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁর পদেই প্রকাশ করেছেন :

"তোমার কে মা বুঝবে লীলে।
তুমি কি নিলে কি ফিরিয়ে দিলে ॥
তুমি দিয়ে নিচ্ছো তুমি, বাছ রাখ না সাঁজ সকালে।
তোমার অসীম কার্য্য অনিবার্য্য, মাপাও যেমন যার কপালে ॥
তুমি যেমন দেখাও তেমনি দেখি, জলেই তুমি ভাসাও শিলে।
তোমার অভিসন্ধি পদে বন্দী, ভোলানাথই যাচ্ছে ভুলে ॥
তোমার জারিজুরি আমার কাছে, খাটবে না মা কোন কালে।
ওসব ইন্দ্রজালের মন্ত্র জানে, রামপ্রসাদ যে তোমার ছেলে ॥"

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কবি রামপ্রসাদ—১৩২ পদ

তান্ত্রিক সিদ্ধান্তানুযায়ী ভৈরবীয় ক্রিয়াশক্তিই কাল। অভিনব গুপ্তের ভাষায় :

কালতত্ত্ব 'এষ কালো হি দেবস্য বিশ্বাভাসনকারিণী ॥ ৩৮
ক্রিয়াশক্তিঃ সমস্তানাং তত্ত্বানাং চ পরং বপুঃ ॥'

—তন্ত্রালোক : ৬ আহ্নিক—৩৮-৩৯ শ্লোকার্দ্ধ

ভৈরবের যে ক্রিয়াশক্তির বলে ভৈরবীয় চৈতন্য থেকে অভিন্ন হ'লেও বিশ্ব ভিন্নাকারে অবভাসিত হয়, সেই ক্রিয়াশক্তিই কাল, এই কালই সমস্ত তত্ত্বের উৎপত্তিস্থল।

এই প্রসঙ্গে উৎপলদেবের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য :

'ক্রিয়াবৈচিত্র্যনির্ভাসাৎ কালক্রমমপীশ্বর ॥' ৫

—ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা : ৫ কারিকা—১ অধ্যায়, ১ আহ্নিক[১]

১। যেমন বিচিত্র ক্রিয়ার অবভাসনের দ্বারা কালক্রমের অবভাস, তেমনি বিচিত্র মূর্ত্তির অবভাসনের দ্বারা দেশক্রমের অবভাস।

ভৈরব বিচিত্র ক্রিয়ার অবভাসনের দ্বারা কালক্রমকে অবভাসিত করে থাকেন। এই অংশের বিমর্শিনী টীকায় আচার্য্য অভিনব গুপ্ত বলছেন :

'যদা তু গাঢ়প্রত্যভিজ্ঞাপ্রকাশবলাৎ তদেব ইদং হস্তরূপম্ ইতি প্রতিপত্তৌ মূর্ত্তের্ন ভেদঃ, অথ চ অন্যান্যরূপত্বং ভাতি তদা একস্মিন স্বরূপে যদন্যৎ অন্যৎ রূপং তদ্বিরোধবশাৎ অসহ্ভবৎ ক্রিয়া ইতি উচ্যতে, তস্যা যৎ বৈচিত্র্যং পরিমিতা-পরিমিতরূপতাত্মকং তদেকানুসন্ধানেন ফলসিদ্ধ্যাদিনিবন্ধনবশাৎ যথারুচি চর্চিতেন নির্ভাসয়ন কালরূপমেব ভাসয়তি'

কোন বস্তু ক্রিয়াশীল হ'লে তার স্বরূপ অবিকৃত থাকলেও তার চলমান অবস্থায় অন্য অন্য বস্তুরূপ দেখা যায়। একই বস্তুতে এই রূপসমূহের সহাবস্থান সম্ভব না হওয়ায় এই ভিন্ন ভিন্ন রূপসমূহই ক্রিয়াপদবাচ্য হয়। এই ভিন্ন ভিন্ন রূপাত্মক ক্রিয়ার অনন্ত বৈচিত্র্য। তার মধ্যে কতকগুলির ইয়ত্তা করা যায়, কতকগুলির ইয়ত্তা করা যায় না। ফলসিদ্ধির প্রয়োজনে এই ভিন্ন ভিন্ন রূপগুলি ঐক্যবদ্ধ সুসংহত ক্রিয়ার আকার ধারণ করে কালের রূপটিকেই অবভাসিত করে তোলে।

কালের সংজ্ঞা আচার্য্য অভিনব গুপ্ত নিম্নমতো নির্ণীত করেছেন :

'অধ্বনঃ কলনং যৎ তৎ ক্রমাক্রমতয়া স্থিতম্।
ক্রমাক্রমৌ হি চিত্রৈককলনা ভাবগোচরে ॥'

—তন্ত্রালোক : ৬ আহ্নিক—৬ শ্লোক

ভাবসমূহ ক্রম এবং অক্রমেই পরিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। এই পরিচ্ছিন্ন হওয়াই ক্রমাক্রমাত্মক কাল।

'মূর্ত্তিবৈচিত্র্যতো দেশক্রমমাভাসয়ত্যসৌ।' ৫

ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা : ২ অধ্যায়—১ আহ্নিক, ৫ কারিকা

'পদার্থস্য স্বং রূপং মূর্ত্তিঃ, তস্যা যৎ বৈচিত্র্যং বিভেদঃ তদ্যথা গৃহমিতি অন্যৎ স্বরূপং, প্রাঙ্গণমিতি অন্যৎ, বিপণিরিতি অন্যৎ, দেবকুলমিতি অপরম্, উদ্যানমিতি অন্যৎ, অরণ্যমিতি তদিতরৎ তস্মাৎ বৈচিত্র্যাৎ আভাস্যমানাৎ দেশরূপো দূরাদূরবিততত্বাবিততত্বাদিঃ ক্রমো ভগবতা অবভাস্যতে' —আচার্য্য অভিনব গুপ্ত-কৃত বিমর্শিনী টীকা

'তত্র ক্রিয়াভাসনং যৎ সোঽধ্বা কালাহ্ব উচ্যতে।
যস্তু মূর্ত্ত্যবভাসাংশঃ স দেশাধ্বা নিগদ্যতে ॥'

—তন্ত্রালোক : ৬ আহ্নিক—৩৪-৩৫ শ্লোকার্দ্ধ

বাস্তব অনুভূতিতে দেখা যায় যে, ভাবসমূহ দুইভাবে অবভাসিত হয়ে থাকে—ক্রমে ও অক্রমে। কার্য্যকারণস্থলে ভাবদ্বয়ের ক্রমিক অবভাস দেখা যায়। চিত্র থেকে যখন বস্তুজ্ঞান হয়, তখন বস্তুর অংশসমূহের অক্রমে অর্থাৎ যুগপৎ অবভাস হয়ে থাকে। ভাবসমূহের এই যে কলন বা পরিচ্ছিত্তি তাই হ'ল ক্রমাক্রমাত্মা কাল।[১]

এখন স্বভাবতঃই এই প্রশ্ন উঠে: এই জগৎ চৈতন্যলগ্ন হয়েই অবভাসিত হয়, চৈতন্য বাদ দিয়ে জগতের প্রকাশই সম্ভব নয়।[২] চৈতন্য নিত্য, এইজন্য চৈতন্যে কালযোগ সম্ভব নয়, সুতরাং চৈতন্যে অনুষক্ত জগৎ কিভাবে কালের দ্বারা কলিত হতে পারে?

এইজন্য চৈতন্যে ক্রমাক্রমাত্মা কালের অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হবে। অভিনব গুপ্ত বলেছেন:

'ক্রমাক্রমাত্মা কালশ্চঃ পরঃ সংবিদি বর্ত্ততে।'

—তন্ত্রালোক: ৬ আহ্নিক—৭ শ্লোক

ক্রমাক্রমাত্মক কাল চৈতন্যে বিদ্যমান।

কিন্তু সংবিত্তত্ত্বে যদি ক্রমাক্রমাত্মক কাল বিদ্যমান থাকে, তাহ'লে সংবিৎ ক্ষণিকবিজ্ঞানসন্ততিতে পরিণত হবে এবং এইভাবে বৌদ্ধ দর্শনের আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যে যে আপত্তিগুলি প্রযোজ্য, সেই সেই আপত্তিগুলিও এই সংবিত্তত্ত্ব সম্বন্ধে প্রযোজ্য হবে। তাছাড়া, সংবিত্তত্ত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে, সংবিত্তত্ত্ব 'ক্রমাক্রমকথাতীতম্' অর্থাৎ ক্রম অক্রম এই দুটি কথা সংবিত্তত্ত্ব সম্বন্ধে খাটে না।

তাই তন্ত্রাচার্য্যদের সিদ্ধান্ত হ'ল:

কালশক্তি 'কালী নাম পরা শক্তিঃ সৈব দেবস্য গীয়তে॥' ৭

—তন্ত্রালোক: ৬ আহ্নিক—৭ শ্লোকার্দ্ধ

সংবিত্তত্ত্বের যে ক্রমাক্রমাত্মক কালের সঙ্গে যোগ, তাই হ'ল সংবিত্তত্ত্বের

১। 'ইহ দ্বিধৈব ভাবানামবভাসঃ ক্রমেণাক্রমেণ চ তত্র ক্রমেণ যথা কার্য্যকারণাদৌ, অক্রমেণ যথা চিত্রজ্ঞানাদৌ।......তস্যা নাম ভাবানামেবং কলনা পরিচ্ছিত্তিঃ স এব ক্রমাক্রমাত্মা কাল ইতি॥' ৬ —তন্ত্রালোক: ৬ আহ্নিক—৬ শ্লোকের জয়রথ-কৃত ভাষ্য

২। 'অথবা সমস্ত এবায়ং চিন্মাত্রে সংপ্রতিষ্ঠিতঃ।
যৎ তত্র নহি বিশ্রান্তং তন্নভঃকুসুমায়তে॥' —তন্ত্রালোক: ৮ আহ্নিক—৩ কারিকা

কালীনামক পরা শক্তি। তাৎপর্য্য হ'ল: জগৎকে ক্রমাক্রমাত্মক কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করার সামর্থ্যই হ'ল সংবিত্তত্ত্বের কালী নামে অভিহিত শক্তি। আসলে সংবিত্তত্ত্বে কোন ক্রমও নাই, কোন অক্রমও নাই। এক্ষেত্রে অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। অগ্নির দাহিকা শক্তি সমস্ত পদার্থকে দগ্ধ করে, কিন্তু অগ্নিকে দগ্ধ করে না। সেইরূপ সংবিত্তত্ত্বের জগৎকে ক্রমাক্রমাত্মক কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করার সামর্থ্য জগৎকেই ক্রমাক্রমাত্মক কালে পরিচ্ছিন্ন করে, সংবিত্তত্ত্বকে কিন্তু ক্রমাক্রমাত্মক কালে পরিচ্ছিন্ন করে না।[১]

এই কালশক্তিকেই লক্ষ্য করে সাধক কবি রামপ্রসাদ পদ রচনা করে তাঁর মনকে উপদেশ দিয়েছেন:

"মা কি শুধুই শিবের সতী?
যারে কালের কাল করে প্রণতি॥
ষট্‌চক্রে চক্র করি কমলে করে বসতি।
সে সে সর্ব্বদলের দলপতি,
সহস্রদলে করে স্থিতি॥
ন্যাংটা বেশে শত্রু নাশে, মহাকাল হৃদয়ে স্থিতি।
বল দেখি মন, সে বা কেমন, নাথের বুকে মারে লাথি?
প্রসাদ বলে, মায়ের লীলা সকলই জেনো ডাকাতি।
ওরে সাবধানে মন কর যতন, হবে তোমার শুদ্ধমতি॥"

—ক. বি. শা. প.: লীলাময়ী মা

১। 'যন্নাম পরস্য প্রকাশস্য কালেন যোগঃ সাস্য শক্তিঃ স্বেচ্ছাবভাসিতস্য প্রমাতৃ-প্রমেয়াত্মাত্মনো জগতস্তত্তদ্রূপতয়া কলনে সামর্থ্যং, ন পুনঃ স্বাত্মনি কশ্চিৎ অক্রমঃ ক্রমো বা, ইতি, ন হ্যগ্নেঃ দাহশক্তিযোগে স্বাত্মনি প্লোটাদ্যাবির্ভাবঃ॥'

—তন্ত্রালোক: ৬ আহ্নিক—৭ শ্লোকের জয়রথ-ভাষ্য

বাক্যপদীয়ে এই কালশক্তিই স্বীকৃত হয়েছে: 'অধ্যাহিতাঃ কলা যস্য কালশক্তিমুপাশ্রিতাঃ। জন্মাদয়ো বিকারাঃ ষড়্‌ভাবভেদস্য যোনয়ঃ॥' —বাক্যপদীয় তৃতীয় কারিকা। নারায়ণ দত্ত শর্ম্মাত্রিপাঠী তাঁর টীকায় মন্তব্য করেছেন: 'অত্রেদং তত্ত্বং, স্বরূপতো নিরবয়বস্য সর্ব্বধর্ম্মাতীতস্য ব্রহ্মণঃ কালাখ্যাং শক্তিমাশ্রিত্য জন্মাদিরূপাঃ শক্তয়ঃ কৃৎস্নস্য জগতোঽবস্থান্তর-প্রতীতিহেতবো ভবন্তি তত এব জন্মাদিগতং পৌর্ব্বাপর্য্যং ভগবতঃ কালশক্তিঃ ঘটাদিষু আরোপয়তি ইতি শম।'

অন্য একটি পদে ইঙ্গিতে এই ব্রহ্মশক্তির কথাই উল্লেখ করেছেন :

'মন, কি কর তত্ত্ব তারে।
ওরে উন্মত্ত, আঁধার ঘরে॥
সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে?
মন, অগ্রে শশী বশীভূত কর তোমার শক্তিসারে।
ওরে কোঠার ভিতর চোর কুঠরী, ভোর হলে সে লুকাবে রে॥
ষড়্‌দর্শনে দর্শন পেলেম না, আগম নিগম তন্ত্রসারে।
সে যে ভক্তিরসের রসিক, সদানন্দে বিরাজ করে পুরে॥
সে ভাব লোভে পরম যোগী যোগ করে যুগ যুগান্তরে।
হলে ভাবের উদয় লয় সে যেমন লোহাকে চুম্বকে ধরে॥
প্রসাদ বলে, মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যারে।
সেটা চাতরে কি ভাঙ্গবো হাঁড়ি, বুঝরে মন ঠারে ঠোরে॥'

—ক. বি. শা. প. : মনোদীক্ষা—রামপ্রসাদ সেন

কালশক্তি জগৎকে যেরূপ ক্রমাক্রমাত্মক কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করে, সেরূপ প্রমেয়-প্রমাণ-প্রমাতা-প্রমা এই রকম ভেদের দ্বারাও পরিচ্ছিন্ন করে থাকে।

কলন

আসলে প্রমেয়, প্রমাণ, প্রমাতা, প্রমা—এইগুলি সংবিৎ ছাড়া আর কিছুই নয়। সংবিত্তত্ত্বের এই রূপবৈচিত্র্যকে অবভাসিত করে তোলার সামর্থ্যই হ'ল পরা পরমেশ্বরী অর্থাৎ সর্ব্বোত্তমা শক্তি।

তান্ত্রিক সিদ্ধান্তানুযায়ী এই প্রমেয়-প্রমাণ-প্রমাতা-প্রমাত্মক পরিচ্ছেদ বা কলন পাঁচ প্রকারের হতে পারে; যথা—ক্ষেপ, জ্ঞান, সংখ্যান, গতি ও নাদ।

এই পাঁচ প্রকার কলনের অর্থ তন্ত্রাচার্য্য অভিনব গুপ্ত নিম্নমতো নির্ণীত করেছেন :

'স্বাত্মনো ভেদং ক্ষেপো ভেদিতস্যাবিকল্পনম্।
জ্ঞানং বিকল্পঃ সংখ্যানমন্যতো ব্যতিভেদনাৎ॥ ১৭৪
গতিঃ স্বরূপারোহিত্বং প্রতিবিম্ববদেব যৎ।
নাদঃ স্বাত্মপরামর্শশেষতা তদ্বিলোপনাৎ॥' ১৭৫

—তন্ত্রালোক : ৪ আহ্নিক—১৭৪—১৭৫ শ্লোক

কলন এই শব্দটি চারিটি ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। এই চারিটি ধাতু হ'ল—

কল কিল বিল ক্ষেপে, কল গতৌ, কল সংখ্যানে এবং কল শব্দে। যেহেতু গতি শব্দ জ্ঞানকে বোঝায়, প্রাপ্তিকেও বোঝায়, সেই হেতু এই চারিটি ধাতু থেকে আচার্য্য অভিনব গুপ্ত বর্ণিত ঐ পাঁচ প্রকার অর্থ পাওয়া যায়।

সংবিত্তত্ত্বের প্রমেয়-প্রমাণ-প্রমাতা-প্রমাত্মক ব্যাহৃভেদাকারে আপনাকে অবভাসিত করার নামই ক্ষেপ। এরূপে অবভাসিত সংবিত্তত্ত্বের আপন স্বরূপ থেকে প্রচ্যুতির অভাবই জ্ঞান। অন্য রূপ থেকে পৃথকভাবে জানার নামই সংখ্যান, এটি বিকল্প। যেমন প্রমেয়কে প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমা থেকে আলাদা বলে জ্ঞান হয়। গতি বলতে এখানে প্রাপ্তিকেই বুঝতে হবে, দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণ থেকে অভিন্ন হ'লেও দর্পণ থেকে ভিন্ন বলেই অবভাসিত হয়, তেমনি প্রমেয়-প্রমাণ-প্রমতা-প্রমাত্মক প্রপঞ্চ সংবিত্তত্ত্ব থেকে অভিন্ন হ'লেও ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই প্রতীয়মান হয়। প্রমেয়, প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমা যে প্রকৃত প্রস্তাবে একই সংবিত্তত্ত্ব, এই জ্ঞানের বিলোপই নাদ।[১]

এই পাঁচ প্রকার কলনের কর্ত্রী পরা দেবীই কালী।[২] আচার্য্য অভিব গুপ্তের ভাষায়:

১। 'কল কিল বিল ক্ষেপে কল গতৌ কল সংখ্যানে কল শব্দে ইতি ধাতুচতুষ্টয়স্য পঞ্চধায়মর্থো—যদ্‌গতির্জ্ঞানে প্রাপ্তৌ চ বর্ত্ততে ইতি—এতদেব ক্রমেণ ব্যাচষ্টে ক্রমাদিত্যাদিনা, ভেদনমিতি—বহিরুল্লাসনম্, অবিকল্পনমিতি—স্বাত্মাভেদেন পরামর্শঃ, ভেদিতস্যৈব প্রমাতৃ-প্রমেয়াদেরর্থস্য পরস্পরাপোহনাৎ 'ইদমিদং নানিদম্' ইতি প্রতিনিয়ততয়া অবস্থাপনাৎ সংখ্যানং বিকল্পঃ, গতিশ্চাত্র গত্যুপসর্জ্জনা প্রাপ্তিস্তেন ভেদিতোঽর্থঃ—সংবিল্লক্ষণং স্বরূপমারোহতি প্রাপ্নোতীতি স্বরূপারোহী, তস্য ভাবস্তত্ত্বম্, ন চৈতৎ কট ইব দেবদত্তস্য ইত্যুক্তং প্রতিবিম্ববৎ ইতি, প্রতিবিম্বস্য হি তদব্যতিরিক্তত্বেঽপি তদ্ব্যতিরিক্ততয়ৈবাবভাসো ভবেদিতি ভাবঃ, স্বাত্মপরামর্শশেষতেতি নদনমাত্ররূপত্বাৎ, তদ্বিলোপনাদিতি—তেষামবিকল্পজ্ঞানাদীনাং বিলোপনাৎ, অপহস্তনাদিত্যর্থঃ, এতদ্ধি ভিন্নস্যৈব ভবেৎ'

—তন্ত্রালোক: চতুর্থ আহ্নিক, ১৭৪—১৭৫ শ্লোকদ্বয়ের জয়রথ-ভাষ্য

২। 'তব রূপং মহাকালো জগৎসংহারকারকঃ।
মহাসংহারসময়ে কালঃ সর্ব্বং গ্রসিষ্যতি ॥ ৩০
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং মহাকালঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
মহাকালস্য কলনাৎ ত্বমাদ্যা কালিকা পরা ॥ ৩১
কালসংগ্রসনাৎ কালী সর্ব্বেষামাদিরূপিণী।
কালত্বাদাদিভূতত্বাদাদ্যা কালীতি গীয়তে ॥ ৩২

'ইতি পঞ্চ বিধামেনাং কলনাং কুর্ব্বতী পরা।
দেবী কালী তথা কালকর্ষিণী চেতি কথ্যতে ॥' ১৭৬

—তন্ত্রালোক : ৪ আহ্নিক—১৭৬ শ্লোক

পুর্ব্ব শ্লোক-বর্ণিত পাঁচ প্রকার কলন যিনি করেন সেই পরা দেবীই কালী ও কালকর্ষিণী সংজ্ঞায় অভিহিত হয়ে থাকেন।[১]

এই কলনকর্ত্রী কালশক্তি অরূপা অথচ সরূপা। শাক্ত কবির ভাষায় :

সাকার-আকার নিরাকারা

'মা ত্বং হি তারা
ত্রিগুণধরা পরাৎপরা, মা ত্বং হি তারা।
আমি জানি মা, ও দীন দয়াময়ী,
তুমি দুর্গমেতে দুঃখহরা।
তুমি জলে, তুমি স্থলে, তুমি আদ্য মূলে গো মা,
আছ সর্ব্বঘটে অর্ঘ্যপুটে, সাকার আকার নিরাকারা।
তুমি সন্ধ্যা, তুমি গায়ত্রী, তুমি জগদ্ধাত্রী গো মা।
অখিলের ত্রাণকর্ত্রী সদাশিবের মনোহরা।'

পুনঃ স্বরূপমাসাদ্য তমোরূপং নিরাকৃতিঃ।
বাচাতীতং মনোঽগম্যং ত্বমেকৈবাবশিষ্যসে ॥ ৩৩
সাকারাঽপি নিরাকারা মায়য়া বহুরূপিণী।
ত্বং সর্ব্বাদিরনাদিস্ত্বং কর্ত্রী হর্ত্রী চ পালিকা ॥' ৩৪

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র : চতুর্থ উল্লাস, ৩০—৩৪ শ্লোক

১। এই কালশক্তির দ্বারা ভৈরব কার্য্যকারণভাবকে অবভাসিত করে থাকেন।

"ক্রমোঽক্রমো বা ভাবস্য ন স্বরূপাধিকো ভবেৎ ॥ ১৭
তথোপলম্ভমাত্রং তৌ ... ...
স্বরূপানধিকস্যাপি ক্রমস্য স্বস্বভাবতঃ ॥ ২০
স্বাতন্ত্র্যাদ্‌ভাসনং স্যাচ্চেৎ কিমন্যদ্ব্রূমহে বয়ম্ ॥
ইত্থং শ্রীশিব এবৈকঃ কর্ত্তেতি পরিভাষ্যতে ॥" ২১

—তন্ত্রালোক : ৯ম আহ্নিক—১৭, ২০, ২১ শ্লোক

'কার্য্যকারণভাবো যঃ শিবেচ্ছাপরিকল্পিতঃ' —ঐ ৭ শ্লোকার্দ্ধ

'এবং বিশ্বে পদার্থা যথা স্বেচ্ছয়ৈবাবভাসিতাঃ,
তথা কার্য্যকারণভাবোঽপি, ইত্যাহ
তথাবভাসনং চাস্তি কার্য্যকারণভাবগম্।' ২২ —ঐ জয়রথ-ভাষ্যসহ ২২ শ্লোক

রূপাতীতা কালশক্তি সর্ব্বব্যাপিনী অথচ অব্যক্তা। মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ভাষায় এই তত্ত্ব 'ইদমিত্থং বিবর্জ্জিতম্', অর্থাৎ এই তত্ত্বের স্বরূপ ও প্রকার নির্দ্দিষ্ট করা যায় না। এই অরূপতত্ত্বের ধ্যান আবাঙ্মানসগোচর অর্থাৎ বাক্য ও মনের অতীত। এই ধ্যান নির্ব্বিকল্পসমাধির অবস্থায় চৈতন্যের মহাব্যোমে সাধকের স্বচ্ছন্দ সঞ্চার। সাধারণ অবস্থায় এই ধ্যান সম্ভব হয় না। এইজন্য সাধারণ অবস্থায় মনকে স্থির করার উদ্দেশ্যে অরূপতত্ত্বের রূপ কল্পনা করে সেই রূপ ধ্যান করতে হয়। অরূপা কালশক্তির গুণ ও ক্রিয়া অনুসারে রূপের কল্পনা হয়ে থাকে।

'অরূপায়াঃ কালিকায়াঃ কালমাতুর্মহাদ্যুতেঃ।
গুণক্রিয়ানুসারেণ ক্রিয়তে রূপকল্পনা॥' ১৪০

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র: পঞ্চম উল্লাস—১৪০ শ্লোক

কালের কলনকারিণী মহাদীপ্তিসম্পন্না রূপাতীতা কালীর প্রকৃত প্রস্তাবে কোন রূপই নাই। তবে সত্ত্বাদিগুণ ও সৃষ্ট্যাদিকার্য্য অনুসারে তাঁর রূপ কল্পিত হয়ে থাকে।

বিশদ্‌ভাবে কালীর রূপকল্পনা নিম্নোক্ত ধ্যানমন্ত্রে পাওয়া যায়:

কালীর রূপ

'করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাম্।
কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
সদ্যশ্ছিন্নশিরঃখড়্গবামাধোর্দ্ধকরাম্বুজাম্।
অভয়ং বরদঞ্চৈব দক্ষিণোর্দ্ধাধঃপাণিকাম্॥
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথা চৈব দিগম্বরীম্।
কণ্ঠাবসক্তমুণ্ডালীগলদ্রুধিরচর্চিতাম্॥
কর্ণাবতংসতানীতশবযুগ্মভয়ানকাম্।
ঘোরদংষ্ট্রাং করালাস্যাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
শবানাং করসঙ্ঘাতৈঃ কৃতকাঞ্চীং হসন্মুখীম্।
সৃক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাম্॥
ঘোররাবাং মহারৌদ্রীং শ্মশানালয়বাসিনীম্।
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্রিতয়ান্বিতাম্॥
দন্তুরাং দক্ষিণব্যাপিমুক্তালম্বিকচোচ্চয়াম্।
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাম্॥

শিবাভিঃ ঘোরাবাভিশ্চতুর্দ্দিক্ষু সমন্বিতাম্।
মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাম্॥
সুখপ্রসন্নবদনাং স্মেরাননসরোরুহাম্।
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালীং ধর্ম্মকামার্থমোক্ষদাম্॥'

কালী ভীষণাননা, ভয়ঙ্করী, আলুলায়িতকুন্তলা, চতুর্ভুজবিশিষ্টা, অনুকূলা, অধ্যাত্মরূপা, মুণ্ডমালাধারিণী। কালীর বামদিকের অধোহস্তে সদ্যকর্ত্তিত নরমুণ্ড ও উর্দ্ধহস্তে খড়্গ, দক্ষিণদিকের উর্দ্ধহস্তে অভয়মুদ্রা ও অধোহস্তে বরমুদ্রা। কালীর বর্ণ প্রলয়কালীন মহামেঘের বর্ণের মতো, কালী উলঙ্গিনী, কালীর কণ্ঠলম্বিত মুণ্ডমালা থেকে রক্ত ক্ষরিত হয়ে পড়ছে এবং সেই রক্তে কালীর অঙ্গ সিক্ত। কালীর দুটি কর্ণে দুটি শবের ভূষণ থাকায় কালী ভীষণদর্শনা। কালীর দশন ও মুখ ভয়ানক, স্তন স্থূল ও উন্নত। কালীর কটিতে মৃতদেহের কর্ত্তিত-হস্তের কাঞ্চী। কালীর মুখে হাসি। কালীর মুখবিবরের দুই পাশ থেকে রক্তধারা ক্ষরিত হয়ে কালীর মুখমণ্ডলকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। কালীর মুখ থেকে নিঃসৃত নিনাদ ভীষণ, কালী মহারৌদ্রভাবযুক্তা, কালীর নিবাস শ্মশানে। কালীর তিনটি চক্ষু প্রাতঃকালীন সূর্য্যমণ্ডলের মতো। কালীর দংষ্ট্রা প্রকটিত, কালীর আলুলায়িত কেশকলাপ দেহের দক্ষিণদিক ব্যাপ্ত করে প্রলম্বিত। মৃতকল্প মহাদেবের বুকের উপর কালীর অবস্থিতি। কালী চতুর্দ্দিকে ভীষণনিনাদকারী শৃগালদের দ্বারা বেষ্টিত। কালী মহাকালের সঙ্গে বিপরীত রতিতে আসক্ত। কালীর হাস্যযুক্ত মুখপদ্ম সুখভোগহেতু প্রসন্ন।—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ যিনি দেন এইরূপ কালীকে উপরি-উক্ত প্রকারে চিন্তা করা কর্ত্তব্য।[১]

১। কালীর অন্যান্য ধ্যানগুলি নিম্নমতো :

(১) 'শবারূঢ়াং মহাভীমাং ঘোরদংষ্ট্রাং বরপ্রদাম্। হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চকপাল কর্ত্তৃকাকরান্। মুক্তকেশীং লোলজিহ্বাং পিবন্তীং রুধিরং মুহুঃ চতুর্ব্বাহুযুতাং দেবীং বরাভয়করাং স্মরেৎ॥'

'মেঘাঙ্গীং বিগতাম্বরাং শবশিবারূঢ়াং ত্রিনেত্রাং পরাং।
কর্ণালম্বিতবাণযুগ্মভয়দাং মুণ্ডস্রজাং মালিনীম্॥
বামাধোর্দ্ধকরাম্বুজে নরশিরঃ খড়্গাঞ্চ সব্যেতরে।
দানাভীতিবিমুক্তকেশনিচয়াং বন্দে সদা কালিকাম্॥'

'ধ্যায়েৎ কালীং করালাস্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং শবারূঢ়াং স্মেরাননসরোরুহাম্॥'

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে কালীর রূপকল্পনার ধারা অন্যবিধ :

'মেঘাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রক্তাম্বরং বিভ্রতীং
পাণিভ্যামভয়ং বরঞ্চ বিলসদ্রক্তারবিন্দস্থিতাম্।
নৃত্যন্তং পুরতো নিপীয় মধুরং মাধ্বীকমদ্যং মহা-
কালং বীক্ষ্য বিকাসিতাননবরামাদ্যাং ভজে কালিকাম্॥' ১৪১

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র : পঞ্চম উল্লাস—১৪১ শ্লো·

যাঁর বর্ণ মেঘসমান, ললাটে চন্দ্র, তিনটি চক্ষু, পরিধান রক্তবস্ত্র, যাঁর দুটি হাতে অভয় ও বর মুদ্রা, যিনি ফুটন্ত লাল পদ্মের উপর অবস্থিত, যাঁর সম্মুখে মধু মাধ্বীক মদ্য পান করে মহাকাল নৃত্য করছেন এবং যিনি মদ্যোন্মত্ত মহাকালের এই নৃত্য দর্শনে হাস্য করছেন সেই আদিভূতা কালীকে ভজনা করি।

প্রসিদ্ধ ধ্যানমন্ত্র ও মহানির্ব্বাণতন্ত্রের ধ্যানমন্ত্র—এই দুটির কালীর রূপকল্পনা মধ্যে প্রধানতম পার্থক্য হ'ল নিম্নমতো চার প্রকার :

প্রসিদ্ধ ধ্যানমন্ত্রের বর্ণনানুযায়ী কালী দিগম্বরী, কিন্তু মহানির্ব্বাণতন্ত্রে বর্ণনানুযায়ী কালী রক্তাম্বরপরিহিতা।

প্রসিদ্ধ ধ্যানমন্ত্রে কালী চতুর্ভুজা, খড়্গমুণ্ডধরা কালী বরদা অভয়ধারিণী কিন্তু মহানির্ব্বাণতন্ত্রে দ্বিভুজা বরাভয়দায়িনী।

প্রসিদ্ধ ধ্যানমন্ত্র অনুসারে কালী শবরূপ শিবের বুকের উপর অবস্থিত মহানির্ব্বাণতন্ত্র অনুসারে ফুটন্ত লাল পদ্মের উপর অবস্থানকারিণী।

প্রসিদ্ধ ধ্যানমন্ত্রে মহাকাল বা শিব শবরূপ, সম্পূর্ণরূপে চাঞ্চল্যরহিত মহানির্ব্বাণতন্ত্রে মহাকাল মদ্যপানে প্রমত্ত ও নৃত্যপরায়ণ।

রূপকল্পনায় উপরি-উক্ত পার্থক্যের কারণ হ'ল রূপকল্পনাকালে সাধকে মনোভাবগত পার্থক্য। আসল কথা, শক্তিতত্ত্ব সর্ব্বপ্রকার রূপবিবর্জ্জিত অথ সর্ব্বপ্রকার রূপেই অনুস্যূত। সাধক কবি রামপ্রসাদের ভাষায় :

'মন তোমার ভ্রম গেল না।
তুমি কালী কে তা চিনলে না॥
মা আমার জগৎময়ী, জগতে তাঁর নাই তুলনা।
তুমি মাটির মূর্ত্তি গড়ে কি চাও, কর্ত্তে মায়ের উপাসনা॥

জীব মাত্র মায়ের ছেলে, কেহ নয় তাঁর পর ভাবনা।
তুমি খুসি কর্ত্তে চাও কি মাকে, কেটে একটা ছাগল ছানা॥
প্রসাদ বলে রে মূঢ় মন, ভক্তি মাত্র উপাসনা।
কর্ল্লে লোক দেখান কালীপুজা, মা তো তোমার ঘুস খাবে না॥' ১৮২

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কবি রামপ্রসাদ—১৮২ পদ

শক্তিতত্ত্ব রূপসীমায় আবদ্ধ—এই বোধই মনের ভ্রম। সাধক যখন উপলব্ধি করতে পারবেন যে, শূন্যরূপা শক্তি রূপাতীতা অথচ রূপানুগতা তখনই তাঁর শক্তির রূপকল্পনা সার্থক হবে। নইলে সেই অবাঙ্‌মনোগোচর অখণ্ড পরতত্ত্বকে কি খণ্ডসীমার মধ্যে আবদ্ধ করা সম্ভব? তাই সাধক কবি রামপ্রসাদ বলেছেন :

'মায়ের মূর্ত্তি গড়তে চাই, মনের ভ্রমে মাটি দিয়ে।
মা বেটি কি মাটির মেয়ে, মিছে খাটি মাটি নিয়ে॥
করে অসি মুণ্ডমালা, সে মাটি কি মাটির বালা,
মাটিতে কি মনের জ্বালা দিতে পারে নিবাইয়ে?
শুনেছি মার বরণ কালো, সে কালোতে ভুবন আলো,
মায়ের মত হয় কি কালো, মাটিতে রং মাখাইয়ে?
মায়ের আছে তিনটি নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য আর হুতাশন,
কোন কারিগর আছে এমন, দিবে একটি নিরমিয়ে?
অশিবনাশিনী কালী, সে কি মাটি খড় বিচালি?
সে ঘুচাবে মনের কালি, প্রসাদে কালী দেখাইয়ে॥'

—ক. বি. শা. প. : জগজ্জননীর রূপ

খড়্গধারিণী শশিসূর্য্যাগ্নিনেত্রা মুণ্ডমালী শক্তিকে মাটিতে রূপ দিতে চাইলে মনের অনাদি ভ্রম দূরীভূত করে শূন্যরূপা সম্বন্ধে সুদৃঢ় প্রত্যয়ে পৌঁছানো প্রয়োজন।

খড়্গ নিষ্কাম সাধকের কাছে জ্ঞানের প্রতীক, তার দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্মের বন্ধন ছিন্ন হয়। রামপ্রসাদ অন্যত্র তাঁর মনকে এই মর্ম্মে উপদেশ দিয়েছেন :

'ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা, তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থুবি।
যদি না মানে নিষেধ তবে, জ্ঞানখড়্গে বলি দিবি॥'

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কবি রামপ্রসাদ—২৮ পদ

মহাদেবী শশিসূর্য্যাগ্নিনেত্রা। শশি, সূর্য্য ও অগ্নির স্বরূপ সম্বন্ধে আচার্য্য অভিনব গুপ্ত মন্তব্য করেছেন :

'প্রকাশমাত্রং সুব্যক্তং সূর্য্য ইত্যুচ্যতে স্ফুটম্।
প্রকাশ্যবস্তু-সারাংশবর্ষি তৎসোম উচ্যতে ॥ ১২০
সূর্য্যং প্রমাণমিত্যাহুঃ সোমং মেয়ং প্রচক্ষতে।
অন্যোন্যমবিযুক্তৌ তৌ স্বতন্ত্রাবপ্যুভৌ স্থিতৌ ॥ ১২১
ভোক্তৃভোগ্যোভয়াত্মৈতদন্যোন্যোন্মুখতাং গতম্।
ততো জ্বলনচিদ্রূপং চিত্রভানুঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥ ১২২
যোঽয়ং বহ্নেঃ পরং তত্ত্বং প্রমাতুরিদমেব তৎ।'

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক, ১২০—১২৩ শ্লোকার্দ্ধ

শুদ্ধ প্রকাশই হ'ল সূর্য্যের রূপ। যেহেতু শুদ্ধজ্ঞানই প্রমাণের রূপ, সেহেতু লক্ষণাবৃত্তি আশ্রয় করে প্রমাণকেই সূর্য্য বলা হয়। জ্ঞেয়বস্তু সুখদুঃখমোহময়, সুতরাং জ্ঞেয়বস্তুর সার হ'ল সুখকারী আহ্লাদ। এই আহ্লাদ যে বর্ষণ করে, তাই হ'ল সোম। প্রমেয় ভোগ্যরূপে আহ্লাদ জন্মায়, অতএব প্রমেয়কেই সোম বলা যায়। এই প্রমাণ-প্রমেয় সব সময় একসঙ্গেই অর্থাৎ পরস্পর অবিচ্ছিন্নভাবে উপলব্ধ হয়, কারণ জ্ঞান আছে অথচ জ্ঞেয় নাই অথবা জ্ঞেয় আছে অথচ জ্ঞান নাই, এরূপ পরিস্থিতি অবাস্তব। কিন্তু প্রমাণ-প্রমেয় পরস্পর সংলগ্ন হ'লেও পরস্পর পৃথক বলে অনুভূত হয়। প্রমাণ-প্রমেয়ের ভোক্তৃভোগ্যভাবে পরস্পর উন্মুখতাই হ'ল পরিমিতপ্রমাতার রূপ। এই পরিমিতপ্রমাতা সংবিৎরূপে প্রমাণ-প্রমেয় বিভাগকে দগ্ধ করে, তাই পরিমিত-প্রমাতার রূপকে অভিনব গুপ্ত জ্বলনপ্রধান বলেছেন। প্রমাণ-প্রমেয় ইত্যাদি পরিমিতপ্রমাতারই ভানু বা দীপ্তি, এইজন্য পরিমিতপ্রমাতা চিত্রভানু। যেহেতু 'শুচির্নামাগ্নিরুদ্ভূতঃ সংঘট্টাৎ সোমসূর্য্যয়োঃ', চন্দ্রসূর্য্যের মিলন থেকেই শুচিনামক অগ্নির উদ্ভব, সেহেতু বহ্নির যা তত্ত্ব পরিমিতপ্রমাতারও তাই তত্ত্ব।[১]

১। 'তৌ উভৌ সূর্য্যচন্দ্রৌ, স্বতন্ত্রৌ-পরস্পরনৈরপেক্ষ্যেণ প্রমাণপ্রমেয়াত্মনা পৃথগ্ব্যবহার্য্যৌ অপি, অন্যোন্যমবিযুক্তৌ—সহোপলম্ভনিয়মাদভেদমাপন্নাবিত্যর্থঃ, ন খলু জ্ঞানং জ্ঞেয়ানারূষিতং কচিদপি উপলভ্যতে জ্ঞানং বিনা বা জ্ঞেয়মিতি, যদাহঃ

সুতরাং সিদ্ধান্ত হ'ল—প্রমেয়, প্রমাণ ও প্রমাতাই মহাদেবীর তিনটি নেত্র।

মহাদেবীর মুণ্ডমালায় পঞ্চাশটি মুণ্ড আছে। এই পঞ্চাশটি মুণ্ড পঞ্চাশটি বর্ণের প্রতীক। নিরুত্তরতন্ত্রে আছে :

"পঞ্চাশদ্বর্ণমুণ্ডালী-গলদ্রুধিরচর্চ্চিতাম্।"

পঞ্চাশটি বর্ণই মুণ্ড। এই মুণ্ডে গ্রথিত মালা থেকে ক্ষরিত রুধিরে মহাদেবীর অঙ্গ আর্দ্র।

রাধাতন্ত্রে এই একই কথা পাওয়া যায় :

'অকারাদিক্ষকারান্তা পঞ্চাশন্মাতৃকাক্ষরা।
অব্যয়া অপরিচ্ছিন্না ত্রিপুরাকণ্ঠসংস্থিতা ॥'

ক্ষয়রহিত, সীমাহীন, অকার থেকে আরম্ভ করে ক্ষকার পর্য্যন্ত পঞ্চাশটি বর্ণমাতৃকা ত্রিপুরাদেবীর কণ্ঠে অবস্থিত।

সাধক কবি রামপ্রসাদও তাঁর একটি পদে শক্তিবর্ণরূপ উল্লেখ করেছেন :

'যত শোনো কর্ণপুটে, সকলি মায়ের মন্ত্র বটে।
কালী পঞ্চাশৎবর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে ॥'

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কবি রামপ্রসাদ—৬৩ পদ

জগজ্জননীর রূপকল্পনার সর্ব্বত্র শূন্যরূপার নীরূপতার আভাস পাওয়া যায়। শাক্ত কবি গোবিন্দ চৌধুরীর একটি পদে এই অপরূপ রূপতত্ত্বের দার্শনিক তাৎপর্য্যপুর্ণ অথচ কাব্যোৎকর্ষমণ্ডিত সুন্দর ব্যাখ্যা পাওয়া যায় :

'স্ফটিকস্যেবহ্যপাশ্রয়শূন্যস্য জ্ঞানস্য স্বরূপমনিরূপ্যম্।' ইতি

তথা 'নাবেদনমতো বেদ্যম............।' ইতি

অতএব এতৎ সূর্য্যাচন্দ্রাত্মদ্বয়ং গ্রাহ্যগ্রাহকরূপত্বাৎ পরস্পরৌন্মুখ্যং প্রাপ্তং সৎ, ভোক্তা-বুদ্ধ্যাত্মা সংকুচিতঃ প্রমাতা তন্ময়ত্বাৎ প্রমাণমপি ভোক্তা, ভোগ্যং চ নীলসুখাদি তয়োর্যৎ লোলীভাবমাপন্নং সৎ উভয়ং, তদাত্মা যস্য তৎ-ভোক্তৃভোগ্যসংঘট্টস্বভাবমিত্যর্থঃ। যতশ্চৈবং ততো ভোক্তৃভোগ্যসংঘট্টলক্ষণাৎ হেতোঃ চিত্রাঃ নানাকারা মানমেয়াদিরূপা ভানবো যস্যাসৌ অগ্নিরুক্তঃ, যদুক্তম্

শুচির্নামাগ্নিরুদ্ভূতঃ সংঘট্টাৎ সোমসূর্য্যয়োঃ ইতি

স চ প্রমাণপ্রমেয়বিভাগাত্মনো ভেদস্য দাহকত্বাৎ জ্বলনপ্রধানা চিৎ রূপং যস্য সঃ—পরিমিত-প্রমাতৃরূপ ইত্যর্থঃ, বহ্নেরপ্যেবম্ ইতি তস্য প্রমাতৃত্বম্, অত আহ—যোহয়মিত্যাদি, পরমিত্যসাধারণম্ ॥' —তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক, ১২১—১২৩ শ্লোকার্দ্ধ জয়রথ-ভাষ্য

"ওঙ্কার মূরতি রে মন জান না কি উহারে ?
ওই ত করেছে এই বিশ্ব রচনা,
নৈলে হেন দৃশ্য আঁকিতে বল কে পারে।
দশভুজা দেখে মায়ের ভেবেছো রূপের শেষ,
অন্তরে দেখিলে আবার দেখিবে অনন্ত বেশ,
অনন্ত প্রেমলোলুপা কদাচিৎ চিৎস্বরূপা,
কচিদাকাশ কচিৎ প্রকাশ অনন্ত জগদাকারে॥
ধরে রে সহস্র বাহু সহস্র প্রহরণ,
সহস্র চরণে করে অজস্র বিচরণ,
সহস্র বদনে খায়, সহস্র নয়নে চায়,
সহস্র শ্রবণে শোনে কথা রে,
সহস্র শির না হলে, কেবা, ওরে অবোধ প্রাণ,
এতই গরবে করে সহস্র ধারায় স্নান।
সহস্র ভাবে বিভোরা, সহজ জ্ঞানের অগোচরা,
ওই ত অহরহঃ বাস করে তোমার সহস্রারে॥
অজ্ঞানে ভুলাতে রে মন পাতে এমন ইন্দ্রজাল,
কভু কালীরূপে তারা করে ধরে করবাল,
কখন বা সীতা হয়, মূলে কিন্তু কিছু নয়,
ব্রহ্মাদি দেবতা কিছুই বুঝিতে নারে।
আজ যেমন গোবিন্দের কাছে দুর্গা রূপে এসেছে,
কাল দেখবে রাধা রূপে শ্যামের বামে বসেছে।
তাই বলি, এই কায়া কিছু নয় শুধু মায়া,
ধরলে পরে জ্ঞানের আলো—লুকায় আবার ওঙ্কারে॥"

—ক. বি. শা. প.: জগজ্জননীর রূপ

রূপবিলাস শক্তিরই লীলা। আসলে শূন্যরূপা শক্তিরই ওঙ্কারই নিত্যরূপ।

কালী মহারাজ মহাতাব্ চাঁদের পদে পূর্ব্ব উল্লিখিত প্রসিদ্ধ ধ্যানমন্ত্রের পরিকল্পনানুযায়ী কালীরূপের বর্ণনা পাওয়া যায়:

"কে ও একাকিনী, কাহার রমণী, শশী শোভা জিনি মসীবরণী।
দশনে রসনা ধরা, বদনে রুধিরধারা, করালবদনী॥
এ নব বয়সী, ঘোররূপা মুক্তকেশী, শোভে দীর্ঘ বেণী।
গলে দোলে মুক্তাহার, কটি তটে—নরকর-রচিত-কিঙ্কিণী॥
পয়োধর পীনোন্নত, রুধিরধারে আবৃত বিকটরূপিণী।
মৃত শিশু শ্রুতিমূলে, অর্দ্ধ চন্দ্র সাজে ভালে, হেরি বিবসনী॥
অসি মুণ্ড বাম করে, দক্ষিণে অভয় বরে, রণে রণরঙ্গিণী।
ভীমবেশা ভয়ঙ্করী, ভব হৃদি পদ ধরি, দক্ষিণারূপিণী॥
চতুর্দ্দিকে শিবা ঘেরি, শ্মশানালয়ে শঙ্করী অট্ট অট্ট হাসিনী।
চন্দ্রে দেহি এই জ্ঞান, অন্তে করি তব ধ্যান কালী ত্রিনয়নী॥"

ক. বি. শা. প.: জগজ্জননীর রূপ

কালী একাকিনী নির্গুণব্রহ্মরূপিণী, ভৈরবের হ্লাদিনীশক্তি চন্দ্রশোভাতি-শায়িনী, কৃষ্ণরূপিণী, প্রকটিত-দশনী, লোলজিহ্বাধারিণী। কালীর ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় থেকে রুধিরধারা ক্ষরিত। কর্পূরাদিস্তোত্রে তৃতীয় শ্লোকে মহাদেবীকে সম্বোধন করা হয়েছে: সৃক্কদ্বন্দ্বাস্রধারাদ্বয়ধরবদনে।[১] এই পদের ব্যাখ্যায় বিমলানন্দ স্বামী মন্তব্য করেছেন:

'অত্র রক্তধারয়া রজোগুণঃ সূচিতঃ, তস্মাৎ মহাদেবী রজোরহিতা শুদ্ধ-সত্ত্বাত্মিকা বিরজা ইতি নিরূপিতা', রক্তধারা রজোগুণের প্রতীক, সুতরাং ওষ্ঠপ্রান্তদ্বয় থেকে রক্তধারার ক্ষরণ মহাদেবীর রজোহীন শুদ্ধ সত্ত্বময় রূপটিকেই সূচিত করছে।

কালী করালাস্যা, বয়সে নবীনা অর্থাৎ সৃজনোল্লাসময়ী, ভয়ঙ্কররূপিণী। কালী আলুলায়িতকুন্তলা। এই আলুলায়িত কুন্তল মায়ার আবরণশক্তির প্রতীক। মহাদেবীর কেশপাশে দীর্ঘ বেণী, গলে মুক্তাহার। কটিতটে

১। 'ঈশো বৈশ্বানরস্থঃ শশধরবিলসৎ বামনেত্রেণ যুক্তো
বীজস্তে দ্বন্দ্বমন্যৎ বিগলিতচিকুরে কালিকে যে জপন্তি।
দ্বেষ্টারং ঘ্নন্তি তে চ ত্রিভুবনমপি তে বশ্যভাবং নয়ন্তি।
সৃক্কদ্বন্দ্বাস্রধারাদ্বয়ধরবদনে দক্ষিণে ত্র্যক্ষরেতি॥' ৩

—কর্পূরাদিস্তোত্র: তৃতীয় শ্লোক

নরকরখচিত কিঙ্কিণী। কর্পূরাদিস্তোত্রে মহাদেবীকে বলা হয়েছে : 'গতাসুনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলসন্নিতম্বা'।[১] এই পদের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার বিমলানন্দ স্বামীর উক্তি :

'সর্ব্বে জীবাঃ কল্পাবসানে স্থূলদেহান্ ত্যক্ত্বা স্বস্বকর্ম্মভিঃ সহ লিঙ্গদেহমাশ্রিত্য সগুণব্রহ্মরূপিণ্যাঃ কারণদেহস্য অবিদ্যাময়াংশে পুনঃ কল্পারম্ভপর্য্যন্তং আমোক্ষং অবতিষ্ঠন্তে, অতএবাত্র মৃতজীবাণাং প্রধানকর্ম্মসাধনভূতৈঃ করসমূহৈঃ বিরাটরূপিণ্যাঃ মহাদেব্যাঃ গর্ভধারণযোগ্যনিম্নোদরস্য তথা যোনেশ্চ উর্দ্ধস্থিতকটিপ্রদেশে কাঞ্চী কল্পিতা ইতি ভাবঃ।'

সমস্ত জীব কল্পান্তে স্থূলশরীর পরিত্যাগ করে আপন আপন কর্ম্মের সঙ্গে লিঙ্গদেহ ধারণ করে সগুণব্রহ্মময়ী কালীর কারণশরীরের অবিদ্যাময় অংশে কল্পারম্ভপর্য্যন্ত অথবা মোক্ষপর্য্যন্ত অবস্থান করে, এইজন্য মৃতজীবের কর্ম্মসাধনের প্রধান করণ যে হাত তার দ্বারাই মহাদেবীর গর্ভধারণের স্থল নিম্নোদর ও যোনির উর্দ্ধে অবস্থিত কটিদেশে কাঞ্চী পরিকল্পিত হয়েছে।

কালী পীনোন্নত-পয়োধরা রুধিরসিক্তা, বিকটরূপিণী। কর্ণমূলে মৃত শিশু। কর্পূরাদিস্তোত্রে দ্বিতীয় শ্লোকে সম্বোধন আছে : 'মহাঘোরবালাবতংসে'।[২] বিমলানন্দের ব্যাখ্যা এইরূপ : 'মহেশ্বরসদৃশনির্ব্বিকারবালকবন্নিষ্কামসাধকাভ্যাং কৃতে অতিপ্রিয়ে কর্ণভূষণে যস্যা তৎসম্বোধনে' শিবের মতো নির্ব্বিকার ও বালকের মতো নিষ্কাম সাধক দুজন যাঁর অতিপ্রিয় কর্ণালঙ্কার অর্থাৎ কামবিকারহীন সাধনাতেই তাঁর তৃপ্তি।

১। 'গতাসুনাং বাহুপ্রকরকৃতকাঞ্চীপরিলসন্নিতম্বাং
দিগ্বস্ত্রাং ত্রিভুবনবিধাত্রীং ত্রিনয়নাং।
শ্মশানস্থে তল্পে শবহৃদি মহাকালসুরতপ্রযুক্তাং
ত্বাং ধ্যায়ন্ জননি জড়চেতা অপি কবিঃ॥' ৭

—কর্পূরাদিস্তোত্র : ৭ শ্লোক

২। "ঈশানঃ সেন্দুবামশ্রবণপরিগতো বীজমন্যন্মহেশি
বন্দস্তে মন্দচেতা যদি জগতি জনো বারমেকং কদাচিৎ।
জিত্বা বাচামধীশং ধনদমপি চিরং মোহয়ন্নম্বুজাক্ষী-
বৃন্দং চন্দ্রার্দ্ধচূড়ে প্রভবতি স মহাঘোরবালাবতংসে॥" ২

—কর্পূরাদিস্তোত্র : ২ শ্লোক

কালী ললাটে অর্দ্ধচন্দ্রধারিণী, বসনহীনা অর্থাৎ মায়াবরণশূন্যা, খড়্গামুণ্ডধরা বরদাভয়ধারিণী, সমরে শত্রুনাশিনী।[১] হরহৃদে কালীর পদ। শ্মশানে অট্টহাসা কালী চতুর্দ্দিকে শিবাবেষ্টিতা। কর্পূরাদিস্তোত্রের ভাষ্যে বিমলানন্দের ব্যাখ্যানুযায়ী 'মহাপ্রলয়সময়ে সর্ব্বভূতানি শবরূপেণ লীয়ন্তে যস্মিন তৎ শ্মশানং পর ব্রহ্ম' মহাপ্রলয়কালে সমস্ত ভূত শবরূপে যেখানে লীন হয় তাই শ্মশান এই ব্যুৎপত্তিতে পরব্রহ্মই শ্মশান। শিবা হ'ল বিমলানন্দের ব্যাখ্যায় অপঞ্চীকৃতমহাভূত, পঞ্চীকরণ যাদের এখনও হয় নাই সেরূপ পঞ্চ মহাভূত।

সাধক কবি রামপ্রসাদের পদে কালীর কান্তরূপ শব্দচয়নমাধুর্য্যে ও ছন্দসুষমায় কোন কোন পদে অপূর্ব্ব কাব্যমূর্ত্তি লাভ করেছে :

কান্তরূপ

"চিক্কণ কালরূপা সুন্দরী ত্রিপুরারি হৃদে বিরাজ করে।
অরুণ কমল দল, বিমল চরণ তল, হিমকর নিকর রাজিত নখরে ॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, তিমির কলাপ নাশে,
ভাষে সুধা অমিত ক্ষরে।
ভ্রমে কোকনদ দল, মধুকর চঞ্চল,
লঘুগতি পতিত যুবতী অধরে ॥
সহজে নবীনা ক্ষীণা, মোহিনী বসনহীনা, কি কঠিনা—দয়া না করে।
চঞ্চলাপাঙ্গ প্রাণহর, বরষিত শর খর, কত কত শত শত শত রে ॥
কহে রামপ্রসাদ কবি, অসিত মায়ের ছবি, ভাবি ভাবি নয়ন ঝরে।
ও পদ-পঙ্কজ-পল্লবে বিহরতু, মামক মানস আশ ধরে ॥" ১০৪

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কবি রামপ্রসাদ—১০৪ পদ

কান্তরূপের বর্ণনার মতো ভীমরূপের বর্ণনাতেও সাধক কবি রামপ্রসাদ কম কৃতিত্ব দেখান নাই :[২]

ভীমরূপ

১। অম্বিকাদেবীর ললাটফলক থেকে নিষ্ক্রান্তা ভীষণবদনা খড়্গাপাশধারিণী কালীদেবীর বর্ণনা মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে পাওয়া যায়। প্রথম পরিচ্ছেদে এই বিষয় বিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

২। মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীর উত্তম চরিত্র, সপ্তম অধ্যায়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে অম্বিকাদেবীর ভ্রূকুটী কুটিল ললাটফলক থেকে বিনিষ্ক্রান্তা করালবদনা অসিপাশধারিণী কালীদেবীর বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। প্রথম পরিচ্ছেদে এ বিষয় আলোচিত হয়েছে।

"ও কে রে মনোমোহিনী—
ঐ মনোমোহিনী।
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটা, মণি মরকত কান্তি ছটা।
একি চিত্ত ছলনা, দৈত্য দলনা, ললনা নলিনী-বিড়ম্বিনী॥
সপ্ত পেতি সপ্ত হেতি, সপ্তবিংশনয়না।
শশী খণ্ড শিখোসী, মহেশ উরসী, হরের রূপসী একাকিনী॥
ললাট ফলকে, অলকা ঝলকে, নাস নলকে, বেসরে মণি।
মরি। হেরি একি রূপ, দেখ দেখ ভূপ, সুধা রস-কূপ বদনখানি॥
শ্মশানে বাস, অট্টহাস, কেশপাশ-কাদম্বিনী।
বামা, সমরে বরদা, অসুর দরদা, নিকটে প্রমোদাপ্রমাদ গণি॥
কহিছে প্রসাদ, না কর বিবাদ পড়িল প্রমাদ, স্বরূপে গণি।
সমরে হবে না জয়ী রে, ব্রহ্মময়ীরে, করুণাময়ীরে বল জননী॥"
—ক. বি. শা. প.: জগজ্জননীর রূপ

অনত্র—

"ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে,
বামা রণে দ্রুতগতি চলে, দলে দানবদলে, ধরি করতলে গজ গরাসে॥
কে রে কালীয় শরীরে, রুধির শোভিছে, কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীল কমল, শ্রীমুখমণ্ডল, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে প্রকাশে॥
কে রে নীলকান্ত মণি নিতান্ত, নখর নিকর তিমির নাশে,
কে রে রূপের ছটায়, তড়িত ঘটায়, ঘন ঘোর রবে, উঠে আকাশে॥
দিতিসুতচয়, সবার হৃদয়, থর থর থর, কাঁপে হুতাশে।
মা গো, কোপ কর দূর, চল নিজ পুর, নিবেদে শ্রীরামপ্রসাদ দাসে॥"
—ক. বি. শা. প.: জগজ্জননীর রূপ

কমলাকান্তের সমরসঙ্গীতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

"ও রমণী কালো এমন রূপসী কেমনে,
বিধি নিরমিল নব নীরদ বরণে॥
বামা অট্ট অট্ট হাসে, দশনে দামিনী খসে,
কত সুধা ক্ষরে বামার ও বিধুবদনে॥

সিন্দুর বর দিনকর সম শোভা,
অম্বুজ বদন মদন মনোলোভা ॥
তপন দহন শশী, উদয় হয়েছে আসি,
সত্ত্ব রজস্তম গুণ অরুণ নয়নে ॥
নাভি সরোবর নীরজ বিহারে,
ঈষদ বিকচ কমল কুচভারে ॥
গলিত কুন্তল জাল, গলে নর মুণ্ডমাল,
শব শিশু শোভে মায়ের যুগল শ্রবণে ॥
চারু চরণ যুগ আভরণ বৃন্দে,
নখর মুকুর কর হিমকর নিন্দে ॥
কমলাকান্ত হেরি, রূপ অতি মাধুরী,
শরণ লইল শ্যামার সুনির্ম্মল চরণে ॥" ১৯৪

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিরচিত সাধক কমলাকান্ত—১৯৪ পদ

অথবা— "নব জলধর কায়।
কালো রূপ হেরিলে আঁখি জুড়ায় ॥
কপালে সিন্দুর, কটিতে ঘুঙ্গুর, রতন নূপুর পায়।
হাসিতে হাসিতে, কত দানব দলিছে, রুধির লেগেছে গায় ॥
অতি সুশীতল চরণ যুগল, প্রফুল্ল কমলপ্রায়।
কমলাকান্তের মন নিরন্তর ভ্রমর হইতে চায় ॥"

—ক. বি. শা. প.: জগজ্জননীর রূপ

মহাদেবীর রণরঙ্গিনী রূপ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কল্পনাকে পর্য্যন্ত কবিতা-রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। বিসর্জ্জন নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের গানটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য:

"উলঙ্গিনী নাচে রণরঙ্গে
আমরা নৃত্য করি সঙ্গে।
দশদিক আঁধার করে মাতিল দিগ্বসনা,
জ্বলে বহ্নি শিখা রাঙ্গা রসনা,
দেখে মরিবারে ধাইছে পতঙ্গে।

কালো কেশ উড়িল আকাশে
রবি সোম লুকাল তরাসে।
রাঙা রক্তধারা ঝরে কালো অঙ্গে
ত্রিভুবন কাঁপে ভুরুভঙ্গে।"

সাধক কবির তত্ত্বদৃষ্টিতে কথনো কথনো কালীরূপ ও কৃষ্ণরূপ এক বলে

কালীকৃষ্ণ রূপ

প্রতীয়মান হয়েছে :

"কালী হলি মা রাস বিহারী
নটবর বেশে বৃন্দাবনে।
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব, কে বুঝে এ কথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা, গুণবতী রাধা, আপনি পুরুষ আপনি নারী।
ছিল বিবসন কটী, এবে পীত ধটি, এলোচুল চুড়া বংশীধারী॥
আগেতে কুটিল নয়ন অপাঙ্গে মোহিত করেছ ত্রিপুরারি।
এবে নিজে কাল, তনু রেখা ভাল, ভুলালে নাগরী নয়ন ঠারি॥
ছিল ঘন ঘন হাস, ত্রিভুবন ত্রাস, এবে মৃদু হাস, ভুলে ব্রজ কুমারী
আগে শোণিত সাগরে নেচেছিলে শ্যামা এবে প্রিয় তব যমুনা বারি॥
প্রসাদ হাসিছে, সরসে ভাসিছে, বুঝেছি জননী মনে বিচারি—
মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যামতনু, একই সকল, বুঝিতে নারি॥"

—রামপ্রসাদ সেন : ক. বি. শা. প.—মা কি ও কেমন

অথবা—

"জান না রে মন, পরম কারণ, কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ, কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী, করে লোয়ে অসি, দনুজ তনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি, বাজাইয়ে বাঁশী, ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন, করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা, যতনে এ ভব যাতনা সয়॥
যে রূপে যে জনা করয়ে ভাবনা, সে রূপে তার মানস রয়।
কমলাকান্তের হৃদি সরোবরে, কমল মাঝারে করে উদয়॥"

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য : ক. বি. শা. প.—মা কি ও কেমন

অথবা— "অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলী-ধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী ॥
কালী কি কালা বলিলে, কালে ছোঁয় না কোন কালে,
কালের কর্ত্রী কালী সেই, কালা আমার মা কালী ॥
কভু শিব, কভু শক্তি, পুরুষ আর প্রকৃতি,
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছামূর্ত্তি, কভু কাল, কভু যে কালী।
অপার লীলা বুঝিতে, কে পারে এ ত্রিজগতে,
হন উদয় যার হৃদেতে, সে জানে এক সকলি ॥
শিব, গাণপত্য, শাক্ত, সৌর আর যে বিষ্ণুভক্ত,
প্রভেদ ভাবিলে ব্যর্থ, বৃথা সে দলাদলি,—
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব রাম, দুর্গা কালী রাধা শ্যাম,
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই বলী ॥"

রামলাল দাশগুপ্ত : ক. বি. শা. প.—মা কি ও কেমন

ব্রহ্মময়ী শক্তির সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন প্রকার গুণান্বয়েই মহাবিদ্যার আবির্ভাব ও গুণসমূহের পরিমাণের তারতম্যানুসারেই মহাবিদ্যাদের পৃথক পৃথক রূপের উদ্ভব হয়। আসলে সব মহাবিদ্যাই শিবশক্তিময়ী।

দশ মহাবিদ্যা

দশ মহাবিদ্যা হ'ল : কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা।

কালী শুদ্ধ-সত্ত্বগুণপ্রধানা নির্বিকারা নির্গুণব্রহ্মস্বরূপপ্রকাশিকা। উপরি-বর্ণিতা কালী সাক্ষাৎ কৈবল্য-দায়িনী।

তারা সত্ত্বগুণাত্মিকা তত্ত্ব-বিদ্যাদায়িনী। তারার ধ্যানমন্ত্র হ'ল :

তারা

'প্রত্যালীঢ়পদাং ঘোরাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
খর্ব্বাং লম্বোদরীং ভীমাং ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতাং কটৌ ॥
নবযৌবনসম্পন্নাং পঞ্চমুদ্রাবিভূষিতাম্।
চতুর্ভুজাং লোলজিহ্বাং মহাভীমাং বরপ্রদাম্ ॥
খড়্গাকর্ত্রীসমাযুক্তসব্যেতরভুজদ্বয়াম্।
কপালোৎপলসংযুক্তসব্যপাণিদ্বয়ান্বিতাম্ ॥

পিঙ্গোগ্রৈকজটাং ধ্যায়েন্মৌলাবক্ষোভ্যভূষিতাম্ ।
জলচ্চিতামধ্যগতাং ঘোরদংষ্ট্রাং করালিনীম্
সাবেশস্মেরবদনাং স্ত্র্যলঙ্কার-বিভূষিতাম্ ॥
বিশ্বব্যাপকতোয়ান্তঃশ্বেতপদ্মোপরিস্থিতাম্ ।
অক্ষোভ্যো দেবীমূর্দ্ধণ্যস্ত্রিমূর্ত্তিনাগরূপধৃক্ ॥"

—জগন্মোহন তর্কালঙ্কার-কৃত তন্ত্রোক্ত নিত্যপূজাপদ্ধতি

তারার বামপদ অগ্রবর্ত্তী ও দক্ষিণপদ পরবর্ত্তী। তিনি ভীষণদর্শনা, মুণ্ডমালাভূষিতা, খর্ব্বা, লম্বোদরী, তাঁর কটিতে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। তাঁর নব যৌবন। তিনি লেলিহানাদি পাঁচটি মুদ্রা ধারণ করে আছেন। তিনি চতুর্ভুজা, লোলজিহ্বাসমন্বিতা, মহাভয়ঙ্করী, বরদায়িনী। তাঁর দক্ষিণ দুই হাতে খড়্গ ও কর্ত্রী (ছোট খড়্গ)। তাঁর বাম দুই হাতে নরকপাল ও পদ্ম, তাঁর মাথায় পিঙ্গলবর্ণের একটি দীর্ঘ জটা ও অক্ষোভ্য ঋষি। তিনি জলন্ত চিতার মধ্যে অবস্থিত, তাঁর দাঁতগুলি ভয়ানক। তিনি ভীষণা, তাঁর মুখ ভাবাবেশে হাস্য-যুক্ত। তিনি রমণীসুলভ অলঙ্কারে বিভূষিত। তিনি জগদ্ব্যাপ্ত কারণসলিলে সাদা পদ্মের উপর অবস্থিত। তাঁর মাথায় নাগরূপধারী অক্ষোভ্য ঋষি।

শাক্ত কবির পদে তারার ভীমরূপ অপরূপ শব্দসম্ভারে সুন্দর আস্বাদ্যমানতা লাভ করেছে :

"নীলবরণী, নবীনা রমণী,
নাগিনী জড়িত জটা বিভূষণী।
নীল নলিনী জিনি ত্রিনয়নী,
নিরখিলাম নিশানাথ নিভাননী ॥
নিরমল নিশাকর কপালিনী,
নৃকর চারুকর সুশোভিনী
লোলরসনী করালবদনী ॥
নিতম্বে বেষ্টিত শার্দ্দূল ছাল,
নীল পদ্মে করে করি করবাল,
নৃমুণ্ড খর্পর অপর দ্বিকর,
লম্বোদরী লম্বোদর প্রসবিনী ॥

নিপতিত পতি শবরূপে পায়,
নিগমে ইহার নিগূঢ় না পায়,
নিস্তার পাইতে শিবের উপায়
নিত্যা সিদ্ধা তারা নগেন্দ্রনন্দিনী ॥"

—শিবচন্দ্র রায় মহারাজ : ক. বি. শা. প.—জগজ্জননীর রূপ

ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কল্পনানুযায়ী জীবহৃদয়ে জ্ঞানের অঙ্কুরই তারা।

"ভীমা লম্বোদরা ব্যাঘ্রচর্ম্মপরা,
খর্ব্ব আকৃতি বামা নৃমুণ্ডমালিনী।
জটা-বিভূষণা পিঙ্গলবরণা
জটাগ্রে উন্নত পন্নগধারিণী ॥
খড়্গ কর্ত্তরী করে কপাল উৎপল ধরে,
রক্তিম রবিচ্ছবি দৃশ্য ত্রিনয়নে।
জলন্ত চিতামাঝে পদ্মে দ্বিপদ সাজে,
লোল রসনা বামা ঘোর হাসি বদনে ॥
জ্ঞানের অঙ্কুর ধরি জীবহৃদয় ভরি
বিরাজেন শঙ্করী সতী অই ভুবনে ॥" —দশমহাবিদ্যা

ষোড়শী রজঃপ্রধানা ও সত্ত্বগুণাত্মিকা। ষোড়শীর ধ্যান নিম্নরূপ :

ষোড়শী 'বালার্কমণ্ডলাভাসাং চতুর্ব্বাহুং ত্রিলোচনাম্।
পাশাঙ্কুশশরাংশ্চাপং ধারয়ন্তীং শিবাং শ্রয়ে ॥'

[প্রা]তঃকালীন সূর্য্যমণ্ডলের মতো রক্তবর্ণ, চতুর্ভুজা, ত্রিনয়না এবং পাশ, অঙ্কুশ, [শ]র ও ধনু যিনি ধারণ করে আছেন, সেই শিবানী ষোড়শীকে ভজনা করি।

মহারাজ মহাতাব্ চাঁদের পদে ষোড়শীর রূপের বাণীমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করা যায় :

"অপরূপ কে ললনা হেরি রক্তাম্বুজাসনা,
কিঙ্কিণী মণিরচিত, মুকুট শিরোভূষণা।
কুটিল কুন্তলজাল, আবৃত মুখমণ্ডল,
ওষ্ঠ জিত বিম্বফল, প্রফুল্ল পঙ্কজাননা ॥

ধনুসদৃশ ভ্রূলতা, ত্রিনয়ন-সুশোভিতা,
সহাস্যবদনান্বিতা, মধু মধুর বচনা।
বিগলিত মুক্তহার যুক্ত নব পয়োধর,
হেম কর্ণপুর, মনোহর আভরণা ॥
কাঞ্চীযুক্ত নিতম্বিনী, ললিত ত্রিবলী শ্রেণী,
চতুর্ভুজ বিধায়িনী, রক্তাম্বর পরিধানা।
পাশাঙ্কুশ যুগ্মকরে, ধনুর্বাণ শোভে অপরে,
রোমাবলী অঙ্গোপরে উরু কদলী তুলনা ॥
নিম্ন নাভি সরোবর, শ্রীপদ কচ্ছপাকার,
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বন্দিত, চারুচরণা ॥
তাম্বূলপূর্ণ বদন, অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন,
গূঢ় গুল্‌ফ সুশোভন, স্বচ্ছ নব দীপ্তমানা ॥
জগদানন্দ জননী, বিশ্বাকর্ষণকারিণী,
ব্রহ্মাণ্ডে বীজরূপিণী, জবাকুসুমবরণা।
নাশ করে দূরদৃষ্ট, মুক্ত করি ভব কষ্ট,
চন্দ্রের এই মনোভীষ্ট, ষোড়শী ভব অঙ্গনা ॥"

—মহ্‌তাব্ চাঁদ মহারাজ ঃ ক. বি. শা. প.—জগজ্জননীর রূ

কবি হেমচন্দ্রের পরিকল্পনানুযায়ী জীবগণের হৃদয়ে প্রেমসঞ্চার ষোড়শী ক্রিয়া ঃ

"নেহার তাঁর পাশে কি জ্যোতি দেহে ভাসে
শ্বেতবরণ বামা পূর্ণকলা কামিনী।
প্রেম সঞ্চারি হৃদে জীবগণে ডোরে বেঁধে
ঐখানে রাজিছে ষোড়শী রূপিণী ॥" —দশমহা

ভুবনেশ্বরী ভুবনেশ্বরীও ষোড়শীর মতো রজঃপ্রধানা সত্ত্বগুণাত্মকা। ভুবনেশ্বর ধ্যানমন্ত্র এইরূপ ঃ

'উদ্যদ্দিনকরদ্যুতিমিন্দুকিরীটাং তুঙ্গকুচাং নয়নত্রয়যুক্তাম্।
স্মেরমুখীং বরদাঙ্কুশপাশাভীতিকরাং প্রভজেৎ ভুবনেশীম্ ॥'

উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় তাঁর দেহকান্তি, চন্দ্র মুকুট, স্তনদ্বয় উন্নত, তিনটি নেত্র, মুখে সদা হাস্য এবং চার হাতে বরমুদ্রা, অঙ্কুশ, পাশ ও অভয়মুদ্রা সেই ভুবনেশ্বরী দেবীকে ভজনা করবে।

শাক্ত কবি ভুবনেশ্বরীরও রূপ অবলম্বনে পদ রচনা করেছেন :

"ভুবনেশ্বরী মার রূপে নাহিক ভুবনে সীমা।
রক্তবর্ণা পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী সুভূষণা,
প্রভাকর উত্তমাঙ্গে, অর্দ্ধভাগা চন্দ্রমা॥
পাশাঙ্কুশ বরাভয়, চারি করেতে শোভয়,
অলঙ্কার মণিময়, নাহি তার উপমা॥
মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে,
করতলে ইষ্টসিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অণিমা॥"

—শিবচন্দ্র সরকার : ক. বি. শা. প.—জগজ্জননীর রূপ

কবি হেমচন্দ্রের পরিকল্পনানুযায়ী স্নেহসৃষ্টিই ভুবনেশ্বরীর কর্ম্ম।

"তা জিনি সুন্দর উন্নত শোভাধর
ভুবনেশ্বরী ঋষি, হের তাঁর নিকটে।
পীনস্তনী বামা প্রফুল্লা ত্রিনয়না
প্রভাত আভা দেহে, ইন্দু ভাতি কিরীটে॥
অঙ্কুশাভয়বর পাশ সজ্জিত কর
সর্ব্ব-মঙ্গলা সতী জীবদুঃখ বিনাশে।
সদা সুহাস্যযুতা ঐখানে বিরাজিতা
স্নেহ জাগায়ে ভবে সতী মম বিকাশে॥" —দশমহাবিদ্যা

ভৈরবী ভৈরবীর বহু মূর্ত্তি আছে; যথা—ত্রিপুরভৈরবী, ত্রিপুরবালা, কৌলেশ, সম্পৎপ্রদা, সকলসিদ্ধিদা, ভয়বিধ্বংসিনী, চৈতন্য, রুদ্র, ভুবনেশ্বরী। ভৈরবীর প্রসিদ্ধ ধ্যানমন্ত্র এইরূপ :

"উদ্যদ্ভানুসহস্রকান্তিমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং
রক্তালিপ্তপয়োধরাং জপবটীং বিদ্যামভীতিং বরং।
হস্তাব্জৈর্দ্দধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্রক্তারবিন্দশ্রিয়ং
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্নমুকুটাং বন্দে সমন্দস্মিতাম্॥"

উদীয়মান সহস্র সূর্য্যের মতো যাঁর দীপ্তি, পরিধানে রক্তিম পট্টবস্ত্র, গলে মুণ্ডমালা, স্তনদ্বয় রক্তে অল্পলিপ্ত, পদ্মহস্তে জপমালা, জ্ঞানমুদ্রা ও বরাভয়মুদ্রা, তিনটি নেত্র থেকে লাল পদ্মের দীপ্তি বিচ্ছুরিত, মাথায় রত্নখচিত মুকুট, মুখে মৃদুমন্দ হাসি—এই ভৈরবী দেবীর বন্দনা করি।

মহারাজ মহাতাব্ চাঁদ ভৈরবীর রূপ বর্ণনা করেছেন :

"একি রূপ নয়নে করি নিরীক্ষণ—
কে পারে স্বরূপ রূপ করিতে বর্ণন ?
জিনিয়ে কোটি অরুণ অঙ্গের হেরি বরণ,
বসন তরুণারুণ তাহে সুশোভন।
উচ্চ পীন পয়োধর, তাহে বহে রক্তধার,
মুণ্ডমালা ভয়ঙ্কর গলে বিভূষণ॥
জপমালা এক করে, জ্ঞানমুদ্রা ধরে পরে,
দ্বিকরে অভয় বরে, করেন ধারণ॥
সহ চন্দ্রকান্তমণি, মুকুটশিরোধারিণি,
হে ভৈরবী ত্রিনয়নী, দেহি চন্দ্রে শ্রীচরণ॥"

—ক. বি. শা. প. : জগজ্জননীর রূপ

কবি হেমচন্দ্রের পরিকল্পনানুযায়ী ভৈরবী ভক্তিবিধায়িত্রী।

"তার উপর আর নেহার ঋষিবর
কিবা শোভা সুন্দর ভৈরবী ভুবনে।
মাল্যে সুশোভিত মস্তক বিভূষিত,
রক্তলেপিত স্তন, কৃতা রক্তবসনে॥
জ্ঞান-অভয়-দাত্রী জীব উদ্ধার কর্ত্রী
সহস্র মিহির তুল্য শোভা দেহে ধারিণী।
রত্নকিরীটময় চন্দ্র উদয় হয়
ভক্তি বিধায়িনী ভৈরবী রূপিণী॥"

—দশমহাবিদ্যা

ছিন্নমস্তা রজঃপ্রধানা সত্ত্বগুণাত্মিকা। রজঃসত্ত্বতমোরেখাযোনিমণ্ডলে

ছিন্নমস্তা সূর্য্যকোটিসমপ্রভা মহাদেবী ছিন্নমস্তাকে পরপৃষ্ঠায় লিখিত-রূপে ধ্যান করতে হয় :

"ছিন্নমস্তাং করে বামে ধারয়ন্তীং স্বমস্তকম্।
প্রসারিতমুখীং ভীমাং লেলিহানাগ্রজিহ্বিকাম্॥
পিবন্তীং রৌধিরীং ধারাং নিজকণ্ঠবিনির্গতাম্।
বিকীর্ণকেশপাশাঞ্চ নানাপুষ্পসমন্বিতাম্॥
দক্ষিণে চ করে কর্ত্রীং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্।
দিগম্বরীং মহাঘোরাং প্রত্যালীঢ়পদস্থিতাম্॥
অস্থিমালাধরাং দেবীং নাগযজ্ঞোপবীতিনীম্।
রতিকামোপবিষ্টাঞ্চ সদা ধ্যায়ন্তি মন্ত্রিনঃ॥
সদা ষোড়শবর্ষীয়াং পীনোন্নতপয়োধরাম্।
বিপরীতরতাসক্তৌ ধ্যায়েদ্রতিমনোভবৌ॥
ডাকিনী-বর্ণিনীং যুক্তাম্ বামদক্ষিণযোগতঃ।
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্॥
বর্ণিনীং লোহিতাং সোম্যামুক্তকেশীং দিগম্বরীম্।
কপাল-কর্ত্তৃকা-হস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ॥
নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জ্বলত্তেজোময়ীমিব।
প্রত্যালীঢ়পদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্॥
সদা দ্বাদশবর্ষীয়ামস্থিমালা-বিভূষিতাম্।
ডাকিনীং বামপার্শ্বস্থাং কল্পসূর্য্যানলোপমাম্॥
বিদ্যুজ্জটাং ত্রিনয়নাং দন্তপংক্তিবলাকিনীম্।
দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্॥
মহাদেবীং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরীম্।
লেলিহান-মহাজিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্॥
কপালকর্ত্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ।
দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকুর্ব্বতীম্॥
করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম।
আভ্যাং নিষেব্যমানাং তাং ধ্যায়েদ্দেবীং বিচক্ষণঃ॥"

—হিন্দুসর্ব্বস্ব

ছিন্নমস্তা বাম হাতে আপন মস্তক ধরে আছেন। তাঁর প্রকটিতমুখ থেকে

জিহ্বার অগ্রভাগ নির্গত হয়ে নিজকণ্ঠনিঃসৃত রুধিরধারা পান করছে। তিনি আলুলায়িতকুন্তলা, তাঁর দেহ পুষ্পে ভূষিত। তাঁর ডান হাতে কর্ত্রী (ছোট খড়্গ)। তাঁর গলায় মুণ্ডমালা, তিনি উলঙ্গিনী, মহাভীষণা। তাঁর বাম পদ সম্মুখভাগে অবস্থিত। তিনি রতিকামের উপরে অবস্থিত। তিনি সব সময়ই ষোড়শবর্ষীয়া অর্থাৎ চিরকিশোরী। তাঁর স্তনযুগল স্থুল ও উন্নত।

রতিকামকে বিপরীতরতিকারী রূপে ধ্যান করতে হবে। দেবীর বামে ও দক্ষিণে ডাকিনী ও বর্ণিনী। উভয়েই দেবীর কণ্ঠনির্গত রক্তধারা পান করছেন। বর্ণিনী আরক্তবর্ণা, আলুলায়িতকুন্তলা, উলঙ্গিনী, হাতে নরকপাল ও কর্ত্তৃকা (ছোট খড়্গ)। তিনি নাগোপবীতধারিণী, যেন জলন্ততেজোমণ্ডিত, তাঁর বাম পদ অগ্রবর্ত্তী। তিনি বিবিধভূষণে সজ্জিতা, সবসময়ই বারো বছরের বালিকার মতো হাবভাববিশিষ্টা ও অস্থিমালাভূষিতা। বামপার্শ্বস্থিতা ডাকিনী যুগান্তের সূর্য্যানলের মতো, বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল তাঁর জটা, তাঁর তিনটি নেত্র, দন্তপংক্তি প্রকটিত। ঐরূপ দন্তশ্রেণীতে মুখ ভীষণ, স্তনযুগল স্থূল ও উন্নত। তিনি মহাভীষণা, আলুলায়িতকুন্তলা, উলঙ্গিনী, তাঁর বিরাট জিহ্বা লোল, গলায় মুণ্ডমালা। হাতে নরকপাল ও কর্ত্তৃকা (ছোট খড়্গ)। কপালধারিণী বলে ডাকিনী অতিভীষণদর্শনা।

সাধক পূর্ব্বোক্তরূপ বর্ণিনী ও ডাকিনীর দ্বারা বেষ্টিতা মহাদেবী ছিন্নমস্তার ধ্যান করছেন।

মহারাজ মহাতাব্ চাঁদ ছিন্নমস্তার এই রূপকে তাঁর পদে বাণীরূপ দিয়েছেন :

> "কে ও বিবসনা, রুধিরে মগনা, রক্তবর্ণাকার নারী।
> কমল কর্ণিকোপরি, যোনিরূপা যন্ত্র হেরি,
> বিপরীত রতিকারী রতিকাম তদুপরি ॥
> তদূর্দ্ধে বিরাজমানা প্রত্যালীঢ়-চরণা,
> মুণ্ডমালাবিভূষণা, ত্রিনয়না শঙ্করী।
> গলে অস্থিমালা স্থিতা, মুক্তকেশসুশোভিতা,
> শিরে সর্প বিভূষিতা, লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করী।
> শিরচ্ছেদ স্বয়ং করে, বাম করতলে ধরে,
> শোভিত অসি অপরে, চমৎকার মাধুরী।

কণ্ঠ নির্গত ত্রিধার, রুধির তার একধার,
ধরে নিজাধরোপর, ভীমরূপা ক্ষেমঙ্করী ॥
উন্মত্তা উলঙ্গিনী, পার্শ্বদ্বয়ে দ্বিযোগিনী,
শেষ দ্বিধারধারিণী, বিস্তার বর্ণন করি।
করি কৃপাবলোকন, শ্রীচরণে দিও স্থান,
চন্দ্রের এই নিবেদন, ছিন্নমস্তা শুভঙ্করী ॥"

—ক. বি. শ. প. ঃ জগজ্জননীর রূপ

কবি হেমচন্দ্রের কল্পনানুযায়ী ছিন্নমস্তা জগৎপাপহারিণী।

"হের আর উর্দ্ধ দেশে মদনোন্মত্তার বেশে
ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করী স্নাত নিজ রুধিরে ॥
বিকট উৎকট ফুর্ত্তি বিপরীত রতিমূর্ত্তি
জগতের সর্ব্বপাপ নিজ অঙ্গে ধরিয়া।
আপনার ঘৃণাকর নগ্নবেশ ঘোরতর
বিশ্বময় দেখাইছে নিজ রক্ত শুষিয়া ॥"

—দশমহাবিদ্যা

ধূমাবতী তমঃপ্রধানা। ধূমাবতীর ধ্যানের পরিকল্পনা এইরূপ :

ধূমাবতী "বিবর্ণা চঞ্চলারুষ্টা দীর্ঘা চ মলিনাম্বরা।
বিমুক্তকুন্তলারুক্ষা বিধবা বিরলদ্বিজা ॥
কাকধ্বজরথারূঢ়া বিলম্বিতপয়োধরা।
শূর্পহস্তাতিরুক্ষাক্ষী ধৃতহস্তা বরান্বিতা ॥
ক্ষুৎপিপাসার্দিতা নিত্যং ভয়দা কলহাস্পদা।"

ধূমাবতীর বর্ণ বিকৃত। তিনি চাঞ্চল্যযুক্তা, রোষান্বিতা, দীর্ঘদেহা, মলিন-বস্ত্রপরিহিতা, আলুলায়িত-কেশা, কোপনস্বভাবা, স্বামীহীনা, বিরলদন্তা। ধূমাবতীর রথে কাক। তাঁর স্তনদ্বয় শিথিল। তাঁর হাতে কুলো, চোখের দৃষ্টি অতি তীব্র, হাতে বরমুদ্রা। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তিনি নিরন্তরক্লিষ্টা। তিনি ভয়ঙ্করী ও কলহপরায়ণা।

মহারাজ মহাতাব্‌ চাঁদের পদে ধূমাবতীর রূপ :

"বিষণ্ণা এ কার নারী চিনিতে নারি।
রুক্ষবর্ণা ধূমাবতী, পয়োধর নত অতি,
কলহ করিতে মতি, মলিনাংশু পরি।
কাকধ্বজ রথে বালা, ক্ষুধাতুরা সচঞ্চলা,
দশনাবলি বিরলা, দীর্ঘকায়া হেরি।
শূর্প বাম করে ধরে, অপর সহিত বরে,
দ্বিকরে কি শোভা করে, নয়ন কোটরস্থিত,
চন্দ্রে শ্রীচরণাশ্রিত কর শঙ্করী॥"

—ক. বি. শা. প.: জগজ্জননীর রূপ

কবি হেমচন্দ্রের মতে শ্রমক্লান্ত প্রাণিগণের ক্লেশ অপনোদনের জন্যই মহাদেবীর ধূমাবতীবেশ।

"কাছে তার দলমল যে ভুবন উজ্জ্বল
আরও সুনির্ম্মল জিনি অন্য ভুবনে—
দীর্ঘা, বিরলরদ, শুভ্রবরণচ্ছদ,
কুটিলনয়না বামা ধূমাবতী ধরণে॥
লম্বিত পয়োধরা ক্ষুৎপিপাসাতুরা
বিমুক্তকেশী বামা জীবদুঃখ বিনাশে।
শ্রম ক্লান্ত প্রাণিক্লেশ ঘুচাইতে রুক্ষ বেশ
বিধবার রূপে নিত্যসতী হোথা বিকাশে।
বিবর্ণা, অতি চঞ্চলা হস্তে স্থাপিত কুলা,
রথধ্বজোপরি কাকচিহ্ন প্রকাশে॥"

—দশমহাবিদ্যা

বগলা তমঃপ্রধানা। বগলার ধ্যানরূপ নিম্নমতো:

বগলা 'মধ্যে সুধাব্ধিমণিমণ্ডপরত্নবেদীসিংহাসনোপরিগতাং পরিপীতবর্ণাম।
পীতাম্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং দেবীং স্মরামি ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাম্॥
জিহ্বাগ্রমাদায় করেণ দেবীং বামেন শত্রূন্ পরিপীড়য়ন্তীম্।
গদাভিঘাতেন চ দক্ষিণেন পীতাম্বরাঢ্যাং দ্বিভুজাং নমামি॥"

সুধা-সমুদ্রের মধ্যে মণিমণ্ডপ, তার উপর রত্নবেদী, তার উপর সিংহাসন, তার

উপর মহাদেবী বগলা উপবিষ্টা। তাঁর বর্ণ অতিপীত, অঙ্গ পীতবর্ণ পরিধেয়বস্ত্র, ভূষণ ও মাল্যে ভূষিত। তিনি এক হাতে শত্রুর জিহ্বা ও অন্য হাতে মুদ্গর ধারণ করে আছেন। তিনি বাম হাতে শত্রুর জিহ্বা ধরে ডান হাতে তাকে গদাপ্রহারের দ্বারা পীড়িত করছেন। পূর্ব্বোক্তরূপা পীতবসনপরিহিতা মহাদেবী বগলাকে স্মরণ ও প্রণাম করি।

মহারাজ মহাতাব্ চাঁদের পদে বগলার রূপ অপূর্ব্ব কাব্যোৎকর্ষমণ্ডিত বাণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে :

"একি রূপ অপরূপ করি নিরীক্ষণ, অসাধ্য বর্ণন।
রূপের মাধুরী হেরি জুড়াল নয়ন॥
মণিমণ্ডপোপরে, রত্নবেদী শোভা করে,
সিংহাসন তদুপরে অতি সুগঠন।
সিংহাসনে বিরাজমান, উজ্জ্বল পীতবরণ,
পীতাম্বর পরিধান, তাহে সুশোভন॥
কিবা শোভে আভরণ, পুষ্পমাল্য বিভূষণ,
সুগন্ধি অঙ্গ লেপন, কুসুমচন্দন।
শব্যে শত্রুজিহ্বা ধরি, মুদ্গর দক্ষ করে করি,
ক্রোধিতা হয়ে শঙ্করী করেন তাড়ন॥
বগলা করুণা করি, চন্দ্রে দিয়ে চরণ তরী,
পার কর ভব বারি, লইলাম শরণ॥"

—ক. বি. শা. প. : জগজ্জননীর রূপ

কবি হেমচন্দ্রের কাছে বগলা দারিদ্র্যদলনী।

"জীব নিস্তারে সতী ঐ হের চিন্তাবতী
দারিদ্র্যদলনীরূপ বগলার শরীরে।" —দশমহাবিদ্যা

মাতঙ্গী তমঃপ্রধানা। মাতঙ্গীর ধ্যানের রূপ হ'ল :

মাতঙ্গী "শ্যামাঙ্গীং শশিশেখরাং ত্রিনয়নাং রত্নসিংহাসনস্থিতাম্।
বেদৈর্ব্বাহুদণ্ডৈরসিখেটকপাশাঙ্কুশধরাম্॥"

—মাতঙ্গীর অঙ্গ শ্যামবর্ণ, তাঁর ললাটে চন্দ্রকলা, তিনটি নেত্র। তিনি রত্নসিংহাসনে উপবিষ্টা। তিনি চার হাতে খড়্গ, খেটক, পাশ ও অঙ্কুশ ধরে আছেন।

মহারাজ মহাতাব্ চাঁদের পদে মাতঙ্গীর রূপবর্ণনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে :

"অপরূপ কামিনী, নীরদবরণী, শশধর আভা জিনি।
কলানাথ শোভা শিরে, সিংহাসনাসন করে,
বিরাজিতা তদুপরে, চতুর্ভুজধারিণী ॥
খেট খড়্গ যুগ্ম করে, পাশাঙ্কুশধরাপরে,
চন্দ্রে তার কৃপা করে, হে মাতঙ্গী ত্রিনয়নী ॥"

—ক. বি. শা. প. : জগজ্জননীর রূপ

হেমচন্দ্রের পরিকল্পনায় মাতঙ্গী মূর্তিমতী প্রীতি।

"সুচারু মন-হর হের নিকটে তার
অন্য ভুবন কিবা দোদুল্য গগনে।
বীণা বাজিছে করে বাদনে থরে থরে
কুন্তল দলমল সুন্দর বদনে ॥
কলহংস শোভা সম শ্বেত মাল্য নিরুপম
শ্যামাঙ্গী শঙ্খের বালা দুই করে পরেছে।
প্রীতি তুলি ভবতলে সর্ব্ব জীব দুঃখ দলে
মাতঙ্গীর রূপ সতী পদ্মদলে বসেছে ॥" —দশমহাবিদ্যা

কমলাও তমঃপ্রধানা। কমলার ধ্যানমন্ত্র এই প্রকার :

কমলা 'কান্ত্যা কাঞ্চনসন্নিভাং হিমগিরিপ্রখ্যৈশ্চতুর্ভির্গজৈঃ
হস্তোৎক্ষিপ্তহিরন্ময়ামৃতঘটৈরাসিচ্যমানাং শ্রিয়ম্।
বিভ্রাণাং বরমব্জযুগ্মমভয়ং হস্তৈঃ কিরীটোজ্জ্বলাং
ক্ষৌমাবদ্ধনিতম্ববিম্বললিতাং বন্দেঽরবিন্দস্থিতাম্ ॥'

কমলার রঙ সোনার মতো, তাঁর চারিদিকে হিমাচলসদৃশ প্রকাণ্ড চারটি হস্তী। তাদের শুণ্ডধৃত সুবর্ণঘটের অমৃতবারিতে কমলার অভিষেক। কমলা চার হাতে দুটি পদ্ম ও বরাভয়মুদ্রা ধরে আছেন। তিনি উজ্জ্বলমুকুটে ভূষিতা। পট্টবস্ত্রপরিহিত তাঁর নিতম্ব দেখতে সুন্দর। পূর্ব্বোক্তরূপা রক্তপদ্মস্থিতা কমলা মহাদেবীর আমি বন্দনা করি।

মহারাজ মহাতাব্ চাঁদের পদে শব্দ-সুষমায় ও ছন্দোমাধুর্য্যে কমলার কান্তরূপ বাণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে :

"একি রূপ হেরি নয়নে, বর্ণের লাবণ্য
সুদুষ্কর বর্ণনে।
প্রফুল্ল কমলাসন, তদুপরি কৃত্তাসন, চপলা জিত বরণ,
মৃদুহাস্য চন্দ্রাননে॥
সুললিত চতুর্ভুজ, সব্যে অভয় অম্বুজ, দক্ষিণে বর
সরোজ অতি সুশোভন।
বিগলিত মুক্তাহার, শোভা পয়োধর পর, কমলা করুণা কর,
চন্দ্রে রাখ শ্রীচরণে॥"

—ক. বি. শা. প. : জগজ্জননীর রূপ

হেমচন্দ্রের কল্পনায় কমলা মূর্ত্তিমতী দয়া।

"নেহার তার পরি শোভে কমলার পুরী,
রোগ শোক তাপ হরি, জীবিতের জীবনে।
কিবা বেশ সুমোহন লীলারসে নিমগন,
পরমা প্রকৃতি সতী সর্ব্বশেষ ভুবনে॥
সুবর্ণবরণোত্তম কটিতে পিন্ধন ক্ষোম,
স্বর্ণঘটে চারি করী শিরে নীর ঢালিছে।
পদ্মাসনা করে পদ্ম সতী সর্ব্ব সুখসদ্ম,
দয়াতে ডুবায়ে ভব জীবদুঃখ হরিছে॥" —দশমহাবিদ্যা

তান্ত্রিক সিদ্ধান্তানুযায়ী সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার দুটি অধ্বা—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ। মহা-
শুদ্ধ মায়া মহামায়া মায়ার অস্তিত্ব নিম্নরূপ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় :

'শুদ্ধাধ্বাঽয়ং সোপাদানঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ। ন চাত্র সমবেতশক্তেরেব উপাদানত্বেন সিদ্ধিরস্তু ইতি বাচ্যম্। তস্যা উপাদানকারণত্বে অচেতনত্বাপত্ত্যা-চেতনশিবসমবায়াযোগাৎ।[১] অত্র মায়াপ্রকৃত্যোর্মোহকত্বেন প্রবুদ্ধপুরুষ—কায়-

১। 'শিবে কর্ত্তরি তাদাত্ম্যান্ নেয়ং কুণ্ডলিনী স্থিতা।
পাদানত্বতো হেতোঃ কুলালে মৃত্তিকা যথা॥'
—শতরত্নসংগ্রহের ২৩ কারিকার ভাষ্যে উদ্ধৃত পৌষ্কর বচন

কারণরূপ—শুদ্ধাধ্বকারণত্বাযোগেন পরিশেষাৎ তদনুকারি-কারণতয়া মহামায়া-সিদ্ধিঃ।'[১] —উমাপতি শিবাচার্য্য সংগৃহীত শতরত্নসংগ্রহ—২৩ শ্লোক-ভাষ্য

যেহেতু শুদ্ধ অধ্বা ঘটের মতো কার্য্য, সেহেতু শুদ্ধ অধ্বার কোন উপাদান-কারণ নিশ্চয়ই থাকবে। সমবায়িশক্তি এই উপাদানকারণ হতে পারে না। কারণ সমবায়িশক্তি যদি উপাদানকারণ হয়, তাহ'লে অচেতন হতে হবে এবং অচেতন হ'লে চেতন শিবের সঙ্গে তার সম্পর্কলোপ অবশ্যম্ভাবী। মায়া বা প্রকৃতি মোহক। এইজন্য যে শুদ্ধাধ্ব প্রবুদ্ধ পুরুষের কায়পরিগ্রহের কারণ, সেই শুদ্ধাধ্বের তারা কারণ হতে পারে না। অতএব মায়া বা প্রকৃতির অনুকারী কোন উপাদানকারণ শুদ্ধাধ্বের ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বিদ্যমান। এই উপাদানকারণই মহামায়া।

শতরত্নসংগ্রহে উমাপতি শিবাচার্য্য মহামায়ারূপ নির্ণয়প্রসঙ্গে বিশ্বসারোত্তর সূত্র উৎকলিত করেছেন :

'বাগীশ্বরী চ শুদ্ধাধ্ব-মূলোপাদানকারণম্।
নোপাদানং বিনা কার্য্যং কদাচিদুপলভ্যতে॥'

শুদ্ধ অধ্বার মূলভূত উপাদানকারণই বাগীশ্বরী মহামায়া। উপাদানকারণ নাই, অথচ কার্য্য উৎপন্ন হয়েছে—এইরূপ কখনই দেখা যায় না।

উপাসনাক্রমেও ষটচক্রে মাতৃকান্যাসে এই বাগীশ্বরীর একটি বিশিষ্ট রূপকল্পনা দেখা যায়।

বাগীশ্বরী

'পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাম্
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥'

—মহানির্ব্বাণতন্ত্র : পঞ্চম উল্লাস—১২ শ্লোক

১। 'মায়াপি নাত্রোপাদানং মোহকত্বাৎ স্বতেজসা।
যতঃ প্রবুদ্ধপুংস্কায়করণানাং ন কারণম্॥
শুদ্ধাধ্ববর্ত্তিনঃ সর্ব্বে প্রবুদ্ধাঃ, শিবতেজসা।
তস্মাচ্ছুদ্ধাধ্বনশ্চাস্য স্বানুকার্য্যেব কারণম্॥
ইষ্যতাং কুণ্ডলিন্যাখ্যং শুদ্ধমেতৎ দ্বিজোত্তমাঃ। ইতি'
—শতরত্নসংগ্রহের ২৩ কারিকার ভাষ্যে উদ্ধৃত পৌষ্কর বচন

যার মুখ, হাত, পা, কটি ও বুক পঞ্চাশটি বর্ণে বিভক্ত, যাঁর মাথায় চন্দ্রকলা, যাঁর স্তনদ্বয় স্থূল ও উন্নত, যাঁর চার হাতে জ্ঞানমুদ্রা, অক্ষমালা, সুধাপূর্ণ কলস ও বিদ্যা শোভা পাচ্ছে—সেই নির্ম্মলকান্তি ত্রিনয়না বাগীশ্বরীকে আশ্রয় করি।

মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সপ্তম উল্লাসে যে আদ্যাকালিকাস্তোত্র দেখা যায়, তাতেও কালিকাকে কলাবতী অর্থাৎ বাগীশ্বরী এই আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে।[১]

হোমেও বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বরীর ধ্যান ও পুষ্পোপহারের বিধি দেখা যায়।

'বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরলোচনাং।
বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্॥
বাগীশ্বরসহিতবাগীশ্বর্য্যৈ নমঃ।'

বাগীশ্বরের (পরমশিব) সঙ্গে বিরাজমানা, ঋতুস্নাতা, নীলপদ্মের মতো অক্ষি-শোভাবিশিষ্টা লাস্যসমন্বিতা বাগীশ্বরী দেবীকে ধ্যান করি। বাগীশ্বর সহিত বাগীশ্বরী দেবীকে নমস্কার।

সমবায়িশক্তির নিম্নে অবস্থিতা কুণ্ডলিনীনামধেয়া শিবের পরিগ্রহশক্তিই মহামায়া নামে অভিহিতা হন। মহামায়া থেকে নাদ, নাদ থেকে বিন্দু, বিন্দু থেকে সত্তত্ত্ব, সত্তত্ত্ব থেকে ঈশতত্ত্ব, ঈশতত্ত্ব থেকে বিদ্যাতত্ত্ব উৎপন্ন হয়।

বিদ্যাতত্ত্ব থেকে বিদ্যাতত্ত্বাধিপতি, ভৃগুণী প্রভৃতি সাতজন বিদ্যারাজ্ঞী, সপ্তকোটি মহামন্ত্র, বাচকশব্দরাজি, বৈখরী প্রভৃতি বাগ্‌বৃত্তি ও কামিকাদি অষ্টাবিংশতি তন্ত্র উদ্ভূত হয়।[২]

১। 'হ্রীঁ কালী শ্রীঁ করালা চ ক্রীং কল্যাণী কলাবতী।
কমলা কলিদর্পঘ্নী কপর্দ্দীশকৃপান্বিতা॥' —মহানির্ব্বাণতন্ত্র : সপ্তম উল্লাস—১২ শ্লোক

২। 'যাঽথ কুণ্ডলিনী শক্তির্মায়াকর্ম্মানুসারিণী।
নাদবিন্দ্বাদিকং কার্য্যং তস্যা ইতি জগৎস্থিতিঃ॥' —শতরত্নসংগ্রহ, ২৪ শ্লোক

অত্র শিবেন সমবায়িশক্ত্যা মহামায়ায়াঃ সকাশাৎ নাদাভিধানং তত্ত্বং প্রথমমুৎপদ্যতে। ইদমেব শিবাধারকতয়া শিবতত্ত্বমিত্যপি বদন্তি। ততঃ সকাশাৎ বিন্দুসংজ্ঞকং তত্ত্বমুৎপদ্যতে। ইদঞ্চ তত্ত্বং শক্ত্যাধারকতয়া শক্তিতত্ত্বম্। ততঃ শক্তিতত্ত্বাৎ সদাখ্যং তত্ত্বম্। ততঃ সদাখ্যাৎ ঈশাখ্যং তত্ত্বম্। ঈশাখ্যাৎ বিদ্যাখ্যং তত্ত্বমিতি ক্রমেণ শুদ্ধানি পঞ্চতত্ত্বানি জায়ন্তে। তত্র বিদ্যাতত্ত্বে বিদ্যাতত্ত্বাধিপতিশ্চ ভৃগুণ্যাদয়ঃ সপ্ত বিদ্যারাজ্ঞ্যশ্চ, তদধীনাঃ সপ্তকোটিমহামন্ত্রাশ্চ, বাচকশব্দা ব্যোমব্যাপ্যক্ষরাদয়শ্চ, বৈখর্য্যাদয়শ্চ কামিকাদ্যষ্টাবিংশতিতন্ত্রাণি চ বর্ত্তন্তে। যথা মৃগেন্দ্রে—

মহামায়া দ্বিবিধা—বস্ত্বাত্মিকা ও শব্দাত্মিকা। মহামায়া থেকে বস্তু ও শব্দ উভয়ই উৎপন্ন হয়ে থাকে। মহামায়া থেকে শব্দসৃষ্টির ক্রম এইরূপ :

শিবেচ্ছায় প্রথমেই ক্ষুব্ধা মহামায়া থেকে নাদ উৎপন্ন হয়। নাদ থেকে বিন্দু, বিন্দু থেকে অক্ষর ও অক্ষর থেকে মাতৃকা উৎপন্ন হয়।

বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্মা বাক্ মহামায়ারই কার্য্য।

'তস্যাশ্চতস্রো বাগ্‌রূপা বৃত্তয়ো বৈখর্য্যাদয়ঃ।
বৈখরী মধ্যমা চান্যা পশ্যন্তী সূক্ষ্মসংজ্ঞিতা॥' ২৪

—শতরত্নসংগ্রহ, ২৪ শ্লোক

বৈখরী, মধ্যমা, পশ্যন্তী ও সূক্ষ্ম এই চারিটি বাকের রূপ মহামায়ারই বৃত্তি অর্থাৎ কার্য্য।

বৈয়াকরণগণ শব্দকে ব্রহ্মস্বরূপ এবং এই কারণে নিত্য বলেছেন।

বাক্যপদীয় শব্দব্রহ্ম

'অনাদিনিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরম্।
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যতঃ॥'

—বাক্যপদীয় প্রথম শ্লোক

যার আদি ও অন্ত নাই এরূপ নিত্য শব্দতত্ত্বরূপ ব্রহ্ম আকাশ প্রভৃতির আকারে বিবর্ত্তিত হন অর্থাৎ শুক্তি যেমন রজতাকারে অবভাসিত হয়, তেমনই অন্যথাভানের বিষয় হন। এইভাবেই জগৎ-প্রপঞ্চের অবভাস সম্ভব হয়।

কিন্তু বাক্যপদীয়কার পর শ্লোকেই শক্তি-শক্তিমানের অভেদরূপ শাক্ত সিদ্ধান্তকেই অনুসরণ করে পূর্ব্বোক্ত শব্দব্রহ্ম সম্বন্ধে বলছেন :

ভৃগুণী ব্রহ্মবেতালী স্থাণুমত্যম্বিকা পরা।
রূপিণী নন্দিনী জ্বালা সপ্ত সপ্তার্দ্ধদেশ্বরাঃ॥
প্রাধান্যেন স্থিতা হ্যেতা বিদ্যা মন্ত্রাশ্চ সুব্রত।
একাশীতিপদা দেবী যা সা শক্তিঃ শিবাত্মিকা॥
শান্তাৎ বিনির্গতা পূর্ব্বং স্থানং তস্যাস্তদাত্মকম্।
লয়ে চ শিবতত্ত্বাখ্যঃ ব্যক্তেণ বিন্দ্বাত্মকং পরম্॥
ভোগে সদাশিবস্থানং ঈশ্বরাখ্যং চ শাসনম্।
বিদ্যাতত্ত্বেঽধিকারঃ স্যাৎ যোনির্জ্ঞেয়া সদৈব হি॥
তস্যামেব স্থিতা মন্ত্রা বিদ্যাশ্চ বিবিধা মুনে!
ইয়ং তাবন্মহাশক্তিঃ শিবস্য পরমাত্মনঃ॥ ইতি' —ঐ শ্লোকের ব

'একমেব যদাম্নাতং ভিন্নং শক্তিব্যপাশ্রয়াৎ।

অপৃথক্‌ত্বেঽপি শক্তিভ্যঃ পৃথক্‌ত্বেনেব বর্ত্ততে ॥'[১]

—বাক্যপদীয় ২ শ্লোক

যে শব্দব্রহ্ম এক বলে কথিত, তিনিই ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আশ্রয় করে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রতীয়মান হন। আপন স্বরূপভূত শক্তিগুলি থেকে শব্দব্রহ্ম আসলে অভিন্ন হ'লেও ব্যবহারদশায় শক্তিগুলি থেকে ভিন্ন বলেই অনুভূত হন।

বাক্যপদীয়কার শক্তিদর্শনের মতো কালশক্তিকে স্বীকার করেছেন:

'অব্যাহতাঃ কলা যস্য কালশক্তিমুপাশ্রিতাঃ।

জন্মাদয়ো বিকারাঃ ষড্‌ভাবভেদস্য যোনয়ঃ ॥' —বাক্যপদীয় ৩ শ্লোক

জন্ম, অস্তিত্ব, বিবৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ ব্রহ্মের নাই। কিন্তু ব্রহ্মের কালশক্তি এই ছয় প্রকার বিকারকে আভাসিত করে পদার্থগুলির পারস্পরিক ভেদের কারণ হয়।

এখানে প্রকাশটীকাকার শ্রীনারায়ণদত্ত শর্ম্মাত্রিপাঠীর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

'স্বরূপতো নিরয়বস্য সর্ব্বধর্ম্মাতীতস্য ব্রহ্মণঃ কালাখ্যাং শক্তিমাশ্রিত্য জন্মাদিরূপাঃ শক্তয়ঃ কৃৎস্নস্য জগতোঽবস্থান্তরপ্রতীতিহেতবো ভবন্তি, অতএব জন্মাদিগতং পৌর্ব্বাপর্য্যং ভগবতঃ কালশক্তিঃ ঘটাদিষু আরোপয়তি ইতি।'

স্বরূপের দিক দিয়ে ব্রহ্মের কোন অবয়ব বা ধর্ম্ম নাই। কালশক্তির মাধ্যমেই সমগ্র জগতের জন্ম, অস্তিত্ব, বিবৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও বিনাশ এই

১। "স্বাত্মভূতাভ্যঃ শক্তিভ্যঃ পৃথক্‌ত্বেনেব ভিন্নত্বেনেব বর্ত্ততে পৃথক্‌ত্বমিব অবসীয়তে ইত্যর্থঃ। অত্র 'ইব' শব্দস্য প্রয়োগাৎ ভেদস্য কাল্পনিকত্বং সূচিতম্।"

—বাক্যপদীয়কার নারায়ণদত্ত শর্ম্মাত্রিপাঠী-বিরচিত প্রকাশটীকা

'কণ্ঠোষ্ঠ্যমীশ্বরীতত্ত্বে বিদ্যায়াং বৈখরী স্থিতা।

সূক্ষ্মাদয়ো বস্তি-নাভি-হৃদ্-গ্রীবাস্বেষু সংস্থিতাঃ ॥

বৈখর্য্যাস্যশ্রোত্রগতা কণ্ঠোষ্ঠ্যং শ্রুতিং গতা।

সবিকল্পা মধ্যমাস্যাৎ পশ্যন্তী নির্বিকল্পযুক্ ॥

আসাং সূক্ষ্মা কারণং স্যাৎ ব্রহ্মঘোষং তদুচ্যতে ॥'

—শতরত্নসংগ্রহের ২৯ শ্লোকের ভাষ্যে উদ্ধৃত কারিকা সিদ্ধান্তরহস্যসার

'সূক্ষ্মা বৃত্তির্নাদঃ, পশ্যন্তী বৃত্তির্বিন্দুঃ, মধ্যমা বৃত্তিরক্ষরং, বৈখরী বৃত্তির্মাতৃকা ইত্যুচ্যতে।'

—শতরত্নসংগ্রহের ২৯ শ্লোকের ভাষ্য

ছয় প্রকার পরিবর্ত্তনের সংঘটন হয়। কালশক্তি পদার্থসমূহে জন্মাদিগত পৌর্ব্বাপর্য্যের আরোপ করে।

এই কালশক্তিই ভোক্তা, ভোক্তব্য ও ভোগরূপে ত্রিধা বিভক্ত হয়ে লোকব্যবহারকে সম্ভব করে তোলে।[১]

পুরাণাদিতে মহামায়ালক্ষণ

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে প্রযুক্ত 'মহামায়া' শব্দের ব্যাখ্যায় নাগোজীভট্ট মহামায়াকে 'বিসদৃশ-প্রতীতি-সাধিকা ঈশ্বর-শক্তি' বলেছেন। তত্ত্বপ্রকাশিকাটীকাকারের মতে, মহামায়া হ'ল 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি'। মহামায়া উপাসকদের কাজের জন্য নানা রূপ ও নাম ধারণ করে থাকেন। স্বামী জগদীশ্বরানন্দ তাঁর সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী গ্রন্থে মহামায়ার স্বরূপ নির্ণয়প্রসঙ্গে দেবীভাগবত-কৃত মহামায়ালক্ষণ উৎকলিত করেছেন :

'যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপো স্বভাবোঽপি লোকরঞ্জনহেতবে ॥ ৫৮
তথৈষা দেবকার্য্যার্থমরূপাণি স্বলীলয়া।
করোতি বহুরূপাণি নির্গুণা স্বগুণানি চ ॥'

—দেবীভাগবত : ৫ম স্কন্ধ—৮ম অধ্যায়

যেমন নট একরূপা হ'লেও রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের তৃপ্তিবিধানের জন্য নানারূপে দর্শন দেয়, তেমনি এই নির্গুণা দেবী নিরাকারা হয়েও আপন লীলাবশে সত্ত্বাদিগুণসমন্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন।

কালিকাপুরাণপ্রোক্ত মহামায়ালক্ষণও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য :

'গর্ভান্তর্জ্ঞানসম্পন্নং প্রেরিতং সূতিমারুতৈঃ।
উৎপন্নং জ্ঞানরহিতং কুরুতে যা নিরন্তরম্ ॥ ১

১। 'একস্য সর্ব্ববীজস্য যস্য চেয়মনেকধা।
ভোক্তৃ-ভোক্তব্যরূপেণ ভোগরূপেণ চ স্থিতিঃ ॥' ৪ —বাক্যপদীয় ৪ শ্লোক
'অত্র কালশক্তি সমাবিষ্টা ব্রহ্মশক্তিরেব ভোক্ত্রাদিরূপেণ লোকব্যবহারায় কল্পতে ইতি তত্ত্বম্।'
—পণ্ডিত নারায়ণদত্ত শর্ম্মাত্রিপাঠী-বিরচিত প্রকাশটীকা

পূর্ব্বাতিপূর্ব্বসংস্কার-সংঘাতেন নিয়োজ্য চ।
অহরাদৌ ততো মোহমমত্বজ্ঞানসংশয়ম্ ॥ ২
ক্রোধোপরোধলোভেষু ক্ষিপ্ত্বা ক্ষিপ্ত্বা পুনঃ পুনঃ।
পশ্চাৎ কামেন সংযোজ্য চিন্তাযুক্তমহর্নিশম্ ॥ ৩
আমোদযুক্তং ব্যসনাসক্তং জন্তুং করোতি যা।
মহামায়েতি সংপ্রোক্তা তেন সা জগদীশ্বরী ॥' ৪

—স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত শ্রীশ্রীচণ্ডী : প্রথম চরিত্র—
১ম অধ্যায়, ৩ শ্লোকের পাদটীকা

র্ভমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানযুক্ত শিশু প্রসূতিবায়ুর দ্বারা ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই তাকে নি নিরন্তর জ্ঞানশূন্য করেন, পূর্ব্বাপূর্ব্ব জন্মের সংস্কারসমূহের সঙ্গে যিনি াশুকে তার জন্মদিনেই সংযুক্ত করেন এবং মোহ ও মমত্ববোধ তার মনে াগরিত করে তার জ্ঞানকে সংশয়াচ্ছন্ন করেন, যিনি জীবকে ক্রোধ, উপরোধ লোভে পুনঃপুনঃ ক্ষেপণ করে পরে তাকে কামাসক্ত করে সর্ব্বদাই চিন্তাযুক্ত, মোদনিরত ও ব্যসনে লালসাগ্রস্ত করেন, সেই পরমেশ্বরীই এই এই কারণে হামায়ারূপে অভিহিতা হন।

মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আছে যে, পুত্রকলত্রের দ্বারা পরিত্যক্ত, াত্মীয়স্বজনের দ্বারা লাঞ্ছিত ও রাজ্যসম্পদ্চ্যুত সুরথরাজা যখন তাঁর ও তাঁর ান দুঃখে পতিত সমাধি বৈশ্য সম্বন্ধে মেধামুনিকে প্রশ্ন করলেন :

'এবমেষ তথাহঞ্চ দ্বাবপ্যত্যন্তদুঃখিতৌ। ৪৩
দৃষ্টদোষেহপি বিষয়ে মমত্বাকৃষ্টমানসৌ ॥
তৎ কেনৈতন্মহাভাগ যন্মোহো জ্ঞানিনোরপি। ৪৪
মমাস্য চ ভবত্যেষা বিবেকান্ধস্য মূঢ়তা ॥' ৪৫

—শ্রীশ্রীচণ্ডী : প্রথম চরিত্র—১ম অধ্যায়, ৪৩—৪৫ শ্লোক

ই প্রকারে ইনি সমাধি বৈশ্য ও আমি সুরথরাজা দুজনেই অত্যন্ত দুঃখিত হ। কারণ বিষয়ে দোষ দর্শন করলেও আমাদের মন সেই সেই বিষয়ের তি মমতাযুক্ত হয়ে রয়েছে। সুতরাং, হে মহর্ষি! বলুন তো, সমাধি শ্য ও আমার মতো জ্ঞানী ব্যক্তির কেন এরূপ মোহ উৎপন্ন হচ্ছে? বিবেক-ন ব্যক্তির পক্ষেই এইরূপ মোহগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক।

তখন মেধামুনি উত্তর করলেন :[১]

'তথাপি মমতাবর্ত্তে মোহগর্ত্তে নিপাতিতাঃ। ৫৩
মহামায়াপ্রভাবেণ সংসারস্থিতিকারিণা ॥
তন্নাত্র বিস্ময়ঃ কার্য্যো যোগনিদ্রা জগৎপতেঃ। ৫৪
মহামায়া হরেশ্চৈতত্তয়া সংমোহ্যতে জগৎ ॥
জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। ৫৫
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি ॥
তয়া বিসৃজ্যতে বিশ্বং জগদেতচ্চরাচরম্। ৫৬
সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে ॥
সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী। ৫৭
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্ব্বেশ্বরেশ্বরী ॥' ৫৮

—শ্রীশ্রীচণ্ডী : প্রথম চরিত্র—১ম অধ্যায়, ৫৩—৫৮ শ্লো

তথাপি মনুষ্য ও মনুষ্যেতর প্রাণিগণ সুরথরাজার অভিপ্রায়ানুযায়ী জ্ঞানব হ'লেও সংসারের স্থিতিকারণ মহামায়ার প্রভাববশতঃ জীবগণ মমত্ববোধ আবর্ত্ত ও মোহরূপ গর্ত্তে নিক্ষিপ্ত হয়। এই মহামায়াই জগদীশ্বর ব্যাপক বি

১। 'ঋষিরুবাচ। ৪৬
জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তোর্বিষয়গোচরে। ৪৭
বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতি চৈবং পৃথক্ পৃথক্।
দিবান্ধাঃ প্রাণিনঃ কেচিদ্রাত্রাবন্ধাস্তথাপরে। ৪৮
কেচিদ্দিবা তথা রাত্রৌ প্রাণিনস্তুল্যদৃষ্টয়ঃ ॥
জ্ঞানিনো মনুজাঃ সত্যং কিন্তু তে ন হি কেবলম্। ৪৯
যতো হি জ্ঞানিনো সর্ব্বে পশুপক্ষিমৃগাদয়ঃ ॥
জ্ঞানঞ্চ তৎ মনুষ্যাণাং যত্তেষাং মৃগপক্ষিণাম্। ৫০
মনুষ্যাণাং যত্তেষাং তুল্যমন্যৎ তথোভয়োঃ ॥
জ্ঞানেঽপি সতি পশ্যৈতান্ পতগাহ্ছাবচঞ্চুষু। ৫১
কণমোক্ষাদৃতান্ মোহাৎ পীড্যমানানপি ক্ষুধা ॥
মানুষা মনুজব্যাঘ্র সাভিলাষাঃ সুতান্ প্রতি। ৫২
লোভাৎ প্রত্যুপকারায় নন্বেতে কিং ন পশ্যসি ॥'

—শ্রীশ্রীচণ্ডী : প্রথম চরিত্র—প্রথম অধ্যায়, ৪৬—৫২ শ্লো

যোগনিদ্রা। সুতরাং তিনিই যে সমস্ত জগৎকে মোহে আচ্ছন্ন রাখবেন, তাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি থাকতে পারে। বিবেকহীনগণের কি কথা। এই ভগবতী মহামায়া দেবী জ্ঞানিগণের চিত্তকেই বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে মোহাচ্ছন্ন করেন। এই মহামায়াই চরাচর বিশ্বজগৎকে সৃষ্টি করেন, প্রসন্না হয়ে ইনিই মনুষ্যগণের মোক্ষের জন্য আকাঙ্ক্ষিত বর প্রদান করেন। ইনি সংসার থেকে মুক্তির কারণরূপিণী পরমা নিত্যা ব্রহ্ম-বিদ্যা, আবার ইনিই সংসার-বন্ধনের কারণস্বরূপিণী অবিদ্যা এবং ব্রহ্মাদি সকল ঈশ্বরের ঈশ্বরী।

শতরত্নসংগ্রহকার উমাপতি শিবাচার্য্য 'মায়া' পদের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় এইরূপে

অশুদ্ধ মায়া করেছেন :

'মাতি অস্যাং প্রলয়ে সর্ব্বজগৎ, ময়তি অস্মাৎ জগদিতি বা মায়া', প্রলয়কালে ইহাতে সমস্ত জগৎ সংহৃত হয় অথবা ইহা হতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, তাই ইহাকে মায়া বলে।[১]

এইরূপ অনুমানের দ্বারা উমাপতি শিবাচার্য্য মায়াতত্ত্ব সপ্রমাণ করেছেন :

'জগদিদং সোপাদানম্ উৎপত্তিধর্ম্মকত্বাৎ যথা পটাদিঃ'

—শতরত্নসংগ্রহের ২৬ শ্লোকের ভাষ্য

যেহেতু এই জগতের উৎপত্তি হয়েছে, সেই হেতু এই জগতের উপাদানকারণও আছে, যেমন উৎপাদিত বস্ত্রাদির উপাদানকারণ আছে। জগতের এই উপাদানকারণই হ'ল মায়াতত্ত্ব।[২]

মায়াতত্ত্বের লক্ষণ স্বয়ম্ভুসূত্রে উল্লিখিত হয়েছে :

'মায়াতত্ত্বং জগৎবীজম্বিনাশ্যশিবাত্মকম্।
বিভ্বেকমকলং সূক্ষ্মমনাদ্যব্যয়মীশ্বরম্॥' ২৬

—উমাপতি শিবাচার্য্যের শতরত্নসংগ্রহে উদ্ধৃত ২৬ শ্লোক

মায়াতত্ত্ব জগতের উপাদানকারণ, বিনাশরহিত, অশুদ্ধ, ব্যাপী, এক, কলারহিত, সূক্ষ্ম, আদ্যন্তরহিত ও ঈশ্বরের মতো পুরুষার্থসাধক।

১। 'ময়ত্যস্মাৎ জগৎ সর্ব্বং তেন মায়া সমীরিতা' —শতরত্নসংগ্রহের ২৬ শ্লোকের ভাষ্যে উমাপতি শিবাচার্য্য উদ্ধৃত পৌষ্করতন্ত্রবচন

২। 'কর্ত্তাহনুমীয়তে যেন জগদ্ধর্ম্মেণ হেতুনা।
তেনোপাদানমপ্যস্তি ন পটস্তন্তুভির্বিনা॥' —ঐ মৃগেন্দ্রবচন

মায়াতত্ত্ব জগতের উপাদান অর্থাৎ জগতের উপাদান বলেই মায়াতত্ত্ব আমরা স্বীকার করছি।

মায়াতত্ত্বের বিনাশ নাই। মায়াতত্ত্ব নিত্য। যদি জগৎ-প্রলয়ে জগতে উপাদানকারণ মায়াতত্ত্বের বিনাশ হয়, তাহ'লে প্রলয়ান্তে পুনরায় জগৎ সৃ সময় জগৎ কোন্ উপাদানকারণ থেকে সৃষ্ট হবে? সুতরাং মায়াতত্ত বিনাশ নাই।

মায়াতত্ত্ব অশিবাত্মক অর্থাৎ শিবাত্মক নয়। শিবের স্বরূপই হ'ল চৈতন্য। সুতরাং মায়াতত্ত্ব অশুদ্ধ অচেতন। যেহেতু মায়ার কার্য্যকলা অচেতন, সেই হেতু মায়াকে চেতন বলা যায় না।[১]

মায়াতত্ত্ব বিভু অর্থাৎ ব্যাপী। যেহেতু পুরুষের ভোগের জন্য মায়াত থেকে সর্ব্বকার্য্য উৎপন্ন হয়, সেহেতু মায়াতত্ত্ব ব্যাপক নয় তা বলা চলে না।

মায়াতত্ত্ব এক, অনেক নয়। অচেতন মায়াতত্ত্ব যদি ভিন্ন ভিন্ন ও অনে হয়, তাহ'লে মায়াতত্ত্বকে ঘটপটাদির মতো উৎপন্ন দ্রব্য হতে হবে। কি মায়াতত্ত্ব কোন কারণের দ্বারা উৎপাদিত হতে পারে না, কারণ মায়াত পরমকারণ। সুতরাং যেহেতু পরমকারণ কখনই সংখ্যায় বহু হতে পারে সেহেতু মায়াতত্ত্ব একই।[২]

ন্যায়বৈশেষিক পরমাণু-কারণবাদ

মায়াতত্ত্বকে এক বলায় ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের পরমাণু-কারণবাদ শক্তিদর্শ নিরাকৃত হ'ল। ন্যায়বৈশেষিক দর্শনের অভিপ্রায় হ এই: যেমন বহু সুতা থেকে একটি কাপড়ের উৎপত্তি হ তেমনি অনেক পরমাণু থেকেই এই জগতের উৎপত্তি সম্ভব, এক পরমকা থেকে নয়।

পুর্ব্বোক্ত মতের শক্তিদার্শনিক-কৃত খণ্ডন হ'ল: কাপড়ের উৎপাদ সুতাগুলি স্থূলদৃষ্টিতে বহু হ'লেও যেহেতু তারা একই কার্পাসদ্রব্য থেকে জা

১। 'তদচেতনমেব স্যাৎ কার্য্যস্যাঽচিত্ত্বদর্শনাৎ।
প্রাপ্তঃ সর্ব্বহরো দোষঃ কারণানিয়মোঽন্যথা॥ ইতি' —শতরত্নসং
উমাপতি শিবাচার্য্য-কৃত ২৬ শ্লোকের ভাষ্যে উৎকলিত মৃগেন্দ্র

২। 'যদনেকমচিৎ তৎ তু দৃষ্টমুৎপত্তিধর্ম্মকম্।
ন তদুৎপত্তিমৎ তস্মাদেকমভ্যুপগম্যতাম্॥' —ঐ

সেহেতু তারা তত্ত্বতঃ একই। সুতরাং এখানে এই রকম অনুমানই যুক্তিসঙ্গত : যেমন এক কার্পাসদ্রব্য থেকে নানাবিধ কাপড়ের উৎপত্তি, তেমনি এক পরমকারণ মায়াতত্ত্ব থেকে বিচিত্র জগৎ-প্রপঞ্চের উদ্ভব।[১]

মায়াতত্ত্ব কলারহিত। কলা শব্দের পারিভাষিক অর্থ হ'ল পুরা, সন্নিবেশ, ভোগ্যত্ব ইত্যাদি বিশেষ। এগুলি মায়াতত্ত্বের নাই।

মায়াতত্ত্ব সূক্ষ্ম অর্থাৎ অব্যক্ত, বুদ্ধি প্রভৃতির মতো স্থূল নয়। সকল প্রকার সূক্ষ্ম তারতম্যের চরমসীমা হ'ল মায়াতত্ত্ব। তাই এই তত্ত্বের চেয়ে সূক্ষ্মতর আর কিছু নাই।[২]

মায়াতত্ত্ব অনাদি। কারণ এই তত্ত্বই পরমকারণ। তান্ত্রিক সিদ্ধান্তে মায়াতত্ত্বের একদেশ পরিণাম স্বীকৃত হয়েছে।[৩]

১। 'পটস্তন্তুগণাৎ দৃষ্টঃ সর্ব্বমেকমনেকতঃ।
তদপ্যনেকমেকস্মাদেব বীজাৎ প্রজায়তে॥ ইতি'
'ভূতাবধি জগৎ যষাং কারণং পরমাণবঃ।
তেষাং পূর্ব্বোদিতাৎ হেতোঃ জ্ঞাতৈব জ্ঞানসূক্ষ্মতা॥ ইতি'
—শতরত্নসংগ্রহের উমাপতি শিবাচার্য্যের ২৬ শ্লোকের ভাষ্যে উৎকলিত মৃগেন্দ্রবচন

২। 'তন্মাত্রাণি পৃথিব্যাদেঃ সূক্ষ্মাণ্যেভ্যস্ত্বহংকৃতিঃ।
তস্যাঃ সূক্ষ্মতরা বুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রকৃতিরেব চ॥
তস্যাঃ কলাদিবর্গশ্চ মায়া সূক্ষ্মতরা ততঃ।
যত্র সৌক্ষ্ম্যপরাকাষ্ঠা সা মায়েত্যভিধীয়তে॥ ইতি'
—শতরত্নসংগ্রহের ভাষ্যে উদ্ধৃত পৌষ্করবচন

৩। 'যচ্চানাদি, ন তৎ সর্ব্বাত্মনা পরিণমতে। কিন্তু শক্ত্যাত্মনাবস্থিতায়াস্তস্যা একদেশতো মায়াত্মকাৎ উৎপদ্যতে ব্যক্তিমাসাদয়তি। যেষাং সর্ব্বাত্মনা জগৎবীজং পরিণমতে, তেষাং তদনিত্যমিতি অনাদিপদেন একদেশপরিণামসিদ্ধিঃ। এবং সতি অস্মিন্ সিদ্ধান্তে কার্য্যত্বং ন পটকুটীবৎ বৃত্তিতয়া, পটদশায়াং কুটীকৃত্যস্যাঽনুপপত্তেঃ। নাপি সাংখ্যবৎ দধিক্ষীরন্যায়েন পরিণামতয়া, তথাত্বে ক্ষীরনাশবৎ সর্ব্বাত্মনা উপাদাননাশপ্রসঙ্গাৎ। অতএব ন বৌদ্ধবৎ বীজান্তরাঙ্কুরন্যায়ঃ, তত্রাপি সর্ব্বাত্মনা বীজনাশাৎ। নাপি মায়াবাদিবৎ শক্তিরজতন্যায়েন বিবর্ত্ততয়া, কার্য্যস্যাঽসত্যত্বপ্রসঙ্গাৎ। তস্মাৎ অস্মিন মতে ঘৃত-কীট-ন্যায়েন একদেশপরিণামতয়ৈব কার্য্যত্বং সিদ্ধম্। তদুক্তম্—

বিন্দু-মায়া-প্রধানানাং বিকৃতির্ঘৃতকীটবৎ ইতি।'
—শতরত্নসংগ্রহের ২৬ শ্লোকের উমাপতি শিবাচার্য্য-কৃত ভাষ্য

মায়াতত্ত্বের কোন ব্যয় নাই, কারণ মায়াতত্ত্বের বিকারশক্তিগুলি কখনো বিনষ্ট হয় না। সুতরাং মায়াতত্ত্বকে অব্যয় বলায় অসৎ কার্য্যবাদ খণ্ডিত হ'ল।

মায়াতত্ত্ব ঈশ্বর অর্থাৎ ঈশ্বরের মতো পুরুষার্থসাধক।

মায়াতত্ত্ব এক হয়েও কি ভাবে বিচিত্র কার্য্য উৎপাদিত করছে? এরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর হ'ল যে, মায়াতত্ত্ব চিত্রশক্তি-মৎ অর্থাৎ এক হ'লেও যেহেতু মায়াতত্ত্বের শক্তিগুলি অনেক, সেহেতু মায়াতত্ত্ব থেকে বিচিত্র কার্য্যের উৎপত্তিতে কোন বিরোধই নাই।

জগতের উপাদানকারণ মায়াতত্ত্বের সহকারী হ'ল কর্ম্ম। কারণ কর্ম্মের অভাবে গ্রন্থিতত্ত্বের প্রবৃত্তি হয় না।

শুদ্ধা ও অশুদ্ধা মায়া—উভয়ের প্রবর্ত্তক যে এক শিব তা নয়। শুদ্ধা ও অশুদ্ধা মায়া উভয়েই উপাদানকারণ। কিন্তু উভয়ের নিমিত্তকারণ পৃথক, শুদ্ধা মায়ার প্রবর্ত্তক শিব ও অশুদ্ধা মায়ার প্রবর্ত্তক অনন্ত।[১]

শুদ্ধাশুদ্ধা মায়া

অনন্তের দ্বারা ক্ষুব্ধা মায়াই গ্রন্থিতত্ত্ব। এই গ্রন্থিতত্ত্ব থেকে জগতের অভিব্যক্তি।[২]

মায়াত্মক গ্রন্থিতত্ত্ব থেকে প্রথমে চারটি তত্ত্বের সাক্ষাৎ অভিব্যক্তি। এই চারটি তত্ত্ব হ'ল কলাতত্ত্ব, নিয়তিতত্ত্ব, কালতত্ত্ব ও পুংপ্রত্যয়হেতুতত্ত্ব। কলাতত্ত্ব থেকে বিদ্যা, রাগ ও প্রধান, এই তিনটি তত্ত্বের অভিব্যক্তি।

প্রধানতত্ত্বের ক্ষোভক শ্রীকণ্ঠ। প্রধানতত্ত্ব থেকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অভিব্যক্তি। এই তিন গুণ থেকে বুদ্ধিতত্ত্বের অভিব্যক্তি। বুদ্ধিতত্ত্ব থেকে তৈজস, বৈকারিক ও ভৌতিক এই তিন প্রকার অহঙ্কারের অভিব্যক্তি। তৈজস অহঙ্কার থেকে মন ও জ্ঞানেন্দ্রিয়বর্গের উদ্ভব। বৈকারিক

১। 'শুদ্ধেঽধ্বনি শিবঃ কর্ত্তা প্রোক্তোঽনন্তোঽসিতে প্রভুঃ ॥' ২৮

—শতরত্নসংগ্রহে উদ্ধৃত কিরণসূত্রের অর্দ্ধ

২। 'ক্ষোভিতোঽনন্তনাথেন গ্রন্থির্মায়াত্মকো যদা
তদা যেন বিকারেণ ভবোত্তি বিপুলং জগৎ ॥'

—শতরত্নসংগ্রহের ২৯ শ্লোকের ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রীমত্তন্ত্রশ্লোক

অহঙ্কার থেকে কর্মেন্দ্রিয় ও ভৌতিক অহঙ্কার থেকে তন্মাত্রদের উৎপত্তি। তন্মাত্র থেকে পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি।[১]

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সমস্তই মহামায়ার লীলা। অন্তরের বৃত্তিনিচয়েও এই লীলারই স্ফুরণ। সাধক কবির পদাবলীতে মহামায়ার লীলামহিমা কাব্যোৎকর্ষময় প্রকাশ লাভ করেছে :

"মায়ের এ পরম কৌতুক।
মায়াবদ্ধ জনে ধাবতি, অবদ্ধ জনে লুটে সুখ॥
আমি এই আমার এই, এভাব ভাবে মূর্খ সেই,
মনরে ওরে, মিছামিছি সার ভেবে, সাহসে বাঁধিছ বুক॥
আমি কেবা আমার কেবা, আমি ভিন্ন আছে কেবা,
মনরে ওরে, কে করে কাহার সেবা, মিছে ভাব দুখসুখ॥
দীপ জেলে আঁধার ঘরে, দ্রব্য যদি পায় করে,
মনরে ওরে, তখনি নির্ব্বাণ করে, না রাখেরে একটুক্॥
প্রাজ্ঞ অট্টালিকায় থাক, আপনি আপন দেখ,
রামপ্রসাদ বলে মশারি তুলে, দেখরে আপন মুখ॥" ২১৭

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কবি রামপ্রসাদ—২১৭ পদ

"সাবাস্ মা দক্ষিণা কালী, ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি,
(তোর) ভেল্কির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি।
এমন বাজিকরের মেয়ে, রাখলি বাবারে পাগল সাজায়ে,
নিজে গুণময়ী হয়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,
প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি ?—তুইও বুঝি পাগল হলি।"

—রামপ্রসাদ : ক. বি শা. প—লীলাময়ী মা

১। 'গ্রন্থিজন্ত-কলা-কাল-বিদ্যা-রাগ-নৃমাতরঃ।
গুণ-ধী-গর্ব্ব-চিত্তাক্ষ-মাত্রাভূতান্যনুক্রমাৎ॥' ২৯

—শতরত্নসংগ্রহের ২৯ শ্লোক

"এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিভোলা॥
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্ত লীলা—
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটা চেলা॥
কি রূপ, কি গুণ-ভঙ্গী, কি ভাব, কিছুই যায় না বলা।
যার নাম জপিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জ্বালা॥
সগুণে নির্গুণে বাধিয়ে বিবাদ, ঢ্যালা দিয়ে ভাঙ্গছে ঢ্যালা।
মাগী সকল বিষয়ে সমান রাজী, নারাজ কেবল কাজের বেলা॥
প্রসাদ বলে, থাকো বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাটিয়ে যাবে ভাটার বেলা॥"

—রামপ্রসাদ : ক. বি. শা. প.—লীলাময়ী মা

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সে যে ভোলা ত্রিপুরারি

পুষ্পদন্ত তাঁর শিবমহিমাস্তোত্রে স্বাত্মারাম শিবের বিশাল গুণাবলী বর্ণনা করে শৈবী মহিমার স্বরূপ অবাঙ্‌মনসগোচর এই কথা বুঝাবার জন্ম স্তোত্র শেষে খেদ প্রকাশ করেছেন :

'অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরবরতরুশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী ।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥'

যদি সমুদ্র দোয়াত, হিমালয় পর্ব্বত কালির বড়ি, কল্পতরুর শাখা কলম, ভূপৃষ্ঠ কাগজ, লেখিকা স্বয়ং সরস্বতী এবং অনন্তকাল লিখবার সময় হয়, তাহ'লেও, হে শিব, তোমার গুণাবলী বর্ণনা করে শেষ করা যায় না।

পতি পদার্থ

শৈবাগমে ত্রিবিধ পদার্থের কথা বলা হয়েছে—পতি, পশু ও পাশ। পতি পদার্থ স্বীকারের যুক্তি হিসাবে তন্ত্রে নিম্নমতো শ্লোক পাওয়া যায় :

'অচেতনস্থ মায়াদেঃ প্রবর্ত্তকতয়া পতিঃ।
সিদ্ধঃ সর্ব্বার্থবিৎ কর্ত্তা ব্যাপকঃ সততোদিতঃ ॥'

—শতরত্নসংগ্রহের ৭ শ্লোক

মায়া মহামায়া প্রমুখ জড়জগতের প্রবৃত্তির যিনি জনক তিনিই পতি। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্যমুক্ত।

শতরত্নসংগ্রহকার উমাপতি শিবাচার্য্য উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে অনুমানের স্বরূপ সুস্পষ্ট করেছেন :

'মায়াদেরচেতনস্থ প্রবৃত্তিঃ চেতনাধিষ্ঠানপূর্ব্বিকা, অচেতনপ্রবৃত্তিত্বাৎ, রথাদি-প্রবৃত্তিবদিতি প্রবৃত্তিরূপ-কার্য্যলিঙ্গানুমানেন তৎকারণতয়া পতিসিদ্ধিরিতি।'

চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত না হ'লে অচেতন মায়াদির প্রবৃত্তি হতে পারে না; কারণ অচেতন পদার্থের ধর্ম্মই হ'ল এই যে, তা চেতনের দ্বারা অধিষ্ঠিত না হ'লে প্রবৃত্তিবান হয় না, যেমন রথ সারথীর দ্বারা চালিত হ'লেই গতিবান হয়। অতএব অচেতন মায়াদির প্রবৃত্তিরূপ কার্য্য থেকে তার কারণ হিসাবে পতি পদার্থ স্বীকার করতে হবে।

এই জাতীয় অনুমানকে কার্য্যলিঙ্গ বা শেষবৎ অনুমান বলা হয়। এই ক্ষেত্রে কার্য্যের দ্বারা কারণ অনুমিত হয়ে থাকে।[১]

যে অনুমানের দ্বারা পতি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্যমুক্ত তা জানা যায়, তার আকার হ'ল এই :

'ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবদিত্যাদ্যনুমানেন নিরুদ্ধজ্ঞানশক্তিক-পশুবিলক্ষণতয়া সর্ব্বজ্ঞপতিসিদ্ধিরূহনীয়া।'

—শতরত্নসংগ্রহের ৭ শ্লোকের ভাষ্য

যেহেতু ক্ষিতি প্রভৃতি কার্য্য, সেহেতু ক্ষিতি প্রভৃতির কর্ত্তা আছে, যেমন ঘট কার্য্য বলে তার কর্ত্তা আছে। এই ক্ষিতি প্রভৃতির কর্ত্তৃত্ব, যে বদ্ধ জীবের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি রুদ্ধ বা সীমাবদ্ধ, তার পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। সুতরাং ক্ষিতি প্রভৃতির কর্ত্তা যিনি পতি, তিনি খুব স্বাভাবিকভাবেই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্যমুক্ত।

যিনি 'সর্ব্বকারণকারণম্' অর্থাৎ শিব, তিনিই পতি শব্দবাচ্য। এই পতি শিব সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী ও নিত্যমুক্ত।

১। কার্য্যলিঙ্গ বা শেষবৎ অনুমানের দৃষ্টান্ত :

'স্থূলাবৃভশকৃৎপুঞ্জভূপৃষ্ঠং মদগন্ধি চ।
শুম্ভশয্যাদিভিশ্চিহ্নৈরত্রাসীৎ মত্তবারণঃ॥
অতীতো হ্যনুমানেন সাধ্যঃ শেষবতা বুধৈঃ॥ ইতি'

—শতরত্নসংগ্রহের ৬ শ্লোকের ভাষ্যে উদ্ধৃত যোগপাদ শ্লোক

পতিসিদ্ধিসংক্রান্ত তন্ত্রবচন :

'অস্তি কশ্চিদপর্য্যন্তরমণীয়গুণাশ্রয়ঃ।
পতির্বিশ্বস্য নির্ম্মাতা পশুপাশবিলক্ষণঃ॥ ইতি'

—শতরত্নসংগ্রহের ৭ শ্লোকের ভাষ্যে উদ্ধৃত বায়বীয় বচন

'অচেতনং জগৎ বিপ্রাশ্চেতন-প্রেরণং বিনা।
প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা ন স্বতন্ত্রং রথাদিবৎ॥
যোঽত্র প্রবর্ত্তকঃ শক্তঃ স পতিঃ পরিপঠ্যতে।
বিবাদাধ্যাসিতং বিশ্বং বিশ্ববিৎ-কর্ত্তৃপূর্ব্বকম্।
কার্য্যত্বাদাবয়োঃ সিদ্ধং কার্য্যং কুম্ভাদিকং যথা॥ ইতি' —ঐ পৌষ্করবচন

'এবং হি পরতন্ত্রত্বাজ্ জগতোঽস্যাঽখিলস্য তু।
প্রবৃত্তির্দৃশ্যতে যস্মাৎ তস্মাৎ কর্ত্তা মহেশ্বরঃ॥ ইতি' —ঐ মতঙ্গবচন

এ প্রসঙ্গে ন্যায়বৈশেষিকের ঈশ্বরানুমান প্রণিধানযোগ্য; কারণ এক্ষেত্রে নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও তান্ত্রিকদের মধ্যে চিন্তাধারার ঐক্য পরিলক্ষিত হয়।

ন্যায়বৈশেষিকের ঈশ্বরানুমান

ভাষাপরিচ্ছেদ গ্রন্থের প্রথম কারিকার[১] সিদ্ধান্তমুক্তাবলীটীকায় বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন মন্তব্য করছেন :

'যথা ঘটাদিকার্য্যং কর্ত্তৃজন্যং তথা ক্ষিত্যঙ্কুরাদিকমপি। ন চ তৎকর্ত্তৃত্বং অস্মদাদীনাং সম্ভবতীত্যতস্তৎকর্ত্তৃত্বেনেশ্বরসিদ্ধিঃ।'[২]
আকৃতিযুক্ত অবয়বসহিত নানাসংস্থানবিশেষে অবস্থিত পৃথিব্যাদির কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টা নিশ্চয়ই কেউ আছেন, যেহেতু পৃথিব্যাদির বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবয়ব আছে। এক্ষেত্রে উদাহরণ হ'ল ঘটাদি। ঘটাদি বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবয়বে গঠিত এবং এই হেতু তাদের স্রষ্টা বুদ্ধিমান কুম্ভকার।[৩]

অতএব বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রাহ্য-অবয়ববিশিষ্ট পৃথিব্যাদির যিনি বুদ্ধিমান কর্ত্তা তিনিই পতি। এই অনুমানই অন্বয়ব্যতিরেকী অনুমান।[৪]

১। 'ন চ শরীরাজন্যত্বেন কর্ত্রজন্যত্বসাধকেন সৎপ্রতিপক্ষ ইতি বাচ্যম্, অপ্রয়োজকত্বাৎ মম তু কর্ত্তৃত্বেন কার্য্যত্বেন কার্য্যকারণভাব এবানুকূলস্তর্কঃ, দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা ইত্যাদয় আগমা অপ্যনুসন্ধেয়াঃ॥'

—ভাষাপরিচ্ছেদ : প্রথম কারিকার সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা

২। 'প্রধান-পরমাণ্বাদি যাবৎ কিঞ্চিদচেতনম্।
ন তৎ কর্তৃ স্বয়ং দৃষ্টং বুদ্ধিমৎ কারণং বিনা॥
জগচ্চ কর্ত্তৃসাপেক্ষং কার্য্যং সাবয়বং যতঃ।
তস্মাৎ কার্য্যস্য কর্ত্তৃত্বং পত্যুর্ন পশুপাশয়োঃ॥'

—শতরত্নসংগ্রহের ১৬ শ্লোকের ভাষ্যে বায়বীয় বচন

৩। 'মূর্ত্তা সাবয়বা যেঽর্থা নানারূপপরিচ্ছদাঃ।
স্থূলাবয়বশিষ্টত্বাৎ বুদ্ধিমদ্ধেতুপূর্ব্বকাঃ॥
অতোঽস্তি বুদ্ধিমান্ কশ্চিদীশ্বরঃ সমবস্থিতঃ॥'

—শতরত্নসংগ্রহের ১৬ শ্লোক

৪। 'পক্ষধর্ম্মঃ সপক্ষে সৎ ব্যাবৃত্তশ্চ বিপক্ষতঃ।
অবাধোঽসৎপ্রতিপক্ষো ব্যতিরেকান্বয়াত্মকঃ॥'

—শতরত্নসংগ্রহের ১৬ শ্লোকে উদ্ধৃত পৌষ্করবচন

জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিই হ'ল পতির লক্ষণ।

পতিলক্ষণ 'দৃক্‌ক্রিয়াত্মকমৈশ্বর্য্যং যস্য তদ্ দাত্রপূর্ব্বকম্।
ঈশ্বরঃ সোঽত্র মন্তব্যঃ শক্তিদ্বয়যুতঃ প্রভুঃ॥' ৮

—শতরত্নসংগ্রহের ৮ শ্লোব

ঈশ্বর শিবের ঐশ্বর্য্য বা ঈশ্বরলক্ষণই হ'ল জ্ঞান ও ক্রিয়া। এই জ্ঞানাদিরূ লক্ষণ স্বাভাবিক অর্থাৎ কারো দ্বারা প্রদত্ত নয়। এই জ্ঞান ও ক্রিয়াই হ'ল শিবের দুটি শক্তি। জ্ঞানক্রিয়া-শক্তিদ্বয়যুক্ত শিব প্রভু অর্থাৎ তাঁর উপর অন্য কোন ঈশ্বর নাই। শক্তিযুক্ত শিবই পরমেশ্বর।

ন্যায়দর্শনের পথ অনুসরণ করে শতরত্নসংগ্রহকার উমাপতি শিবাচার্য উপরি-উক্ত শ্লোকের ভাষ্যে পতিলক্ষণ নির্ণয় করেছেন:

'স্বভাবনির্ম্মলদৃক্‌ক্রিয়া-লক্ষণ-শক্তিমত্ত্বং পতিলক্ষণম্।'[১]

স্বাভাবিক ও মলরহিত জ্ঞানক্রিয়ারূপ শক্তি যাঁর আছে তিনিই পতি।

জ্ঞান ও ক্রিয়া, এই দ্বিরূপা শক্তিই হ'ল শিবের অচল মূর্ত্তি। বিশ্বই শিবের চল মূর্ত্তি।[২]

১। 'তত্র শক্তিমত্ত্বমিত্যুক্তে মলে অতিব্যাপ্তিঃ, তদর্থং—দৃক্‌ক্রিয়ালক্ষণেতি। এতাবত্যুক্তে বদ্ধাত্মস্বতিব্যাপ্তিঃ, তদর্থং—নির্ম্মলেতি। তাবত্যুক্তেপ্রসাদমুক্তেঽতিব্যাপ্তিঃ, তদর্থং—স্বভাবেতি তেষাং শক্তিনৈর্ম্মল্যস্য শিবপ্রসাদাধীনতয়া স্বাভাবিকত্বভাবাৎ। তদুক্তং পরাখ্যে—

চিদ্রূপমাত্মনো রূপং দৃক্‌ক্রিয়াগুণলক্ষিতম্।
জ্ঞানরূপস্থিতস্যাপি স্বরূপং দৃক্‌ক্রিযাত্মকম্॥

বক্ষ্যতি চ— কর্ত্তৃশক্তিরণোর্নিত্যা বিভ্বী চেশ্বরশক্তিবৎ।
তমশ্ছন্নতয়াঽর্থেষু নাভাতি নিরনুগ্রহা॥

পৌষ্করে— জ্ঞানক্রিয়ে শিবে প্রোক্তে সর্ব্বার্থে নির্ম্মলে পরে। ইতি চ॥'

—শতরত্নসংগ্রহের ৮ শ্লোকের ভা

২। 'অথ পত্যুরধিষ্ঠানং স্বশক্তি-কিরণাত্মকম্।
তস্যাং দিবি সুদীপ্তাত্মা নিষ্কম্পোঽচলমূর্ত্তিমান্॥' ৯ —শতরত্নসংগ্রহের ৯ শ্লোব

'অনপেক্ষস্য বশিনো দেশকালাকৃতিক্রমাঃ॥ ৬০
নিয়তা নেতি স বিভুর্নিত্যো বিশ্বাকৃতিঃ শিবঃ।
বিভুত্বাৎ সর্ব্বগো নিত্যভাবাদাদ্যন্তবর্জ্জিতঃ॥ ৬১
বিশ্বাকৃতিত্বাৎ চিদচিদ্বৈচিত্র্যাবভাসকঃ॥'

—তন্ত্রালোক: ১ম আহ্নিক—৬১ শ্লোক ও ৬০—৬২ শ্লোকা

শব্দের গৌণী বৃত্তি আশ্রয় করে শক্তিকে মূর্ত্তি বলা হচ্ছে। এ সম্বন্ধে তন্ত্রাচার্য্যদের সিদ্ধান্ত হ'ল :

'কাষ্ঠা সৈব পরা সূক্ষ্মা সর্ব্বদিক্কাঽমৃতাত্মিকা।
প্রধ্বস্তাবরণা শান্তা বস্তুমাত্রাঽতিলালসা। ১০
আদ্যন্তোপরতা সাধ্বী মূর্ত্তিত্বেনোপচর্য্যতে॥'

—শতরত্নসংগ্রহ : ১০ শ্লোক ও ১১ শ্লোকার্দ্ধ

সেই শক্তিই পরা কাষ্ঠা অর্থাৎ সকলের চেয়ে উৎকৃষ্টা। এই মন্তব্যের ব্যঞ্জনা হ'ল চলমূর্ত্তিমান বিশ্ব থেকে অচলমূর্ত্তিমান শিব বড়। শক্তি সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতি থেকেও অতি সূক্ষ্ম। শক্তি সর্ব্বদিক্কা বা স্থাবরজঙ্গমাত্মক-জগৎরূপা বলে বিচিত্রস্বভাবা। শক্তির আত্মা বা স্বরূপ হ'ল অমৃত। তাৎপর্য্য হ'ল শক্তি নিত্যা। শক্তির আবরণ বা সমস্ত বন্ধন প্রধ্বস্ত বা বিনিবৃত্ত। শক্তি শান্তা অর্থাৎ রাগদ্বেষরহিতা। বস্তুমাত্রা শব্দে বস্তু হ'ল পতি শিব। শক্তি শিবমাত্রা অর্থাৎ শিব জ্ঞানাক্রিয়াত্মক শক্তির আকারেই প্রকাশিত। শক্তি অতিলালসা। পিতার যেমন পুত্রদের উপরে রাগদ্বেষ না থাকলেও স্নেহবুদ্ধি থাকে, তেমনি জগতের উপরে শক্তির রাগদ্বেষ নাই অথচ স্নেহবুদ্ধি আছে। শক্তির আদি বা অন্ত নাই। শক্তি সাধ্বী বা করুণাযুক্তা। নিজের প্রয়োজন না থাকলেও করুণাবান ব্যক্তিরা পরার্থে প্রবৃত্ত হন, সেরূপ শক্তির করুণা আছে বলে পরার্থে প্রবৃত্তি অসঙ্গত নয়।

শিবের জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়রূপা ক্রিয়া, সেহেতু তার করণ থাকবে। কেননা সব ক্রিয়ারই করণ থাকে। শিবের জগৎ সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ক্রিয়ার করণ হ'ল শিবেরই শক্তি।

'করণং চ ন শক্ত্যন্যৎ শক্তির্নাচেতনা চিতঃ।
বিষয়ানিয়মাদেকং বোধে কৃত্যে চ তত্তথা॥' ১২

—শতরত্নসংগ্রহে উৎকলিত মৃগেন্দ্রসূত্র

শিবের শক্তি ছাড়া অন্য কোন বস্তু করণ হয় না। চিদ্রূপ শিবের শক্তি কখন অচেতন হতে পারে না। যেহেতু শিবের জ্ঞান ও ক্রিয়ার বিষয়কে সীমাবদ্ধ করা যায় না, সেহেতু শিবের জ্ঞান ও ক্রিয়ার বিষয়ে শক্তিরূপ করণকেও

সীমাবদ্ধ করা যায় না। তাৎপর্য্য হ'ল: শিবের জ্ঞান ও ক্রিয়ার বিষয়ও যেমন অনন্ত, শক্তিরূপ করণও তেমনি অনন্ত।[১]

শক্তিকে করণ বলার উদ্দেশ্য হ'ল এই কথা জানানো যে, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় সাধন করতে শিবের কোন বাহ্য করণের প্রয়োজন হয় না—শিব আপন ইচ্ছাশক্তির বলেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য্য সংসাধিত করে থাকেন।

যেহেতু শিব অশরীরী, সেই হেতু তিনি কর্ত্তা হতে পারেন না—এরূপ পূর্ব্বপক্ষও ইচ্ছাশক্তিকে করণ স্বীকার করার ফলে নিরস্ত হ'ল।

'যথা কালো হ্যমূর্ত্তোঽপি দৃশ্যতে ফলসাধকঃ।
এবং শিবো হ্যমূর্ত্তোঽপি কুরুতে কার্য্যমিচ্ছয়া॥' ১৩

—শতরত্নসংগ্রহ: ১৩ শ্লোক

যেমন ক্ষণ-মুহূর্ত্ত-ষড়ঋতুরূপ কাল অশরীরী হ'লেও পুষ্পফলাদি ও বাল্য-যৌবনাদির আবির্ভাব-তিরোভাব সংসাধিত করে ফল সাধন করে, তেমনি শিব অশরীরী হ'লেও আপন ইচ্ছাশক্তির বশে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য্য নিষ্পন্ন করে থাকেন। যোগীদের যেমন ইচ্ছাশক্তিই সব কার্য্যের করণ, শিবেরও তেমনি।

শিবের শরীরকরণাত্মক শক্তির তিনরকম ব্যাপার হতে পারে, যথা ঔদাসীন্য, উদ্যোগ ও প্রবৃত্তি। এই তিন প্রকার ভেদ অনুযায়ী শিবকে শক্ত, উদ্যুক্ত ও প্রবৃত্ত এই তিন প্রকার বলে কল্পনা করা হয়ে থাকে।

শান্ত সদাশিব
ঈশ্বর

জগতে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য্যে শিবের যে যোগ্যতা তাই নিষ্কলাবস্থা, এই অবস্থায় শিবকে শান্ত আখ্যা দেওয়া হয়। সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য্যে শিবের যে উদ্যোগ তাই সকলনিষ্কলাবস্থা, এই অবস্থায় শিব সদাশিব। জগতের সৃষ্টি-

১। 'শক্তিশ্চিত্তনুরীশ্বরস্য করণং জ্ঞেয়েষু কার্য্যেষু তদ্
ভেদৈঃ সোপহিতা প্রযাতি গুণতো ভেদং ক্রিয়াজ্ঞানতঃ।
নিত্যং তৎ সকলান্তকর্ত্তৃনিহিতা বর্ত্মস্থশুদ্ধে শিতে
কৃত্যং সৈব করোতি পত্যনুগতা বামাদিশক্ত্যাত্মিকা॥'
—শতরত্নসংগ্রহের ১২ শ্লোকের ভাষ্যে উৎকলিত সিদ্ধান্তসারাবলীবচন

স্থিতি-লয়কার্য্যে যখন প্রবৃত্ত, তখন শিব স্থূলাবস্থাপ্রাপ্ত ঈশ্বর। শিবের এই অবস্থাভেদ জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কার্য্যকে কেন্দ্র করে কল্পিত, আসলে কোন ভেদই নেই।[১]

তান্ত্রিক সিদ্ধান্তানুযায়ী শিব জগৎ-প্রপঞ্চের উপাদানকারণ হতে পারেন না। কারণ শিব যদি উপাদানকারণ হন, তাহ'লে তাঁকে পরিণামী ও এই কারণে অচেতন হতে হবে। তাছাড়া, শিবের উপাদানকারণতায় নিষ্পন্ন জগৎ-প্রপঞ্চকেও চেতন হতে হয়। যে যে কারণে শিব জগৎ-প্রপঞ্চের উপাদানকারণ হতে পারেন না, সেই সেই কারণে শিবের সমবায়িশক্তিও উপাদানকারণ হতে পারে না। জগৎ-প্রপঞ্চকে চেতন শিব বা চেতন সমবায়িশক্তির বিবর্ত্ত স্বীকার করলে জগৎকে মিথ্যা বলতে হয়। কিন্তু সকলপ্রমাণসিদ্ধ জগৎকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়া কখনই সম্ভব নয়।

শিব নিমিত্তকারণ

এই কারণে শুদ্ধ মার্গে শিব নিমিত্তকারণ, শক্তি সহকারিকারণ ও বিন্দু উপাদানকারণ। অশুদ্ধ মার্গে কিন্তু অনন্ত নিমিত্তকারণ, কর্ম্ম সহকারিকারণ ও মায়া উপাদানকারণ।[২]

১। 'শক্তোহ্যুক্তপ্রবৃত্তশ্চ কর্ত্তা ত্রিবিধ ইষ্যতে।
শক্তেঃ প্রবৃত্তিভেদেন ভেদস্তস্যোপচারতঃ॥' ১৪ —শতরত্নসংগ্রহ, ১৪ শ্লোক

'প্রোক্ত স নিষ্কলঃ স্থূলস্তথা সকলনিষ্কলঃ।
ঈশঃ সদাশিবঃ শান্ত ইতি নাম্না স্থিতিস্ত্বিহ॥
ইচ্ছানুগ্রহকর্তৃত্বাদ্ভবভোগাধিকারবান্।
ত্রিবিধঃ কৃত্যভেদেন কথিতো নামভেদতঃ॥'
—শতরত্নসংগ্রহ ভাষ্যে উৎকলিত কিরণবচন

'একমেব হি তৎ তত্ত্বং পরমং শুদ্ধমব্যয়ম্।
ঈশঃ সদাশিবঃ শান্তঃ পর্য্যায়াস্তস্য সংস্থিতাঃ॥' —ঐ বচন

২। 'নাস্তি শক্তিরুপাদানং চিদ্রূপত্বাৎ যথা শিবঃ।
পরিণামোঽচিতঃ প্রোক্তশ্চেতনস্য ন যুজ্যতে॥
চিতো বিবর্ত্ত এবোক্তস্তথাপ্যে কার্য্যশূন্যতা।
সর্ব্বপ্রমাণ-সংসিদ্ধং চিদ্বিবর্ত্তঃ কথং জগৎ॥'
—শতরত্নসংগ্রহের ১৫ শ্লোকের ভাষ্যে উৎকলিত পৌষ্করবচন

শিবের পঞ্চকৃত্য হ'ল :

পঞ্চকৃত্য 'জগজ্জন্ম-স্থিতি-ধ্বংস-তিরোভাব-বিমুক্তয়ঃ।
কৃত্যং সকারক[১]-ফলং জ্ঞেয়মস্যৈতদেব হি ॥' ১৭

—শতরত্নসংগ্রহের ১৭ শ্লোক

জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়, তিরোভাব অর্থাৎ যথাযোগ্য ভোগ থেকে জীবকুলের অপ্রচ্যুতি ও বিমুক্তি অর্থাৎ পাশ তিরোহিত করার ফলে জীবগণকে পরাপরমোক্ষপ্রদান—এই পাঁচটি হ'ল শিবের কৃত্য। অচেতন বলে মায়া বা কর্ম্মের দ্বারা এই পাঁচ প্রকার কৃত্য নিষ্পন্ন হতে পারে না। জীবের দ্বারা সম্ভব নয়, কারণ জীবের শক্তি মলের দ্বারা নিরুদ্ধ। শিবের শক্তির দ্বারাই এই কৃত্যগুলির নিষ্পাদন সম্ভব হয়। এই কৃত্যগুলির ফল হ'ল জীবগণের ভোগ ও মোক্ষ বিধান করা।

শিবের এই সর্ব্বকর্তৃত্ব ও পুর্ব্বোক্ত সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব মৃগেন্দ্রসূত্রেও অভিহিত হয়েছে :

'স্বাপেঽপ্যাস্তে বোধয়ন বোধযোগ্যান্
রোধ্যান্ রুন্ধন্ পাচয়ন্ কর্ম্মিকর্ম্ম।
মায়াশক্তীর্ব্যক্তিযোগ্যাঃ প্রকুর্ব্বন্
পশ্যন্ সর্ব্বং যদ্ যথাবস্তুজাতম্ ॥' —শতরত্নসংগ্রহে উৎকলিত

জীবগণের ভোগমোক্ষ যেহেতু শিবেচ্ছায় নিষ্পন্ন হয়, সেহেতু জাগ্রৎদশার মতো সুষুপ্তিদশাতেও তিনি কর্ম্মীদের শরীরেন্দ্রিয়জাত্যায়ুর্ভোগকারণ কর্ম্মাবলীর মধ্যে যেগুলি প্রবোধযোগ্য সেগুলিকে প্রবোধিত, যেগুলি রোধযোগ্য সেগুলিকে রুদ্ধ এবং যেগুলি ফল দেওয়ার যোগ্য সেগুলিকে ফলদানোন্মুখ করেন। শুদ্ধা বা অশুদ্ধা মায়া, কোনটিই শিবের প্রেরণা ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কার্য্য উৎপন্ন করতে পারে না। মায়ার এই ফলজনক শক্তিকে অভিব্যক্ত করাও শিবের কাজ।

১। 'সকারকমিত্যনেন সাধনাপেক্ষা চ শিবস্য দর্শিতা। অন্যথা নির্হেতুকো মোক্ষঃ স্যাৎ। অন্যানপেক্ষণাৎ সর্ব্বস্যৈব স্যাৎ, কস্যাপি বা ন স্যাৎ। যথাহুঃ

'নিত্যং সত্ত্বমসত্ত্বং বা হেতোরন্যানপেক্ষণাৎ।
অপেক্ষাতো হি ভাবানাং কাদাচিৎকত্বসম্ভবঃ ॥ ইতি ॥'

—শতরত্নসংগ্রহের ১৭ শ্লোকের ভাষ্য

পাশবদ্ধ জীব পৃথিবীর বস্তুজাতকে যথাযথভাবে নিরীক্ষণ করতে পারে না। একমাত্র পাশমুক্ত পশুপতিই নিরীক্ষণ করতে পারেন, কারণ তিনি সর্ব্বজ্ঞ।[১]

জ্ঞেয়তত্ত্ব

জ্ঞেয় বস্তুর বস্তুতাও বস্তুর স্বরূপভূত নয়, তা প্রকাশিত হয় মাত্র। কারণ বস্তুতা যদি বস্তুর স্বরূপ হয়, তাহ'লে এই বস্তুতা সব সময় সকলের প্রতি স্ফুরিত হবে অর্থাৎ সকলেই সর্ব্বজ্ঞ হবে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, বস্তুতা কোন কোন সময়ে কোন কোন ব্যক্তির প্রতিই স্ফুরিত হয় এবং এই কারণে সকলের পক্ষে সব বস্তুর জ্ঞান সম্ভব হয় না। অতএব যেহেতু কোন প্রকাশাত্মক প্রমাতার দ্বারা বস্তুতার স্ফুরণ নিয়ন্ত্রিত হয়, সেহেতু বস্তুতা বস্তুর স্বরূপ হতে পারে না। পাশবদ্ধ পরিচ্ছিন্ন জীবপ্রমাতার পক্ষে এই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। সুতরাং বস্তুতার স্ফুরণকে যিনি নিয়ন্ত্রিত করেন, সেই প্রকাশাত্মক প্রমাতাই শিব।

'জ্ঞেয়স্য হি পরং তত্ত্বং
যঃ প্রকাশাত্মকঃ শিবঃ' —তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক—৫২ কারিকার্দ্ধ

প্রকাশাত্মক শিবই জ্ঞেয়ের পরতত্ত্ব।

এখন প্রশ্ন হ'ল, এই প্রকাশাত্মকপ্রমাতা কি বস্তুতে বস্তুতাস্ফুরণ আধান করেন?

এস্থলে উত্তর হ'ল, বস্তুতে বস্তুতাস্ফুরণ আধানের পরিকল্পনাই হাস্যকর। কারণ, বস্তুতাস্ফুরণ যাতে হয় না, তা কখনও বস্তু হতে পারে না।

'নহ্যপ্রকাশরূপস্য প্রাকাশ্যং বস্তুতাপি বা॥' ৫২

—তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক—৫২ শ্লোকার্দ্ধ

যা প্রকাশরূপ নয়, তা কখনো প্রকাশিত হতে পারে না। তা আসলে বস্তুই নয়।[২]

১। 'শাসনরোধনপালনপাচনযোগ্যাৎ স সর্ব্বমুপকুরুতে।
তেন পতিঃ শ্রেয়োময় এব শিবো নাশিবং কিমপি তত্র॥' ১০৪

—তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক—১০৪ শ্লোক

২। 'প্রকাশসম্বন্ধেনাপি হি প্রকাশমানো নীলাদিঃ স্বয়ং প্রকাশরূপ এব সন্ প্রকাশতে, নহি অপ্রকাশরূপশ্চ প্রকাশতে চ ইতি স্যাৎ, ন হি অশ্বেতঃ প্রাসাদঃ শ্বেততে, ন চৈবং বস্তুত্বমপ্যস্য স্যাৎ, ন হি প্রকাশরূপতামপহায় অন্যৎ বস্তু সম্ভবেৎ ইতি ভাবঃ।'

—তন্ত্রালোক : ৫২ শ্লোকার্দ্ধের জয়রথভাষ্য

ভাবাত্মক জ্ঞেয় শুধু নয়, অভাবাত্মক জ্ঞেয়ও শিবস্বভাব।

অভাবাত্মক জ্ঞেয়

'অবস্তুতাপি ভাবানাং
চমৎকারৈকগোচরা
যৎ কুড্যসদৃশী নেয়ং
ধীরবস্ত্বেতদিত্যপি ॥' ৫৩

—তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক—৫৩ শ্লোক

এখানে ঘট নাই এরূপ প্রতীতিও চমৎকৃতিমণ্ডিত, কুড্যাদিজড়পদার্থভিন্ন, অবস্তু, অতএব অভাবাত্মক জ্ঞেয়। বোধগম্য হয় বলে এই জাতীয় জ্ঞেয়ও শিবতত্ত্ব।[১]

বস্তুতা বা অবস্তুতার স্ফুরণ প্রত্যক্ষগম্য। এ বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রয়োজন হয় না।[২]

আসলে বোধকে বাদ দিয়ে বস্তুসমূহের মধ্যে কোন রূপগত ভেদ থাকতে পারে না। বস্তুদ্রষ্টার কাছে বস্তুপ্রকাশের বিশেষ ধারাটির দ্বারাই বস্তুর স্বরূপ নির্দ্ধারিত হয় এবং এইভাবেই অপর একটি বস্তুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায় তা বোঝা যায়। সুতরাং বস্তুতা অর্থাৎ বস্তুর ভাব বা স্বরূপ বস্তুদ্রষ্টার কাছে বস্তুটির প্রকাশের বিশেষ ধারাটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

তাহ'লে বোঝা যাচ্ছে যে, জগৎব্যাপী প্রকাশ যখন একটি বিশেষ বস্তুর স্বরূপাত্মক উপাধিতে সীমিত হয়ে সেই বিশেষ বস্তুটির দর্শকের কাছে আবির্ভূত হয়, তখনই সেই বিশেষ বস্তুদ্রষ্টার সেই বিশেষ বস্তুবিষয়ক জ্ঞান হয়ে থাকে।

এই জগৎব্যাপী প্রকাশের যিনি আত্মাস্বরূপ, তিনিই পরমেশ্বর শিব।[৩]

১। 'অবোধোঽপি বুদ্ধ্যমানো বোধাত্মভূত ঈশ্বর এব'
—তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক—৫৩ শ্লোকের জয়রথী ভাষ্যে উৎকলিত বচন

২। 'প্রকাশ নাম যশ্চায়ং সর্ব্বত্রৈব প্রকাশতে।
অনপহ্নবনীয়ত্বাৎ কিং তস্মিন মানকল্পনৈঃ ॥' ৫৪
—তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক—৫৪ শ্লোক

৩। 'প্রমাণান্যপি বস্তূনাং
জীবিতং যানি তন্বতে।
তেষামপি পরো জীবঃ
স এব পরমেশ্বরঃ ॥' ৫৫ —তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক—৫৫ শ্লোক

"ইহ বস্তূনাং নীলপীতাদীনাং প্রকাশনিরপেক্ষেণ স্বস্বরূপেণ তাবৎ স্বয়মন্যোন্যং বা ন কশ্চিৎ বিশেষঃ। ন হি স্বাত্মনি নীলং নীলং পীতং বা পীতম্। যদি নাম হি স্বাত্মনি নীলং পীত'

তাছাড়া, যদি আমরা বলি, বস্তুর ভাব বা অভাবের প্রতীতিবিষয়ে প্রমাণ কি? তাহ'লে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় বা জ্ঞান কোনটিই আমরা স্বীকার করতে পারি না।[১] সুতরাং তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে :

সংবিৎ শিবতত্ত্ব

(ক) বস্তুতা বা অবস্তুতার স্ফুরণ হচ্ছে। অর্থাৎ, বস্তুর ভাবাত্মক বা অভাবাত্মক বোধ বা সংবিৎ স্বতঃসিদ্ধ।

(খ) এই বোধ বা সংবিদের যিনি আত্মভূত তিনিই পরমেশ্বর শিব।

যা প্রকাশিত হচ্ছে তা থেকে অতিরিক্ত বিশ্ব বলে কিছু থাকতে পারে না। অতিরিক্ত যদি কিছু থাকে, তাহ'লে যেহেতু তা প্রকাশমান নয় সেহেতু তার জ্ঞানও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তন্ত্রাচার্য্য অভিনবগুপ্তের মন্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য :

স্যাৎ পীতং বা নীলং, তৎ কিমিব ন বিরুদ্ধম্ আপতেৎ। অথ যথৈব প্রকাশতে তথৈব তৎ স্বাত্মনি পরিনিষ্ঠিতং স্যাৎ ইতি ন নীলং পীতম্, পীতং বা নীলম্, ইতি চেৎ—এবং তর্হ্যেষাং স্বাত্মনি বিশেষো ন কশ্চিদুক্তঃ স্যাৎ, অপি তু প্রকাশতে ইতি—ইতি প্রকাশ এবৈষাং রূপং তত্তন্নিয়তস্বরূপপ্রতিষ্ঠানিবন্ধনত্বাৎ জীবিতং বিতনুয়াৎ যেন নীলমিদং পীতমিদম্ ইতি সিদ্ধ্যেৎ। স চ নীলাদ্যুপরাগেণ নিয়তরূপতামবলম্বমানঃ প্রমাণশব্দব্যপদেশ্যো ভবেৎ। ন চাস্য স্বাত্মসিদ্ধিং প্রতি অন্যদপেক্ষণীয়ং—প্রকাশরূপত্বাৎ, প্রকাশস্য চ স্বপ্রকাশকত্বাৎ, তথা-ভূতোঽপ্যসৌ প্রকাশো বিমর্শরূপতাং বিনা নার্থস্য আত্মনো বা প্রকাশরূপতায়াং প্রতিষ্ঠাস্পদং স্যাৎ, ন হি প্রকাশঃ ইত্যেবাসৌ স্বপরাত্মনোঃ প্রতিষ্ঠাপকো ভবেৎ, এবং হি নীলমপি ন নীলম্ ইত্যেব কৃত্বা তথা স্যাৎ। তস্মাৎ স্বপরপ্রকাশতাসিদ্ধৌ তস্যাপি অহংপরামর্শাত্মা জীবিতভূতঃ প্রকাশোঽভ্যুপগমনীয়ো—যেন সর্ব্বং সিদ্ধ্যেৎ। যদুক্তং প্রকাশস্যাত্মবিশ্রান্তিরহংভাবো হি কীর্ত্তিতঃ ইতি। স এব চ পরপ্রকাশাত্মা পরমেশ্বরঃ শিবঃ ইত্যুক্তং—তেষামপি পরো জীবঃ স এব পরমেশ্বরঃ ইতি ॥' ৫৫ —উক্ত শ্লোকের জয়রথী ভাষ্য

১। 'এবমাদিসিদ্ধান্তাদস্য ন কেবলং সাধকং প্রমাণমকিঞ্চিৎকরং, যাবদ্বাধকমপি ইত্যাহ

'সর্ব্বাপহ্নবহেবাক-
ধর্ম্মাপ্যেবং হি বর্ত্ততে।
জ্ঞানমাত্মার্থমিত্যে-
ন্নেতি মাং প্রতি ভাসতে ॥' ৫৬

সর্ব্বেষাং জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ানাম্ অপহ্নবো নিরাকরণং তত্র হেবাক এব ধর্ম্মঃ স্বভাবো যস্যাসৌ বৌদ্ধঃ। তত্র ত্রয়াভাববাদিনো মাধ্যমিকাঃ। জ্ঞাতৃজ্ঞেয়াভাববাদিনো যোগচারাঃ। জ্ঞাত্রভাববাদিনো বৈভাষিকাঃ। সোঽপি 'হ্যেবং জ্ঞানমাত্মার্থম্' ইত্যেতৎ মাং সংবেদন-স্বভাবত্বাৎ বিচারয়িতারং প্রতি নেতি ভাসতে—নাস্তি ইতি প্রতীতিরূপো বর্ত্ততে অবতিষ্ঠতে ইত্যর্থঃ, তেন আত্মাদের্নিরাকরণে সাধনে বাপি অবশ্যমেব সাধয়িতা পূর্ব্বকোটাবাক্ষিপ্তঃ সিদ্ধঃ। ন হি সাধয়িতারমন্তরেণ অর্থানাং সাধ্যত্বৈব স্যাৎ, স চ স্বতঃ সিদ্ধঃ প্রকাশাত্মা পরমার্থরূপঃ পরমেশ্বরঃ শিব এব ॥' ৫৬ —তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক—৫৬ শ্লোক ও জয়রথভাষ্য

'ন চ তদ্ব্যতিরেক্যস্তি বিশ্বং সদ্বাবভাসতে ॥' ২

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—২ কারিকা

যা প্রকাশমান একমাত্র তারই জ্ঞান হতে পারে। প্রকাশমান থেকে অতিরিক্ত বিশ্ব বলে কিছু নেই।

যেহেতু সংবিৎ ভিন্ন জগতের উপলব্ধি সম্ভব নয়, সেহেতু পরমেশ্বর আপনার স্বাতন্ত্র্যশক্তির বলে আপনার আকাশকল্প স্বরূপে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়াত্মক বিশ্ব-বৈচিত্র্যকে যে অবভাসিত করে থাকেন, তা তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে।

এখানে অভিনবগুপ্ত দর্পণের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

'নির্ম্মলে মকুরে যদ্বদ্ ভান্তি ভূমিজলাদয়ঃ।
অমিশ্রাস্তদ্বদেকস্মিংশ্চিন্নাথে বিশ্ববৃত্তয়ঃ ॥' ৪

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৪ শ্লোক

যেমন স্বচ্ছ দর্পণে ভূমিজলাদির প্রতিবিম্ব দর্পণ থেকে অতিরিক্ত না হ'লেও তদতিরিক্ত বলে প্রতীয়মান হয়, তেমনি এক পারমেশ্বরী সংবিদে প্রতিবিম্বিত রূপাদি বিশ্ববৃত্তি তদনতিরিক্ত হ'লেও তদতিরিক্ত বলে বোধ হয়।[১]

প্রতিবিম্বকারণ স্বচ্ছতা

যে স্থলে যে গুণটি স্বচ্ছ অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, সে স্থলে সেই গুণটিরই প্রতিসংক্রমণ হয়।

'সদৃশং ভাতি নয়নদর্পণাম্বরবারিষু।
তথা হি নির্ম্মলে রূপে রূপমেবাভাসতে ॥' ৫

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৫ শ্লোক

অক্ষিগোলক, দর্পণ, আকাশ ও জলে সদৃশ বস্তুই প্রতিবিম্বিত হয়। যেহেতু ক্ষিতি, জল ও অগ্নি এই তিনটিতেই রূপ এই গুণটি স্বচ্ছ অবস্থায় আছে, সেহেতু এই তিনটিতে একমাত্র রূপই প্রতিবিম্বিত হতে পারে।[২]

১। 'সুবোধমঞ্জর্য্যাম্

'রূপাদিপঞ্চবর্গোহয়ং বিশ্বমেতাবদেব হি।
গৃহ্যতে পঞ্চভিস্তচ্চ চক্ষুরাদিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ ॥'

ইত্যাদ্যুক্তযুক্ত্যা পঞ্চৈব রূপাদয়স্তাবৎ সর্ব্বমিতি ॥' ৪

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৪ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

২। 'ইহ পৃথিব্যপতেজসাং ত্রয়াণামেব রূপবত্ত্বমিতি—পার্থিবে দর্পণাদৌ॥ আপ্যে স্তিমিতে জলাশয়াদৌ, তৈজসে চক্ষুরাদৌ চ রূপাখ্যোঽস্তি স্বচ্ছো গুণঃ সংনিবেশস্তু সংস্থানাত্মা

যেহেতু দর্পণে স্বচ্ছ স্পর্শ গুণ নাই, সেহেতু দর্পণে স্পর্শ প্রতিবিম্বিত হয় না। উদাহরণ হিসাবে তন্ত্রাচার্য্য অভিনবগুপ্ত উল্লেখ করেছেন :

'প্রচ্ছন্নরাগিণী কান্তপ্রতিবিম্বিতসুন্দরম্।
দর্পণং কুচকুম্ভাভ্যাং স্পৃশন্ত্যপি ন তৃপ্যতি ॥' ৬

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৬ শ্লোক

প্রিয়ের প্রতি গোপনভাবে অনুরক্তা নায়িকা দর্পণে প্রতিবিম্বিত প্রিয়ের সুন্দর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়, কিন্তু সেই দর্পণকে স্তনের দ্বারা বিমর্দ্দিত করে তৃপ্তি পায় না, কারণ দর্পণে প্রিয়ের স্পর্শ প্রতিসংক্রামিত না হওয়ার জন্য তার প্রিয়স্পর্শসুখের উপলব্ধি হয় না।[১]

এই স্বচ্ছতা গুণের লক্ষণ অভিনবগুপ্ত নির্ণীত করেছেন :

'নৈর্ম্মল্যং চাতিনিবিড়সজাতীয়ৈকসংগতিঃ ॥' ৭

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৭ শ্লোকার্দ্ধ

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় জয়রথ লিখছেন :

'নৈর্ম্মল্যং নাম চ এতৎ কিমুচ্যতে ? ইত্যাহ—নৈর্ম্মল্যং চেতি, অতিশয়েন নিবিড়াঃ বিজাতীয়ভাবৈরকলুষিতা যে সজাতীয়াঃ, যথা—দর্পণে রূপপরমাণবঃ, তেষাম্ একা বিজাতীয়াভাবাদসহায়া যা সংগতিঃ—নৈরন্তর্য্যেণাবস্থানাৎ স্বপুটত্বাদিপরিহারেণ[২] শ্লক্ষ্ণত্বাত্মসংহতত্বং নৈর্ম্মল্যম্।'

নৈর্ম্মল্য হ'ল অতিশয় নিবিড় অর্থাৎ বিজাতীয় ভাবের দ্বারা অস্পৃষ্ট যে সব সজাতীয় দ্রব্য তাদের একক সংগতি বা অবিমিশ্র সংহতত্ব। যখন এই বিজাতীয় ভাবশূন্য সজাতীয় দ্রব্যগুলি উঁচুনীচুভাবে অবস্থান না করে অত্যন্ত ঘনভাবে পাশাপাশি অবস্থিত হয়ে সংহত হয়, তখনই তারা স্বচ্ছতা অর্জ্জন

—ইতি তৎপ্রতিবিম্বনমেব তত্রাবভাসতে ন স্পর্শাদেঃ, তৎ খলু আনন্দস্থানাত্মকেষু কন্দাগ্রাধারাদিষু স্পর্শাদেঃ সম্ভবাৎ প্রতিসংক্রামতি, তেন য এব যত্র স্বচ্ছোঽস্তি গুণঃ স এব তত্র প্রতিসংক্রামতীত্যাশয়ঃ ॥' ৫ —তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৫ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

১। 'অত এব সুন্দরমিত্যনেন দর্শনবশোন্মিষিতাহ্লাদাতিশয়কারিত্বমপি সূচিতম্। এবমস্যাসংবেদ্য এতৎস্পর্শোঽপি মে ভূয়াদিতি তত্র কৃতপ্রযত্নাপি সা দর্পণে স্পর্শাপ্রতিসংক্রমাৎ তমলভমানা ন তৃপ্যতি ন প্রীয়তে ইত্যর্থঃ।'

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৬ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

২। 'স্বপুটত্বাদিপরিহারেণ নিম্নোন্নতাদেঃ পরিহার্য্যাবস্থানাদিত্যর্থঃ'

—উক্ত পদের মধুসূদন শাস্ত্রীকৃত পাদটীকা

করে। যখন দর্পণের রূপ বিজাতীয় ভাবের দ্বারা আক্রান্ত না হয়, তখনই তা স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হয়ে রূপের প্রতিবিম্বগ্রহণে সক্ষম হয়। আবার যখন দর্পণের রূপ বাষ্প, ধূলি ইত্যাদি বিজাতীয় ভাবের দ্বারা আক্রান্ত হয, তখন স্বচ্ছতার অভাবহেতু দর্পণে রূপ প্রতিবিম্বিত হয় না। অতএব সিদ্ধান্ত হ'ল :

'যত্তস্তৈব প্রতিবিম্বার্পকাপেক্ষয়া বিশিষ্টঃ স্বচ্ছতাখ্যো গুণঃ স এব তৎ-প্রতিবিম্বং গৃহ্ণাতি ইতি'

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৭ শ্লোকার্দ্ধের জয়রথভাষ্য

যে প্রতিবিম্বিত হয় তার চেয়ে অধিকতর স্বচ্ছতা গুণ যেখানে আছে সে-ই প্রতিবিম্বগ্রহণে সক্ষম।[১]

দর্পণে একমাত্র রূপ এই গুণটিই স্বচ্ছ অবস্থায় আছে। এইজন্য দর্পণ প্রতিবিম্বাকারে একমাত্র রূপকেই অবভাসিত করতে পারে, স্পর্শাদিকে পারে না। যদি দর্পণে প্রতিবিম্বিত রূপের স্পর্শাদি থাকে, তাহ'লে তার স্পর্শাদির ধর্ম্ম গুরুত্বাদিরও অবভাস হবে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, দর্পণে পর্ব্বত প্রতিবিম্বিত হ'লে পর্ব্বতের কেবল রূপই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয, স্পর্শাদি হয না, পর্ব্বতের স্পর্শধর্ম্ম গুরুত্ব দর্পণে সংক্রামিত হ'লে দর্পণও পর্ব্বতের মতো অচাল্য হ'ত।[২]

চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক্—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রহণযোগ্য পাঁচ পাঁচটি বিষয় আছে, যথা—রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ। রূপ চক্ষুগ্রাহ্য, শব্দ কর্ণগ্রাহ্য, রস জিহ্বাগ্রাহ্য, গন্ধ নাসিকাগ্রাহ্য ও স্পর্শ ত্বগিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যে ইন্দ্রিয়ের যেটি বিষয়, সেটি ছাড়া অন্য কোন বিষয়কেই সেই ইন্দ্রিয়টি গ্রহণ করতে পারে না। যেমন—চক্ষু একমাত্র রূপকেই দেখতে পায়, শব্দ শুনতে পায় না, কর্ণেন্দ্রিয় একমাত্র শব্দই শুনতে পায়, রূপ প্রত্যক্ষ করতে পারে না।

১। 'অত্র এব চ 'রূপ এব রূপমবভাসতে' ইত্যাদৌ প্রতিজ্ঞাতো দর্পণোঽপি মুখে প্রতিবিম্বেৎ—ইত্যবিশেষেণ বিম্বপ্রতিবিম্বভাবো ন ভবতি—ইত্যপ্যাবেদিতম্ ॥' ৭

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৭ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

২। 'অতএব গুরুত্বাদির্ধর্ম্মা নৈতস্ত লক্ষ্যতে।
মহ্যাদর্শে সংস্থিতাঽসৌ তদ্দৃষ্টৌ স উপায়কঃ ॥' ১৮

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—১৮ শ্লোক

আসল কথা হ'ল এই যে, চক্ষুরিন্দ্রিয়ে একমাত্র রূপ এই স্বচ্ছ গুণটিই আছে, শব্দাদি অন্য গুণ নাই, সেইজন্য চক্ষুরিন্দ্রিয় একমাত্র রূপকেই প্রতিবিম্বাকারে গ্রহণ করতে সক্ষম। অনুরূপভাবে, কর্ণেন্দ্রিয়ে একমাত্র শব্দ এই স্বচ্ছ গুণটিই আছে, রূপাদি অন্য গুণ নাই, সেইজন্য কর্ণেন্দ্রিয় একমাত্র শব্দকেই প্রতিবিম্বিত করতে পারে।

এই কারণেই সমস্ত ঐন্দ্রিয়ক জ্ঞান একবিধ হ'লেও রূপ, শব্দ, রস, গন্ধ ও স্পর্শের প্রতিবিম্বনের পার্থক্য অনুযায়ী চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, শ্রাবণ প্রত্যক্ষ, রাসন প্রত্যক্ষ, ঘ্রাণ প্রত্যক্ষ ও ত্বাচ্ প্রত্যক্ষ—এই পাঁচ প্রকার পৃথক পৃথক আকার ধারণ করে থাকে। এইরূপ পারমেশ্বরী সংবিদের দিক থেকে সমস্ত জ্ঞান একবিধ হ'লেও ঘট, পট, লোষ্ট্র, কাষ্ঠ ইত্যাদি প্রতিবিম্বিত বস্তুরূপের পারস্পরিক পার্থক্য অনুযায়ী ঘটজ্ঞান, পটজ্ঞান, লোষ্ট্রজ্ঞান, কাষ্ঠজ্ঞান ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন আকার পরিগ্রহ করে।[১]

পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ে তাদের নিজ নিজ বিষয়-প্রতিবিম্বনের পক্ষে সেই সেই ইন্দ্রিয়গুলির সেই সেই বিষয়ের সাম্মুখ্য প্রয়োজন হয়। এই কারণেই দূরদেশে অবস্থিত বস্তুর রূপ চক্ষুর্গ্রাহ্য হয় না, বা দূরদেশে উৎপন্ন শব্দ শ্রুতিগোচর হতে পারে না।

তন্ত্রাচার্য্যগণ এক্ষেত্রে বলেছেন: 'নিয়মাৎ বিম্বসাংমুখ্যং প্রতিবিম্বস্য'—'বিম্ব সম্মুখে না থাকলে প্রতিবিম্ব পড়ে না, এই হ'ল নিয়ম।[২] দর্পণে মুখ প্রতিবিম্বিত হওয়ার ফলে দেখা যায় যে, মুখের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করতে গেলে দর্পণকে মুখের সামনে থাকতেই হবে, নইলে দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়বে না।

১। 'ইহ খলু তত্তদিন্দ্রিয়জং জ্ঞানং গৃহীততত্তৎপ্রতিবিম্বমেব বিষয়ং পরিচ্ছিন্দ্যাৎ অন্যথা হি নিরাকারস্য জ্ঞানস্য নীলপীতাদ্যনেকবিষয়সাধারণত্বাৎ ইদং নীলজ্ঞানম্, ইদং পীতজ্ঞানম্ ইতি নিয়মো ন স্যাৎ, অতশ্চ সাকারং জ্ঞানম্—আকারবত্তামন্তরেণাস্য প্রতিকর্ম্মব্যবস্থানুপপত্তেঃ ······এতেন ইন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহীততত্তৎপ্রতিবিম্বান্যেব তত্তৎবিষয়পরিচ্ছেদমাধাতুমুৎসহন্তে ইতি ॥' ৩১ —তন্ত্রালোক: ৩য় আহ্নিক—৩১ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

২। 'নিয়মাৎ বিম্বসাংমুখ্যং প্রতিবিম্বস্য যত্ততঃ।
তন্মধ্যগাঃ প্রমাতারঃ শৃণ্বন্তি প্রাতিশব্দকম্ ॥' ২৮
—তন্ত্রালোক: ৩য় আহ্নিক—২৮ শ্লোক

যেহেতু দর্পণস্থ মুখপ্রতিবিম্ব দর্পণ ছাড়া আর কিছুই নয়, সেহেতু দর্পণের মুখের সামনে নিয়মপূর্ব্বক থাকার অর্থই হ'ল প্রতিবিম্বের নিয়মপূর্ব্বক বিম্বের সামনে থাকা।[১]

নৈয়ায়িকগণ তন্ত্রাচার্য্য-বর্ণিত এই সাংমুখ্যকে দ্রব্যপ্রত্যক্ষের স্থলে বিষয়েন্দ্রিয়-সংবন্ধরূপ ব্যাপার বলেছেন। এই সন্নিকর্ষ আবার ছয় প্রকার।[২]

১। 'সাংমুখ্যং চোচ্যতে তাদৃগ্ দর্পণাভেদসংস্থিতেঃ ॥' ৩০ —তন্ত্রালোক : ৩০ শ্লোকার্দ্ধ 'এতদেবাস্য সাংমুখ্যং—যদ্দর্পণো বিম্বসাংমুখ্যেন বর্ত্ততে, তদনধিকবৃত্তিত্বাৎ তস্য দর্পণাদেঃ পুনরবশ্যম্ভাবিবিম্বসাংমুখ্যম্, অন্যথা হি প্রতিবিম্বস্যোৎপত্তিরেব ন স্যাৎ, এবমাকাশাদেরপি বিম্বসাংমুখ্যেনৈব হি শব্দাদিপ্রতিবিম্বগ্রাহিত্বম্ ইতি অবগন্তব্যম্ ॥' ৩০ —ঐ জয়রথভাষ্য

'অতঃ কূপাদিপিঠিরাকাশে তৎপ্রতিবিম্বিতম্।

বক্ত্রাকাশং সশব্দং সৎ ভাতি তৎপরবক্ত্রবৎ ॥' ৩১ —তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৩১ শ্লোক '—তথাপি অভিনিবেশাদিনা বক্তৃপ্রতিবক্ত্রোঃ পরস্পরমবশ্যম্ভাবিসাংমুখ্যমিত্যেতন্নিদর্শনীকৃতম্। শ্রোতৃণাং পুনরসাংমুখ্যমপি সম্ভাব্যতে, তথাহি—এবং বদন্তো লৌকিকাঃ শ্রোতারো দৃশ্যন্তে ন ময়া শ্রুতমনেনোক্তমিতি।......... এবং প্রতিবিম্বমপি তদভেদবৃত্তিত্বাৎ বিম্বসংমুখমেবেতি যুক্ত-মুক্তম্ নিয়মাৎ বিম্বসাংমুখ্যং প্রতিবিম্বস্যেতি ॥' ৩১ —ঐ জয়রথভাষ্য

২। 'বিষয়েন্দ্রিয়সংবন্ধো ব্যাপারঃ সোঽপি ষড়্বিধঃ।
দ্রব্যগ্রহস্তু সংযোগাৎ সংযুক্তসমবায়তঃ ॥ ৫৯
দ্রব্যেষু সমবেতানাং তথা তৎসমবায়তঃ।
তত্রাপি সমবেতানাং শব্দস্য সমবায়তঃ ॥ ৬০
তদ্বৃত্তীনাং সমবেতসমবায়েন তু গ্রহঃ।
বিশেষণতয়া তদ্বদভাবানাং গ্রহো ভবেৎ ॥ ৬১
যদি স্যাদুপলভ্যেতেত্যেবং যত্র প্রসজ্যতে।
প্রত্যক্ষং সমবায়স্য বিশেষণতয়া ভবেৎ ॥ ৬২'

—ভাষাপরিচ্ছেদ : ৫৯—৬২ কারিকা

'বস্তুতস্তু দ্রব্যচাক্ষুষং প্রতি চক্ষুঃসংযোগঃ কারণম্, দ্রব্যসমবেতচাক্ষুষং প্রতি চক্ষুঃসংযুক্ত-সমবায়ঃ কারণং, দ্রব্যসমবেতসমবেতচাক্ষুষং প্রতি চক্ষুঃসংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ, এবমন্যত্রাপি বিশিষ্যৈব কার্য্যকারণভাবঃ......... এবং দ্রব্যস্পার্শনপ্রত্যক্ষে ত্বক্‌সংযোগঃ কারণম্। দ্রব্য-সমবেতস্পার্শনপ্রত্যক্ষে ত্বক্‌সংযুক্তসমবায়ঃ। দ্রব্যসমবেতসমবেতস্পার্শনপ্রত্যক্ষে ত্বক্‌সংযুক্ত-সমবেতসমবায়ঃ।.........এবং গন্ধপ্রত্যক্ষে ঘ্রাণসংযুক্তসমবায়ঃ, গন্ধসমবেতস্য ঘ্রাণজপ্রত্যক্ষে ঘ্রাণসংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ, রাসনপ্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্তসমবায়ঃ, রসসমবেতরাসনপ্রত্যক্ষে রসনাসংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ কারণম্। শব্দপ্রত্যক্ষে শ্রোত্রাবচ্ছিন্নসমবায়ঃ, শব্দসমবেত-শ্রাবণপ্রত্যক্ষে শ্রোত্রাবচ্ছিন্নসমবেতসমবায়ঃ কারণম্। অত্র সর্ব্বং প্রত্যক্ষং লৌকিকং বোধ্যম্। বক্ষ্যমাণম্ অলৌকিকপ্রত্যক্ষমিন্দ্রিয়সংযোগাদিকং বিনাপি সম্ভবতি। এবমাত্মপ্রত্যক্ষে মনঃসংযোগঃ, আত্মসমবেতমানসপ্রত্যক্ষে মনঃসংযুক্তসমবায়ঃ, আত্মসমবেতসমবেতমানসপ্রত্যক্ষে মনঃসংযুক্তসমবেতসমবায়ঃ কারণম্। অভাবপ্রত্যক্ষে সমবায়প্রত্যক্ষে চ ইন্দ্রিয়সংবদ্ধবিশেষণতা

অবশ্য নৈয়ায়িকগণ তান্ত্রিকদের মতো প্রতিবিম্ববাদী নন। দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ছে, এ-কথা নৈয়ায়িক স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, দ্রষ্টার প্রত্যাবৃত্ত নয়নরশ্মি যখন আপন মুখকে গ্রহণ করে, তখনই দ্রষ্টার দর্পণে মুখ প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, এরূপ ভ্রান্তি উদিত হয়। প্রমা ও ভ্রমজ্ঞান—জ্ঞানের যেহেতু এই দুটি প্রকার, সেহেতু প্রতিবিম্বজ্ঞান বলে কোন তৃতীয় জ্ঞান থাকতে পারে না, অতএব প্রতিবিম্বও নাই।

এস্থলে প্রতিবিম্বসিদ্ধির জন্য তন্ত্রাচার্যদের প্রথম যুক্তি হ'ল এই যে, প্রমাতার দেহ থেকে বিচ্ছুরিত নয়নরশ্মি যদি প্রত্যাবৃত্ত হয়ে আপনার অধিষ্ঠাতার মুখ জানতে পারে, তাহ'লে দর্পণের প্রয়োজন কি? কুড্যাদি কেন এই নয়নরশ্মিকে প্রত্যাবৃত্ত করতে সক্ষম নয়? দর্পণ যেরূপ মূর্ত্তত্বাদি গুণবিশিষ্ট, কুড্যাদিও সেরূপ; অতএব দর্পণের মতো তারও তো নয়নরশ্মিকে প্রতিহত করা উচিত।

হেতুঃ। বৈশেষিকমতে তু সমবায়ো ন প্রত্যক্ষঃ। অত্র যদ্যপি বিশেষণতা নানাবিধা, তথাপি ভূতলাদৌ ঘটাদ্যভাবঃ সংযুক্তবিশেষণতয়া গৃহ্যতে। সংখ্যাদৌ রূপাদ্যভাবঃ সংযুক্তসমবেতবিশেষণতয়া, সংখ্যাত্বাদৌ রূপাদ্যভাবঃ সংযুক্তসমবেতসমবেতবিশেষণতয়া, শব্দাভাবঃ কেবলশ্রোত্রাবচ্ছিন্নবিশেষণতয়া, কাদৌ খত্বাদ্যভাবঃ শ্রোত্রাবচ্ছিন্নসমবেতবিশেষণতয়া এবং কত্বাদ্যবচ্ছিন্নাভাবে গত্বাভাবাদিকং শ্রোত্রাবচ্ছিন্নবিশেষণবিশেষণতয়া, ঘটাভাবাদৌ ঘটাভাবঃ চক্ষুঃসংযুক্তবিশেষণবিশেষণতয়া, এবমন্যত্রাপ্যূহ্যম্, তথাপি বিশেষণতাত্বেন একৈব সা গণ্যতে, অন্যথা ষোঢ়া সন্নিকর্ষ ইতি প্রাচাং প্রবাদো ব্যাহন্যেতেতি। অত্রাভাবপ্রত্যক্ষে যোগ্যানুপলব্ধিঃ কারণম্। তথাহি ভূতলাদৌ ঘটাদিজ্ঞানে জাতে ঘটাভাবাদিকং ন জ্ঞায়তে তেনাভাবোপলম্ভে প্রতিযোগ্যুপলম্ভাভাবঃ কারণম্। তত্র যোগ্যতাপি অপেক্ষিতা, সা চ প্রতিযোগিসত্ত্বপ্রসংজনপ্রসংজিতপ্রতিযোগিকত্বরূপা, তদর্থশ্চ প্রতিযোগিনো ঘটাদেঃ সত্ত্বপ্রসক্ত্যা প্রসংজিত উপলম্ভরূপঃ প্রতিযোগী যস্য সোঽভাবপ্রত্যক্ষে হেতুঃ, তথাহি—যত্রালোকসংযোগাদিকং বর্ত্ততে তত্র যদ্যত্র ঘটঃ স্যাৎ তর্হি উপলভ্যেতেত্যাপাদয়িতুং শক্যতে তত্র ঘটাভাবাদেঃ প্রত্যক্ষং ভবতি, অন্ধকারে তু নাপাদয়িতুং শক্যতে, তেন ঘটাভাবদেরন্ধকারে ন চাক্ষুষপ্রত্যক্ষং, স্পার্শনপ্রত্যক্ষং তু ভবত্যেব, আলোকসংযোগং বিনা স্পার্শনপ্রত্যক্ষস্যাপাদয়িতুং শক্যত্বাৎ। গুরুত্বাদিকং যদযোগ্যং তদভাবস্তু ন যোগ্যঃ, তত্র গুরুত্বাদিপ্রত্যক্ষস্যাপাদয়িতুমশক্যত্বাৎ, বায়াবুদ্ভূতরূপাভাবঃ, পাষাণে সৌরভাভাবঃ, গুড়ে তিক্তাভাবঃ, বহ্নৌ অনুষ্ণত্বাভাবঃ, শ্রোত্রে শব্দাভাবঃ, আত্মনি সুখাদ্যভাবঃ, এবমাদয়স্তত্তদিন্দ্রিয়ৈর্গৃহ্যন্তে তত্তৎপ্রত্যক্ষস্যাপাদয়িতুং শক্যত্বাৎ। সংসর্গাভাবপ্রত্যক্ষে প্রতিযোগিনো যোগ্যতা, অন্যোন্যাভাবপ্রত্যক্ষে অধিকরণযোগ্যতাপেক্ষিতা, অতঃ স্তম্ভাদৌ পিশাচাদিভেদোঽপি চক্ষুষা গৃহ্যতে ॥ ৫৯-৬০-৬১-৬২ ॥ এবং প্রত্যক্ষং লৌকিকালৌকিকভেদেন দ্বিবিধং তত্র লৌকিকপ্রত্যক্ষে ষোঢ়াসন্নিকর্ষো বর্ণিতঃ।'

—ভাষাপরিচ্ছেদের ৫৯-৬০-৬১-৬২ কারিকাবলীর সিদ্ধান্তমুক্তাবলী টীকা

অন্যতম যুক্তি হ'ল : প্রতিফলনের দ্বারা প্রত্যাবৃত্ত নয়নরশ্মি যখন আপন অধিষ্ঠাতার মুখ প্রত্যক্ষ করে, তখন যেখানে অধিষ্ঠাতা সেখানেই মুখের প্রত্যক্ষ না হয়ে দর্পণের অভ্যন্তরে কেন মুখের প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে ?

তান্ত্রিকদের তৃতীয় যুক্তি হ'ল এই যে, যদি দ্রষ্টার আপন মুখেই মুখের রূপের জ্ঞান হয়ে থাকে, তাহ'লে এই রূপজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গেই স্পর্শজ্ঞান হওয়া উচিত। কারণ, রূপের সন্নিবেশ রয়েছে, অথচ তার স্পর্শ নাই এরূপ দেখা যায় না। দর্পণে মুখ প্রত্যক্ষ করার ক্ষেত্রে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, মুখের রূপই দর্পণে প্রতিবিম্বিত, স্পর্শ নয়। তাছাড়া, নৈয়ায়িকদের মতো দর্পণে মুখপ্রত্যক্ষকে ভ্রান্তি বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ, ভ্রান্তির স্থলে একটি বস্তু অপর একটি বস্তুর আকারে অবভাসিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে কোন্ বস্তুটি কোন্ বস্তুর আকারে অবভাসিত হচ্ছে ? দর্পণ কি মুখের আকারে অবভাসিত ? না, দ্রষ্টার আপন মুখ পরমুখের আকারে ? দর্পণে যখন মুখ প্রত্যক্ষ হয়, তখন অখণ্ড দর্পণটিও চোখে দেখা যায় ; দর্পণের জায়গায় মুখ দেখা যায় না। আর আপন মুখ যে পরমুখের আকারে অবভাসিত হয় না, তা তো স্বতঃসিদ্ধ। আপন মুখ পরমুখের মতো দেখা গেলে, কোন সীমন্তিনীই আর মুখের ভূষণ-বিন্যাস ও প্রসাধনে যত্ন নিতেন না।

সুতরাং নৈয়ায়িকদের মতানুযায়ী প্রতিবিম্বজ্ঞান ভ্রমজ্ঞান নয়। কারণ প্রতিবিম্বের রূপসংস্থান পরিলক্ষিত হচ্ছে। তাই প্রতিবিম্বও বস্তু। আবার প্রতিবিম্বজ্ঞান প্রমাও নয়। কারণ প্রতিবিম্বের শুধু রূপসংস্থানই আছে, স্পর্শাদি নাই। অতএব প্রতিবিম্বকে অবস্তুও বলতে হয়। নইলে বিম্ব থেকে তার পার্থক্য লুপ্ত হয়।

অতএব তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হ'ল : প্রমা ও প্রমাজ্ঞান ছাড়া আরো এক প্রকার জ্ঞান আছে, তার নাম হ'ল প্রতিবিম্বজ্ঞান। আর এই প্রতিবিম্ব বস্তুও নয়, অবস্তুও নয়, বস্তু ও অবস্তু থেকে স্বতন্ত্র অনির্ব্বাচ্য পদার্থ।[১]

১। 'যস্ত্বাহ নেত্রতেজাংসি স্বচ্ছাৎ প্রতিফলন্ত্যলম্।
বিপর্যস্ত স্বকং বক্ত্রং গৃহ্ণন্তীতি স পৃচ্ছতে॥ ১২
দেহাদন্যত্র যত্তেজস্তদধিষ্ঠাতুরাত্মনঃ।
তেনৈব তেজসা জ্ঞেয়ে কোহর্থঃ স্যাৎ দর্পণেন তু॥ ১৩

দর্পণে রূপ এই গুণটি স্বচ্ছভাবে থাকার জন্য যেমন দর্পণে রূপ প্রতিবিম্বিত হয়, আকাশে তেমনি শব্দ এই গুণটি স্বচ্ছভাবে থাকার ফলে আকাশে শব্দ

বিপর্যয়ৈস্তস্তু তেজোভির্গ্রাহকাত্মত্বমাগতৈঃ।
রূপং দৃশ্যেত বদনে নিজে ন মকুরান্তরে ॥ ১৪
স্বমুখে স্পর্শবচ্চেত্তদ্রূপং ভায়াদ্ময়েত্যলম্।
ন ত্বস্য স্পৃশ্যভিন্নস্য বেদ্যৈকাত্মস্বরূপিণঃ ॥ ১৫'

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক, ১২—১৫ শ্লোক

'ভ্রান্তৌ হি আরোপ্যমাণমেব পরিস্ফুরতি ন বস্তুতত্ত্বমপি, শুক্তিকারজতনির্ভাসে হি যদি শুক্তিকাপি ভায়াৎ তৎকৃতং রজতনির্ভাসেন ইতি ভ্রান্তিরেব ন স্যাৎ, এবং সত্যমেব চেৎ মুখং গৃহীতং কা নাম ভ্রান্তিঃ, ভ্রান্তাবপি বা কিং দর্পণ এব মুখত্বেন ভাতি উত স্বমুখং পরমুখত্বেন ? ন তাবৎ আদ্যঃ পক্ষো দর্পণস্যাখণ্ডস্যৈব নির্ভাসমানত্বাৎ, ন হি রজতনির্ভাসাবসরে শুক্তিকায়া অপি ভানং ভবেৎ, নাপি দ্বিতীয়ঃ—এবং হি ঔদাসীন্যমবলম্বমানঃ সর্ব্বো জনঃ স্বমুখে ভূষণবিন্যাসপ্রসাধনাদৌ অনাদৃতঃ স্যাৎ, তস্মাৎ ভ্রান্ত্যভাবাৎ বিম্ববিলক্ষণং প্রতিবিম্বাখ্যং বস্ত্বন্তরমেবৈতদভ্যুপগন্তব্যম্ ॥' ১৫ —তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—১৫ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

'রূপসংস্থানমাত্রং তৎস্পর্শগন্ধরসাদিভিঃ।
শূন্যভূতৈরেব তদ্ব্যক্তং বস্তু তৎপ্রতিবিম্বিতম্ ॥' ১৬

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—১৬ শ্লোক

'তৎ—উক্তাৎ ভ্রান্ত্যভাবাদের্হেতোঃ, স্পর্শাদিশূন্যত্বাৎ কেবলং তদ্রূপসংস্থানং, তত্র দর্পণাদৌ প্রতিবিম্বিতং সৎ বস্ত্বেব, ন পুনরবস্তু, কিন্তু স্পর্শাদিভির্ন্যগ্ভূতৈরেব তদ্ব্যক্তম্ অন্যথা হ্যস্য বিম্বাদবিশেষ এব স্যাৎ, তস্মাৎ অস্ত্যেব প্রতিবিম্বলক্ষণস্তৃতীয়ো রাশিরিত্যাশয়ঃ ॥' ১৬

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—১৬ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

যেমন দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে, তেমনি একজনের মুখোচ্চারিত শব্দ অন্যজনের শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশে প্রতিবিম্বিত হয়। নৈয়ায়িকগণ একজনের দ্বারা উচ্চারিত শব্দের অন্যজনের শ্রুতিগোচরতার ক্ষেত্রে শ্রুতিগোচর শব্দটিকে শব্দজাত শব্দ বলে থাকেন। কিন্তু তান্ত্রিকগণ এই শ্রুতিগম্য শব্দের বাস্তব শব্দজাত শব্দের সঙ্গে মিল দেখতে না পেয়ে এই শ্রুতিগম্য শব্দকে নৈয়ায়িকদের মতো শব্দজাত শব্দ বলেন না।

'ইত্থং প্রদর্শিতেঽমুত্র প্রতিবিম্বনবর্ত্মনি।
শব্দস্য প্রতিবিম্বং যৎ প্রতিশ্রুৎকেতি ভণ্যতে ॥ ২৪
ন চাসৌ শব্দজঃ শব্দ আগচ্ছত্বেন সংশ্রবাৎ।
তেনৈব বক্ত্রা দূরস্থৈঃ শব্দস্যাশ্রবণাদপি ॥ ২৫
পিঠরাদিপিধানাংশবিশিষ্টচ্ছিদ্রসংগতৌ।
চিত্রত্বাচ্চাস্য শব্দস্য প্রতিবিম্বং মুখাদিবৎ ॥ ২৬'

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক, ২৪—২৬ শ্লোক

'...বস্তুভূতশব্দজশব্দজাতীয়ত্বানুপলব্ধ্যা নাসৌ শব্দজঃ শব্দঃ, তস্মাৎ যথা মুখস্য দর্পণাদৌ প্রতিবিম্বমস্তি তথাস্য মুখ্যস্যাপি নভসি ইত্যাহ—অস্য শব্দস্য প্রতিবিম্বং মুখাদিবৎ ইতি ॥'

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক, ২৪—২৬ শ্লোকের জয়রথ-কৃত ভাষ্যের অংশ

প্রতিবিম্বিত হয়। এইভাবেই দেহের অঙ্গবিশেষগুলিতে, যেখানে যেখানে স্পর্শ এই গুণটি স্বচ্ছাকারে বিদ্যমান, সেখানে সেখানে স্পর্শ প্রতিসংক্রান্ত হয়ে থাকে।[১]

দর্পণে রূপপ্রতিবিম্ব দর্শন করতে হ'লে যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয়েব ক্রিয়া প্রয়োজন হয়, তেমনি চক্ষুগোলকে প্রতিবিম্বিত রূপের প্রত্যক্ষও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের কার্য্যকারিতা ছাড়া সম্ভব হয় না। এরূপ রসাদিপ্রতিবিম্বও আপন আপন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া ছাড়া প্রত্যক্ষ হয় না।

তবে রূপপ্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রত্যক্ষের স্পর্শপ্রত্যক্ষ, গন্ধপ্রত্যক্ষ ও রসপ্রত্যক্ষ থেকে পার্থক্য হ'ল এই যে, রূপপ্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রত্যক্ষে যেমন রূপক্ষেত্র ও শব্দক্ষেত্র অপর প্রমাতার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অনুভূত হয়, স্পর্শপ্রত্যক্ষ, গন্ধপ্রত্যক্ষ ও রসপ্রত্যক্ষে তেমনি স্পর্শক্ষেত্র, গন্ধক্ষেত্র ও রসক্ষেত্র অপর প্রমাতার ইন্দ্রিয়গোচর নয়।

এই সব রূপাদি প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অবশ্য সেই সেই প্রত্যক্ষকারক ইন্দ্রিয়গুলি অন্তঃকরণেব দ্বারা অধিষ্ঠিত হওয়া চাই, নচেৎ কোন ইন্দ্রিয়েবই কার্য্যকারিতা সম্ভব নয়।[২]

১। 'শব্দো নভসি সানন্দে স্পর্শধামনি সুন্দরঃ।
স্পর্শোঽন্যোঽপি দৃঢাঘাতশূলশীতাদিকোদ্ভবঃ।
পরস্থঃ প্রতিবিম্বত্বাৎ স্বদেহোচ্ছলনাকরঃ॥' ৩৬
—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—৩৬ শ্লোক

'সানন্দ ইতি আনন্দস্থানাত্মকে কন্দহৃত্তালুতলাদৌ আধারবিশেষে, তত্রৈব হি স্পর্শস্য নৈর্মল্যাৎ মিথুনোপভোগসমুচিতঃ স্পর্শঃ প্রতিসংক্রামতি যেন ধাতুনিঃস্যন্দসুখাত্মপি স্যাৎ। অত এবানন্দাতিশয়কারিত্বাৎ সুন্দর ইত্যুক্তম্। অন্যো দুঃখাদিকারিত্বং অসুন্দরোঽপি স্পর্শোঽহবাৎ দুঃখাত্মাত্মকে মত্তগন্ধজঠবকুমনাড়ীকণ্ঠপ্রভৃতৌ আধাববিশেষে প্রতিসংক্রামতি যেন মূর্চ্ছাত্মপি স্যাৎ॥'
—ঐ জয়রথভাষ্য

২। 'যথা চ রূপং প্রতিবিম্বিতং দৃশো
ন চক্ষুষাক্ষেন বিনা হি লক্ষ্যতে।
তথা রসস্পর্শনসৌরভাদিকং
ন লক্ষ্যতেঽক্ষেণ বিনা স্থিতং ত্বপি॥' —তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৩৯ শ্লোক

'ইহ অবভাসনমাত্রসারমেব প্রতিবিম্বসতত্ত্বমিত্যুক্তং বহুশঃ, অবভাসনং চ তত্তদ্বিষয়গ্রাহকে ক্রিয়ানুগ্রাহকান্তঃকরণাধিষ্ঠানায়ত্তম্, যতঃ সন্নিহিতেঽপি দর্পণাদৌ যদি চক্ষুরাদীন্দ্রিয়জাতমন্তঃকরণাধিষ্ঠিতং ন জাতং তৎ কো নাম মুখাদিপ্রতিবিম্বাবভাসঃ, তত্তচ্চ দৃশো'

অতএব প্রতিবিম্ববাদী তন্ত্রাচার্য্যদের সিদ্ধান্ত হ'ল :

'তেন সংবিত্তিমকুরে বিশ্বমাত্মানমর্পয়ৎ।
নাথস্য বদতেহমুষ্য বিমলাং বিশ্বরূপতাম্ ॥' ৪৪

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৪৪ শ্লোক

দর্পণে মুখপ্রতিবিম্ব দর্পণের স্বচ্ছতা সপ্রমাণ করে; অতএব দর্পণের মতো স্বচ্ছ সংবিত্তত্ত্বে জগৎ আপনার প্রতিবিম্ব অর্পণ করে জগন্নাথ শিবের বিশুদ্ধ জগন্ময়তা অর্থাৎ জগৎ থেকে অভিন্নতা প্রমাণিত করছে। জগৎ সংবিৎ থেকে অতিরিক্ত কিছু নয়।

দৃগিন্দ্রিয়াধিষ্ঠেয়য়োঃ গোলকয়োঃ প্রতিসংক্রান্তং রূপম্ অন্যেন অন্যসম্বন্ধিনা চক্ষুরিন্দ্রিয়েণ বিনা নাভিলক্ষ্যতে—চক্ষুরিন্দ্রিয়ান্তরব্যাপারমন্তরেণ ন নির্ভাসতে ইত্যর্থঃ। ন কেবলং তৎ-পরিচ্ছেদকৌশলশূন্যে দর্পণাদৌ প্রতিসংক্রান্তস্য রূপস্যাবভাসনে অন্যসম্বন্ধিচক্ষুরিন্দ্রিয়োপযোগো যাবৎ স্বয়ংমেবংকুশলয়োর্দৃশোরপি ইতি দর্শয়িতুমুক্তং দৃশোরিতি। ন খলু চক্ষুরঞ্জনাদিবদতি-সংনিকৃষ্টং পরিচ্ছেত্তুমলমিতি ভাবঃ, তেন ন ইন্দ্রিয়ব্যাপারমন্তরেণ এতৎ নির্ভাসতে ইতি তাৎপর্য্যম্। এবং যথৈতৎ তথা রসাদি প্রতিসংক্রান্তং সৎ স্থিতমপি স্বেন্দ্রিয়ব্যাপারমন্তরেণ পুনর্ন লক্ষ্যতে নাবভাসতে ইত্যর্থঃ।........ননু ইহ রূপশব্দয়োরন্তশ্চক্ষু-শ্রোত্রাদৌ বহিশ্চ দর্পণাকাশাদৌ প্রতিবিম্বযোগ ইতি বাহ্যং প্রতিবিম্বমন্যসংবন্ধিভ্যাং চক্ষুঃশ্রোত্রাভ্যাং পরিচ্ছিদ্যতে ইতি উপপন্নম্। স্পর্শাদি পুনঃ অন্তর্দেহ এব কন্দাদৌ প্রতিসংক্রামতি ইতি তত্র স্থিতং, তৎপরসংতানস্য নিত্যানুমেয়ত্বাচ্চ অন্যস্য সংবন্ধিনো বাহ্যেন্দ্রিয়জ্ঞানস্য বিষয়ো ন ভবেৎ, তৎকথমুক্তং রূপপ্রতিবিম্ববদেতদক্ষেণ বিনা ন লক্ষ্যতে ইতি ॥' ৩৯ —ঐ জয়রথভাষ্য

'ন চান্তরে স্পার্শনধামনি স্থিতং
বহিঃস্পৃশোন্যাক্ষধিয়ঃ স গোচরঃ ॥' ৪০ —তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৪০ শ্লোক

'আন্তরে ইতি অন্তর্দেহবৃত্তিত্বাৎ, স্পার্শনধামনীত্যুপলক্ষণম্ তেন গন্ধরসক্ষেত্রয়োরপি গ্রহণম্, অন্যাক্ষধিয়শ্চান্তরস্পর্শাদ্যগ্রহণে বহিঃস্পৃশ ইতি বিশেষণদ্বারকো হেতুঃ, স ইতি গোচরশব্দাপেক্ষো নির্দেশঃ। এবমন্তর্দেহবৃত্তিত্বাৎ কন্দাদেঃ স্পর্শাদিক্ষেত্রস্য চ চক্ষুর্গোলকাদিবৎ প্রমাত্রন্তরে ইন্দ্রিয়গোচরতা নাস্তি ইতি ॥' ৪০ —ঐ জয়রথভাষ্য

'অতোহস্তিকস্বস্বকত'দৃগিন্দ্রিয়-
প্রয়োজনাস্তঃ করণৈর্যদা কৃতা।
তদা তদান্তং প্রতিবিম্বমিন্দ্রিয়ে
স্বকাং ক্রিয়াং সূয়ত এব তাদৃশীম্ ॥' ৪১ —তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৪১ শ্লোক

'ন তু স্মৃতাত্মানসগোচরাদৃতা ভবেৎ ক্রিয়া সা খলু বর্ত্তমানতঃ।
অতঃ স্থিতঃ স্পর্শবরস্তদিন্দ্রিয়ে সমাগতঃ সন্ বিদিতস্তথাক্রিয়ঃ ॥'
—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৪২ শ্লোক

'অসম্ভবে বাহ্যগতস্য তাদৃশঃ স্ব এব তস্মিন প্রতিবিম্বিতস্তথা।
করোতি তাং স্পর্শবরঃ সুখাত্মিকাং স চাপি কস্যামপি নাড়িসংততৌ ॥' ৪৩
—ঐ ৪৩ শ্লোক

এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য্য আচার্য্য জয়রথ তাঁর ভাষ্যে এইরূপে ব্যক্ত করেছেন :

'ন খলু দর্পণাদেঃ স্বাধারাৎ মুখাদেঃ পৃথক স্বাতন্ত্র্যেণ প্রতিভাসো ভবতীতি ভাবঃ, তেন নিখিলমিদং জগৎ সংবিত্ত্যাত্মনঃ পরমেশ্বরস্যৈব একস্য রূপমিতি পিণ্ডার্থঃ।' —তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৪৪ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

মুখপ্রতিবিম্বের আপন আধার দর্পণ থেকে স্বতন্ত্র প্রতিভাস দেখা যায় না। এইরূপে সংবিৎস্বরূপ পরমেশ্বরে প্রতিবিম্বিত বিশ্বের সেই সংবিৎস্বরূপ পরমেশ্বরই একমাত্র রূপ।

এখন প্রশ্ন দাঁড়ায় এই : যদি বিশ্ব সংবিৎ ছাড়া আর কিছুই না হয়, অর্থাৎ সংবিৎরূপই হয়, তাহ'লে সংবিদের কোন ধর্ম্ম বিশ্বে আরোপিত হবে কি না?

এই প্রশ্নের উত্তরে তন্ত্রাচার্য্য অভিনবগুপ্ত বলছেন :

'যথা চ গন্ধরূপস্পৃগ্‌রসাদ্যাঃ প্রতিবিম্বিতাঃ।
তদাধারোপরাগেণ ভান্তি খড়্গে মুখাদিবৎ॥ ৪৫
তথা বিশ্বমিদং বোধে প্রতিবিম্বিতমাশ্রয়েৎ।
প্রকাশত্বস্বতন্ত্রত্ব-প্রভৃতিং ধর্ম্মবিস্তরম্॥' ৪৬

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৪৬ শ্লোক

গন্ধ, রূপ, স্পর্শ, রস প্রভৃতি যে যে আধারে প্রতিবিম্বিত হয়, তাদের প্রতিবিম্ব সেই সেই আধারে উপাধিবৈশিষ্ট্যসহই অবভাসিত হয়। যেমন ঊর্দ্ধদেশে অবস্থাপিত খড়্গে মুখপ্রতিবিম্ব ঊর্দ্ধদেশে অবস্থিত বলেই প্রতিভাত হয় কিংবা বড় বা ছোট দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখ বড় বা ছোট মনে হয়। এই নিয়ম অনুযায়ী সংবিত্তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত বিশ্ব সেই সংবিত্তত্ত্বের প্রকাশমানত্ব, স্বতন্ত্রত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মসমূহকে অবভাসিত করবেই।

যেহেতু বিশ্ব সংবিত্তত্ত্ব ছাড়া আর কিছুই নয়, সেহেতু বিশ্ব আমাদের সংবিৎলগ্ন হিসাবেই বোঝা যায়। বিশ্ব আপনা-আপনিই আমাদের জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, এইখানেই বিশ্বের স্বাতন্ত্র্য। অবশ্য এই স্বাতন্ত্র্য প্রাতিভাসিক, পারমার্থিক নয়।[১]

১। 'প্রকাশাদনতিরিক্তত্ব এব হি বিশ্বস্য প্রকাশমানত্বং স্যাৎ অন্যথা হি প্রকাশমানত্বা-যোগাৎ ন কিঞ্চিদপি স্ফুরেৎ, অতএব চ স্বয়ং প্রকাশমানত্বাদস্য স্বাতন্ত্র্যং, প্রকাশাদতিরিক্তত্বে হি জড়স্য নীলসুখাদ্যাত্মনো বিশ্বস্য স্বয়মপ্রকাশরূপত্বাৎ স্বাত্মনা ন প্রকাশঃ অপি তু পরেণ ইতি

সংবিত্তত্ত্বে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দাত্মক নিখিল বিশ্বই প্রতিবিম্বিত হয়। এইজন্য সংবিত্তত্ত্ব সব দিক দিয়েই স্বচ্ছ, দর্পণের মতো আংশিকভাবে স্বচ্ছ নয়। সব বস্তু সর্ব্বাংশে স্বচ্ছ নয়। যেমন দর্পণ রূপের দিক দিয়ে স্বচ্ছ কিন্তু স্পর্শের দিক দিয়ে স্বচ্ছ নয়, আবার ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শস্বচ্ছ হ'লেও তাতে স্বচ্ছ রূপের অভাব। সব বস্তুই যদি সব দিক দিয়ে স্বচ্ছ হ'ত, তাহ'লে দর্পণে রূপ ছাড়া স্পর্শও প্রতিবিম্বিত হ'ত ও ত্বগিন্দ্রিয়ে স্পর্শ ছাড়াও রূপের প্রতিবিম্ব পড়তো। সুতরাং সংবিত্তত্ত্বে যখন রূপাদি সমস্ত কিছুই প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, তখন সংবিত্তত্ত্ব যে সর্ব্বাংশেই স্বচ্ছ তাতে কোন সন্দেহের অবকাশই নাই।[১]

সংবিত্তত্ত্ব সব দিকে স্বচ্ছ বললে, তাতে প্রতিবিম্বিত বিশ্ব কিভাবে তার থেকে অতিরিক্ত রূপে প্রতীত হচ্ছে? এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে জাগে। দর্পণ সব দিকে স্বচ্ছ নয়, তার পুরোভাগ স্বচ্ছ, কিন্তু পশ্চাৎ ভাগ অস্বচ্ছ। এই কারণে দর্পণের স্বচ্ছ পুরোভাগে প্রতিবিম্বিত মুখ দর্পণের অস্বচ্ছ পশ্চাৎ ভাগ থেকে পৃথক রূপে প্রতীয়মান হয়। কিন্তু কাচ সর্ব্বাংশে স্বচ্ছ, তার দ্বারা চোখের দৃষ্টি বাধা পায় না। এই কারণে সর্ব্বস্বচ্ছ কাচে যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তা কোন পৃথক রূপে প্রতীতিগম্য হয় না। যদি দর্পণের মতো কাচের কোন অস্বচ্ছ অংশ থাকত, তাহ'লে সেই অস্বচ্ছ অংশ থেকে পৃথক রূপে প্রতিবিম্বের প্রতীতি সম্ভবপর হত। অতএব যে সংবিত্তত্ত্ব সর্ব্বাংশেই স্বচ্ছতম, যাতে স্বল্পমাত্রও

পেক্ষায়াং পারতন্ত্র্যং ভবেৎ ইতি ভাবঃ, অতএব চ সর্ব্বমেবেদং বেদ্যজাতং প্রকাশাত্মনঃ পরমেশ্বরস্য শরীরীভূতম্'—ইতি প্রকাশাত্মকত্বাৎ বিশ্বাত্মৈব, তদুক্তম্,

'প্রদেশোঽপি ব্রহ্মণঃ সার্ব্বরূপ্যমনতিক্রান্তশ্চাবিকল্প্যশ্চ ইতি।' তথা

'একৈকস্যাপি তত্ত্বস্য ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বরূপতা।' ইতি চ ॥ ৪৫ ॥ ৪৬

—তন্ত্রালোক: তৃতীয় আহ্নিক,—৪৫-৪৬ শ্লোকদ্বয়ের জয়রথভাষ্যের অংশ

১। 'নৈর্ম্মল্যং মুখ্যমেকস্য সংবিন্নাথস্য সর্ব্বতঃ।
অংশাংশিকাতঃ ক্বাপ্যন্যদ্বিমলং তত্তদিচ্ছয়া ॥' ৯

—তন্ত্রালোক: তৃতীয় আহ্নিক—৯ শ্লোক

'যথা চ সর্ব্বতঃ স্বচ্ছে স্ফটিকে সর্ব্বতো ভবেৎ।
প্রতিবিম্বং তথা বোধে সর্ব্বতঃ স্বচ্ছতাজুষি ॥' ৪৭ —ঐ ৪৭ শ্লোক

'অত্যন্তস্বচ্ছতা সা যৎ স্বাত্ম্যনবভাসনম্।
অতঃ স্বচ্ছতমো বোধো ন রূপং স্বাকৃতিগ্রহাৎ ॥' ৪৮ —ঐ ৪৮ শ্লোক

অস্বচ্ছ অংশের অস্তিত্বের প্রশ্নই উঠে না, যার আপন আকৃতি পর্য্যন্ত অবভাসি হয় না, সেই সংবিত্তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত বিশ্ব কিরূপে সংবিত্তত্ত্ব থেকে পৃথক রূে প্রতীত হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে তন্ত্রাচার্য্য অভিনবগুপ্ত মন্তব্য করছেন:

'এতচ্চ দেবদেবেন দর্শিতং বোধবৃদ্ধয়ে।
মূঢানাং বস্তু ভবতি ততোঽপ্যন্যত্র নাপ্যলম্॥ ২১
প্রতীঘাতি স্বতন্ত্রং নো ন স্থায্যস্থায়ি চাপি ন।
স্বচ্ছস্যৈবৈষ কস্যাপি মহিমেতি কৃপালুনা॥' ২২

—তন্ত্রালোক: ৩য় আহ্নিক—২১-২২ শ্লো

অজ্ঞানান্ধদের প্রতীতির জন্য এই প্রতিবিম্ব-বিশ্ব মহাদেব অবভাসিত করেছেন অজ্ঞানী ব্যক্তিগণ এই প্রতিবিম্ব-বিশ্বকে বস্তু বলে মনে করে থাকে। উৎপাদি বস্তুর নিয়ম হ'ল যে, বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করা যায়। কি প্রতিবিম্ব-বিশ্ব সংবিত্তত্ত্ব ছাড়া অন্যত্র স্ফুরিত হতে পারে না। তাছাড়া, যা ব তাতে রূপ, স্পর্শাদি সবই বিদ্যমান। কিন্তু দর্পণস্থ প্রতিবিম্বে স্পর্শাদি ব্যতিরেে কেবল রূপই অবভাসিত হয়। সুতরাং যে-কোন প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রেই স বস্তুলক্ষণগুলি মেলে না। এই কারণে প্রতিবিম্ব-বিশ্ব ও বস্তুর সর্ব্বলক্ষণান্বিত নয় বাহ্য পদার্থ প্রত্যঘাতি অর্থাৎ একটি বাহ্য পদার্থ অপর একটি বাহ্য পদার্থে অবয়বে প্রবিষ্ট হতে পারে না। কিন্তু প্রতিবিম্ব বিম্বনাধারে সংক্রামিত হয় এই দিক থেকেও প্রতিবিম্ব-বিশ্বের বস্তুবৈলক্ষণ্য বোঝা যায়। তাছাড়া, ব কারণজাত হ'লেও উৎপাদনের পর কারণ থেকে স্বতন্ত্রভাবেই বিদ্যমান থাকে যেমন উৎপত্তির পর ঘটের সত্তা দণ্ডচক্রাদির সত্তার উপর কোন অংশে আর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু প্রতিবিম্ব বিম্বনাধার থেকে স্বতন্ত্রভাবে অবভাসি হতে পারে না। যেমন দর্পণকে বাদ দিয়ে দর্পণস্থ মুখপ্রতিবিম্বের অস্তি সম্ভব নয়। সুতরাং সংবিত্তত্ত্বকে বাদ দিয়ে বিশ্ব-প্রতিবিম্বের কোন সত্তা নাই। অধিকন্তু উৎপাদিত বস্তু যদি দীর্ঘকাল যাবৎ বিদ্যমান থাকে তাহ সে স্থায়ী এই সংজ্ঞা, আর যদি অল্পকাল যাবৎ বিদ্যমান থাকে তাহ'লে অস্থা এই সংজ্ঞা পেয়ে থাকে। প্রতিবিম্বের যেহেতু উৎপত্তি নাই, সেহে দীর্ঘকালব্যাপী বা অল্পকালব্যাপী অস্তিত্বের কোন কথাই উঠে না। অতএ

প্রতিবিম্ব স্থায়ীও নয়, অস্থায়ীও নয়। এই সব কারণে প্রতিবিম্ব-বিশ্বের বস্তুবৈলক্ষণ্য প্রস্ফুট।

প্রতিবিম্ব-বিশ্ব শশবিষাণবৎ অবস্তু। তার অবভাস হওয়া অনুচিত। অথচ হচ্ছে। এইই হ'ল পরমশিবের মহিমা।

দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব যেমন দর্পণ থেকে অতিরিক্ত না হ'লেও দর্পণ থেকে অতিরিক্ত বলে অবভাসিত হয়, সংবিত্তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত বিশ্বও তেমনি সংবিত্তত্ত্ব থেকে অতিরিক্ত না হলেও সংবিত্তত্ত্ব থেকে অতিরিক্ত বলে প্রতীত হয়।[১]

এই কারণেই জগৎ-প্রপঞ্চের স্বরূপ বোঝানোর জন্য তন্ত্রাচার্য্যগণ দর্পণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করেছেন :

'ন দেশো নো রূপং ন চ সময়যোগো ন পরিমা
ন চান্যোন্যাসংগো ন চ তদপহানির্ন ঘনতা।
ন চাবস্তুত্বং স্যান্ন চ কিমপি সারং নিজমিতি
ধ্রুবং মোহং শাম্যেদিতি নিরদিশদ্দর্পণবিধিঃ ॥' ২৩

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—২৩ শ্লোক

যেহেতু দর্পণ থেকে প্রতিবিম্ব কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, সেহেতু দর্পণের দেশ ছাড়া প্রতিবিম্বের কোন আলাদা দেশ নাই, আর এই আলাদা দেশ না থাকার জন্য প্রতিবিম্বের কোন কঠিন মূর্ত্তি নাই। মূর্ত্তির অভাববশতঃ প্রতিবিম্বের রূপ এই গুণ থাকাও সম্ভব নয়। যে বস্তুর অস্তিত্ব তার উৎপাদক বস্তুর অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল হয়, সেই বস্তুরই পূর্ব্বাপরকাল সম্বন্ধ বা পরিমাণ থাকে। যেহেতু প্রতিবিম্বের অস্তিত্ব দর্পণের অস্তিত্বের উপর একান্তভাবেই নির্ভর করে, সেহেতু প্রতিবিম্বের কোন কালযোগ বা পরিমাণ নাই। দর্পণের মধ্যে বহু পদার্থের যুগপৎ প্রতিবিম্বের ক্ষেত্রে কোন পদার্থটিই অন্য পদার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয় না। এরূপ স্থলে প্রত্যেকটি পদার্থই আলাদা আলাদাভাবে প্রতিবিম্বিত হয়ে থাকে। দর্পণস্থ প্রত্যেক প্রতিবিম্বেরই একএকটি বিম্ব

১। 'তেন ভগবতা যথা দর্পণাদৌ আভাসমাত্রসারা এব ভাবা অবভাসন্তে তথা সংবিত্তাবপীতি ন বহীরূপত্বেনৈষাং সত্ত্বমস্তীতি বোধং বর্দ্ধয়িতুং বাহ্যার্থাভিনিবেশিনামেত-দুপদিষ্টম্, অতঃ সর্ব্বমেবৈতদাভাসমাত্রসারমেবেতি, ন বাহ্যেহর্থেঽভিনিবেষ্টব্যং যেন দ্বৈতমোহঃ শাম্যেৎ ॥' —তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—২১।২২ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

আছে, সুতরাং কোন প্রতিবিম্বকেই অবস্তু বলা যায় না। তবে প্রতিবিম্ব যেহেতু আভাস ছাড়া আর কিছুই নয়, সেহেতু প্রতিবিম্বের সার কিছুই নাই। তন্ত্রাচার্য্যগণ যাতে বিকল্পাত্মক দ্বৈতজ্ঞান শান্ত ও মোহ নিবৃত্ত হয়, সেইজন্যই দর্পণের দৃষ্টান্ত উপদেশ দিয়েছেন।[১]

দর্পণ দৃষ্টান্তে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত আচার্য্য জয়রথ তাঁর ভাষ্যে সুস্পষ্ট করেছেন :

'এবং চ সতি অয়মর্থঃ প্রদর্শিতো ভবতি—যৎ বিশ্বমিদং সংবিদি দর্পণ-প্রতিবিম্বন্যায়েন অবস্থিতং ন তু তদতিরিক্ততয়া বহীরূপত্বেন বস্তুসদিতি ন তত্রাভিনিবেষ্টব্যমিতি ॥'

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—২৩ শ্লোকের জয়রথভাষ্যাংশ

এই কারণে এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হচ্ছে—প্রতিবিম্ব দর্পণে যেভাবে অবস্থিত থাকে, বিশ্বও সেভাবে সংবিত্তত্ত্বে অবস্থিত রয়েছে। বিশ্ব সংবিত্তত্ত্বের

১। 'প্রতিবিম্বং তাবদ্দর্পণাতিরেকেণ স্বতন্ত্রতয়া পৃথক সত্তাং নোপলভত ইত্যুপপাদিতম্. ততশ্চ নাস্ত্যস্য দর্পণাৎ পৃথগ্‌দেশ ইত্যুক্তং ন দেশ ইতি, এবং চাস্য ন ঘনতা, কাঠিন্যলক্ষণা মূর্ত্তিরপি নাস্তীত্যর্থঃ. অন্যথা হি দর্পণাদস্য পৃথগ্‌দেশঃ স্যাৎ—একস্যৈব নভোদেশস্য মূর্ত্তেন দর্পণেনাক্রান্তস্য মূর্ত্যন্তরেণাক্রমিতুমশক্যত্বাৎ মূর্ত্তানাং সমানদেশত্ববিরোধাৎ, অতএব চাস্য নো রূপং—রূপাখ্যগুণযোগো নাস্তি ইত্যর্থঃ স হি মূর্ত্ত এব ভবতীতি ভাবঃ, অতএব চাস্য ন কালেন সম্বন্ধঃ, স হি কঞ্চিৎ পূর্ব্বাপরভাবিনমপেক্ষ্য পৃথগ্‌লব্ধসত্তাকস্য স্যাৎ, অস্য পুনর্দর্পণাৎ পৃথক্‌সত্তৈব নাস্তীত্যুক্তং বহুশঃ, অতএব চাস্য ন পরিমা পরিমাণং নাস্তি সতএব তদ্যোগোপ-লব্ধেঃ, অন্যথা হি পরিমিতে দর্পণদেশে মহাকারং পর্ব্বতাদি কথং প্রতিসংক্রান্তং ভবেৎ, নাপি দর্পণান্তরনেকেষামর্থানাং সহপ্রতিভাসেঽপি পরস্পরং নৈবিড়্যেন সংশ্লেষ ইত্যাহ ন চান্যোন্যাসংগ ইতি। ননু নগরপ্রতিভাসাদৌ যদি অনেকেষাং ভিন্নদেশানামর্থানামেকস্মিন্নেব পরিমিতে দর্পণদেশে প্রতিভাসঃ তদেতেষামেকদেশত্বান্যথানুপপত্ত্যা পরস্পরং সংমেলনেনৈক-পিণ্ডীভাবেনৈবাসৌ স্যাদ্যঃ, ন চেদেবং তর্হি তত্র নগরপ্রতিভাস এব ন ভবেদিত্যাহ ন চ তদপহানিরিতি সর্ব্বেষামেবার্থানাং পরস্পরং বৈবিক্ত্যেনৈব প্রতিভাসনাৎ, ন চ ভাতমভাতং ভবতীত্যুক্তং বহুশঃ, অতএব চ নাস্য অবস্তুত্বমিত্যাহ ন চাবস্তুত্বং স্যাৎ ইতি সর্ব্বেষামেবার্থানাং প্রতিভাসাৎ, এবমপ্যস্য বস্তুত্বোপপাদকমন্যমপি নিজং তথ্যং রূপং নাস্তীত্যাহ ন চ কিমপি সারং নিজমিতি ইত্যেবমাভাসমাত্রসারং প্রতিবিম্বসতত্ত্বং বাহ্যার্থবাদিনো নিশ্চিতমেব দ্বৈতপ্রথাত্মকং সংকুচিতং জ্ঞানং শাম্যতামিত্যেতদর্থং দর্পণবিধিঃ—কুড্যাদিবৈলক্ষণ্যেন প্রতিবিম্বসহিষ্ণুবস্তুপ্রকারো, নিরদিশৎ নির্দিষ্টবান্।'

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—২৩ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

অতিরিক্ত কোন পদার্থ নয়। এই কারণে তার বাহ্যরূপেরও কোন পারমার্থিক সত্তা নাই। অতএব বিশ্ব-প্রপঞ্চের এই বাহ্যরূপে মনোনিবেশ করাও উচিত নয়।

সুতরাং পারমেশ্বরী সংবিদে উদ্ভূত প্রতিবিম্বকেই আমরা বিশ্ব বলে মনে করছি।[১]

বিম্বের লক্ষণ প্রসঙ্গে তন্ত্রাচার্য্য অভিনবগুপ্ত মন্তব্য করেছেন :

বিম্ব লক্ষণ

'……………বিম্বং কিল কিমুচ্যতে।
অন্যামিশ্রং স্বতন্ত্রং সদ্‌ভাসমানং মুখং যথা॥' ৫৩

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—৫৩ শ্লোক

বিম্ব কাকে বলে? যা অন্যের সঙ্গে মিশ্রিত নয় অর্থাৎ যা সজাতীয় বিজাতীয় ব্যাবৃত্ত। যা সজাতীয় বা বিজাতীয় পদার্থান্তরের সঙ্গে মিশ্রিত নয়, তা বিম্বের অন্যতম লক্ষণান্বিত। যা পরতন্ত্র নয় অর্থাৎ যার অস্তিত্ব অন্যের অস্তিত্বের উপর নির্ভরশীল নয়, তাও বিম্বলক্ষণবিশিষ্ট। তাছাড়া, যার উক্ত প্রকার স্বরূপের প্রতীতি অন্য কোন প্রকার স্বরূপের প্রতীতির দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না, তাকেও বিম্ব বলে। দর্পণস্থ মুখ প্রতিবিম্ব, কিন্তু বাস্তব মুখ বিম্ব।

সুতরাং সদৃশ বা বিসদৃশ পদার্থান্তরের সঙ্গে অমিশ্রিত, স্বয়ংসম্পূর্ণ-সত্তা-বিশিষ্ট ও একটি বিশিষ্ট রূপেই সর্ব্বদা প্রতীয়মান পদার্থই বিম্ব।

প্রতিবিম্বের লক্ষণ তন্ত্রাচার্য্য অভিনবগুপ্ত এইরূপে নির্ণীত করেছেন :

প্রতিবিম্ব লক্ষণ

'নন্বিত্থং প্রতিবিম্বস্য লক্ষণং কিং তদুচ্যতে।
অন্যব্যামিশ্রণাযোগাত্তদ্ভেদাশক্যভাসনম্॥
প্রতিবিম্বমিতি প্রাহুর্দর্পণে বদনং যথা॥' ৫৬

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—৫৬ শ্লোক

তাহলে প্রতিবিম্বের লক্ষণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হচ্ছে :

প্রতিবিম্ব তার আধারের সঙ্গে তাদাত্ম্যযুক্ত, অর্থাৎ তার আধারের সত্তা থেকে অতিরিক্ত কোন সত্তা প্রতিবিম্বের নাই, এই কারণে আধারকে বাদ দিয়ে

১। 'ইত্থমেতৎসংবিত্তিদৃঢ়স্তায়াল্লরঞ্জিতম্।
সাম্রাজ্যমেব বিশ্বে প্রতিবিম্বস্য জৃম্ভতে॥'

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—৫১ শ্লোক

প্রতিবিম্বের কোন পৃথক অবভাস দেখা যায় না। যেমন দর্পণস্থ প্রতিবিম্ব দর্পণ ছাড়া অতিরিক্ত কিছুই নয় এবং দর্পণকে বাদ দিয়ে তার কোন পৃথক অবভাসও সম্ভব নয়। সুতরাং প্রতিবিম্ব পরতন্ত্র এবং এই বিষয়েই বিম্ব থেকে তার পার্থক্য, যেহেতু বিম্ব স্বতন্ত্র।

প্রতিবিম্ব যে আধারে পড়ে, তার প্রতিবিম্বাত্মতার লক্ষণ প্রজ্ঞালঙ্কার-কারিকায় পরিস্ফুট হয়েছে :

প্রতিবিম্বাধার

'নিজধর্ম্মাপ্রহাণেন পররূপানুকারিতা।
প্রতিবিম্বাত্মতা সোক্তা খড়্গাদর্শতলাদিবৎ।'

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিকের ৫৪ শ্লোকের জয়রথভাষ্যে উদ্ধৃত

প্রতিবিম্বাধারের নিজধর্ম্ম পরিত্যাগ না করে বিম্বরূপের যে অনুকরণ করা তাই হলো প্রতিবিম্বাত্মতা। যেমন খড়্গ বা দর্পণ তাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম তনুত্ব ইত্যাদি ত্যাগ না করেই মুখের রূপ অনুকরণ করে থাকে। প্রতিবিম্ব বিম্বের রূপ পরিগ্রহ করে না, তার রূপের সাদৃশ্য অর্জন করে মাত্র।[১]

যেহেতু বিশ্ব পারমেশ্বরী সংবিৎ থেকে অতিরিক্ত কোন পদার্থই নয় এবং এই সংবিত্তত্ত্বকে বাদ দিয়ে বিশ্বের কোন পৃথক অবভাসই সম্ভব নয়, সেহেতু উপরি-উক্ত লক্ষণ অনুযায়ী বিশ্ব প্রতিবিম্ব ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।[২]

১। 'স্বরূপানপহানেন পররূপসদৃক্ষতাম্।
প্রতিবিম্বাত্মতামাহুঃ খড়্গাদর্শতলাদিবৎ॥ ৫৪'

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—৫৪ শ্লোক

'ইহ দর্পণাদেস্তনুত্বপরিমণ্ডলত্বাদ্যাত্মনঃ স্বস্যাসাধারণস্য রূপস্যাপরিত্যাগেঽপি পরস্য মুখাদেঃ সংবন্ধিনা রূপেণ যৎ সাদৃশ্যং তদেব প্রতিবিম্বাত্মত্বং ন তু তদ্রূপতাসাদনমেব ইতি সর্ব্ব এব বাদিন আহুঃ, নাত্র কস্যাপি বিপ্রতিপত্তিরিতি ভাবঃ। তাদ্রূপ্যে হি শ্লক্ষ্ণৈকবপুষোঽপি দর্পণস্য নিম্নোন্নতমুখপ্রতিবিম্বপরিগ্রহে শ্লক্ষ্ণস্বাভাবো ভবেৎ—নগরাদিপ্রতিবিম্বযোগেঽপি অনেকরূপ-পরিগ্রহাৎ দর্পণস্য অনৈক্যং স্যাৎ, তেন যথা চিত্রজ্ঞানস্য অনেকবেদনেঽপি চিত্রপতঙ্গাদৌ একস্থানপায়াৎ অনেকসদৃশাকারত্বয়া একত্বমেব নানেকত্বম্, এবং দর্পণাদেরপি অনেক-প্রতিবিম্বযোগে ন অনেকরূপত্বমিতি নানৈক্যপ্রসঙ্গঃ অপি তু তৎসাদৃশ্যমাত্রমেব, ন চ সাদৃশ্যমাত্রাদেব তাদ্রূপ্যং, ন হি গবয়সাদৃশ্যাদেব গৌগর্ব্বরঃ তস্মাৎ বিম্বসদৃশাকারত্বমেব প্রতিবিম্বধারিত্বমিতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥' ৫৪ —তন্ত্রালোক : উক্ত শ্লোকের জয়রথভাষ্য

২। 'বোধমিশ্রমিদং বোধাৎ ভেদেনাশক্যভাসনম্।
পরতত্ত্বাদিবোধে কিং প্রতিবিম্বং ন ভণ্যতে॥' ৫৭

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—৫৭ শ্লোক

এখন এই প্রশ্ন জাগে : প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, বিম্ব না থাকলে প্রতিবিম্বের উদ্ভব হতে পারে না ; যেমন দর্পণের সামনে যদি মুখ না থাকে, তাহ'লে দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়তে পারে না। পারমেশ্বরী সংবিদে বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হওয়ার ক্ষেত্রে বিম্ব কিছুই নাই। সুতরাং কিভাবে বিশ্বের প্রতিবিম্বন সম্ভব হচ্ছে ? কারণাভাবে কার্য্যোৎপত্তি কি করে হয় ?

এই প্রশ্নের উত্তর হ'ল : কারণ তিন প্রকার—নিমিত্তকারণ, উপাদানকারণ ও সহকারিকারণ। মৃত্তিকা থেকে যখন ঘট নির্ম্মিত হয়, তখন কুম্ভকার হ'ল ঘটের নিমিত্তকারণ, মৃত্তিকা উপাদানকারণ ও দণ্ডচক্রাদি সহকারিকারণ। বিম্ব-প্রতিবিম্ব স্থলে বিম্ব নিমিত্তকারণ হতে পারে না, কারণ বিম্ব অচেতন ; আর কোন অচেতন পদার্থের পক্ষেই নিমিত্তকারণ হওয়া সম্ভব নয়। বিম্ব উপাদানকারণও নয়, কারণ বিম্ব রূপ-বিকৃতি লাভ করে প্রতিবিম্ব হয় না, যেমন মৃত্তিকা রূপ-বিকৃতির মাধ্যমে ঘট এই সংজ্ঞা পেয়ে থাকে। বিম্ব নিমিত্তকারণও নয়, উপাদানকারণও নয়, বিম্ব হ'ল সহকারিকারণ। যেমন দণ্ডচক্রাদির সহকারিতায় ঘট নির্ম্মিত হয়, তেমনি বিম্বের সাহায্যে প্রতিবিম্ব আভাসিত হয়ে থাকে।

এখন বিচার্য্য হ'ল এই : কার্য্যোৎপত্তিতে উপাদানকারণ যেমন অপরিহার্য্য, সহকারিকারণ তেমন অপরিহার্য্য কি না ? এখানে আচার্য্য জয়রথের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

'ইহ খলু দণ্ডপরিহারেণাপি স্বকরাহত্যৈব চক্রং ভ্রাময়ন্ কুম্ভকারঃ কুম্ভং কুর্য্যাৎ, মৃৎপরিহারেণ পুনরতিনিপুণোঽপি কুম্ভকারঃ কুম্ভং কর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ, অতশ্চোপাদানকারণবৎ নাবশ্যং নিমিত্তকারণোপযোগঃ।'

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—৬১ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

দণ্ড ব্যতীত আপন হস্তসঞ্চালন দ্বারাই কুম্ভকার চক্র ঘূর্ণিত করে কুম্ভ উৎপাদন করতে পারে। কিন্তু মৃত্তিকার অভাবে অতি দক্ষ কুম্ভকারও কুম্ভ নির্ম্মিত

'তত্তদ্রূপতয়া জ্ঞানং বহিরন্তঃ প্রকাশতে।
জ্ঞানাদৃতে নার্থসত্তা জ্ঞানরূপং ততো জগৎ॥
নহি জ্ঞানাদৃতে ভাবাঃ কেনচিৎ বিষয়ীকৃতাঃ।
জ্ঞানং তদাত্মতাং প্রাপ্তমেতস্মাদবসীয়তে॥' —ঐ জয়রথভাষ্যে উদ্ধৃত শ্লোক

করতে পারে না। সুতরাং কার্য্যোৎপত্তিতে উপাদানকারণ যেমন অপরিহার্য্য, সহকারিকারণ সে রকম নয়।[১]

অতএব বিম্ব-প্রতিবিম্ব ক্ষেত্রে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হ'ল :

'তেন বিম্বং বিনাপি প্রতিবিম্বং ভবেৎ—তদুৎপাদনসমর্থস্য তৎপ্রতিনিধিভূতস্য কারণান্তরস্যাপি ভাবাৎ ॥' ৬১

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৬১ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

উপরি-উক্ত কারণবশতঃ বিম্ব ব্যতীতই প্রতিবিম্ব সম্ভব। কখন? যখন প্রতিবিম্বসৃষ্টিসক্ষম বিম্বস্থানীয় অন্য কোন কারণ বিদ্যমান থাকে।

উদাহরণ হিসাবে বলতে পারা যায় যে, প্রোষিতভর্তৃকা রমণী ভর্তৃ-বিষয়ক তীব্র চিন্তার ফলে পুরোবর্ত্তী আলোকে ভর্ত্তাকে সম্মুখে বর্ত্তমান দেখতে পায়। এখানে স্বচ্ছ আলোকে প্রোষিতভর্তৃকার ভর্ত্তার আকৃতি প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। ভর্ত্তা যখন প্রবাসী তখন বিম্ব প্রতিবিম্বের স্রষ্টা, তা বলা যায় না। এখানে প্রোষিতভর্তৃকার ভর্তৃ-বিষয়ক তীব্র চিন্তাই বিম্বের কাজ করে সম্মুখস্থ আলোকে ভর্ত্তার আকৃতি প্রতিবিম্বিত করছে।

উপরি-উক্ত দৃষ্টান্তে ভর্তৃস্মরণই যেরূপ ভর্ত্তার উপস্থিতির কাজ করছে, সেরূপ নিশ্চয়ই কোন কারণ থাকবে, যার ফলে পারমার্থিকসত্তারহিত বাহ্য বস্তুর অভাবেও পারমেশ্বরী সংবিদে বিশ্ব প্রতিবিম্বের অবভাস সম্ভব হচ্ছে।

এক্ষেত্রে তন্ত্রাচার্য্য অভিনবগুপ্তের মন্তব্য :

'অতো নিমিত্তং দেবস্য শক্তয়ঃ সন্তু তাদৃশে।'

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৬৪ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোক

পারমেশ্বর সংবিত্তত্ত্বের বিশ্ব প্রতিবিম্বনে জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলিই নিমিত্ত, অর্থাৎ বিম্বপ্রতিনিধিভূত সহকারিকারণ। এই জ্ঞানশক্তি,

১। আচার্য্য জয়রথ তাঁর ভাষ্যে সহকারিকারণ অর্থে নিমিত্তকারণ এই শব্দের প্রয়োগ করেছেন। প্রমাণ হ'ল তাঁর নিজেরই উক্তি : 'হেতুশ্চদ্বিবিধঃ—উপাদানং নিমিত্তং চ, উপাদানং যথা ঘটাদৌ মৃদাদি, নিমিত্তং যথা তত্রৈব দণ্ডাদি, প্রতিবিম্বস্য চ বিম্বং নোপাদানকারণং, তৎ হি ঘট ইব মৃৎস্বরূপবিকারমাসাদ্য কার্য্যানুগামিত্বেন বর্ত্ততে, নৈবমত্র বিম্বং—প্রতিবিম্বোদয়েঽপি তস্যাবিকৃতস্যৈব পৃথগুপলম্ভাৎ, তেনাত্র দণ্ড ইব ঘটে নিমিত্তকারণং বিম্বম্ ॥' ৬০

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৬০ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

ক্রিয়াশক্তি প্রভৃতি শক্তিগুলি স্বাতন্ত্র্যশক্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। স্বাতন্ত্র্য শক্তির স্বরূপ ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে।[১]

এখন প্রশ্ন এই : সবই যদি সংবিৎ তাহ'লে আমি ঘট জানছি, আমি পট জানছি ইত্যাদি জ্ঞানে যে গ্রাহ্যগ্রাহকভাব ফুটে উঠছে, তা কি করে সম্ভব হয়? সবই যদি সংবিৎ, তাহ'লে কে কার গ্রাহ্য বা কে কার গ্রাহক?

এক্ষেত্রে আচার্য্য জয়রথের মন্তব্য সুপরিস্ফুট :

'সৈব পুনঃ স্বস্বাতন্ত্র্যাৎ স্বং রূপং গোপয়িত্বা যদা সঙ্কুচিতজ্ঞানাত্মতামব ভাসয়তি তদায়ং সকলো গ্রাহ্যগ্রাহকাত্মা ভেদব্যবহারঃ'

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—৬৪ শ্লোকের ভূমিকায় জয়রথভাষ্য

সেই পারমেশ্বরী সংবিৎ যখন স্বাতন্ত্র্যশক্তির বলে আপন রূপকে গোপন করে আপনাকে অপূর্ণজ্ঞানযুক্ত খণ্ডপ্রমাতার আকারে অবভাসিত করে, তখনই এই সকল ব্যবহারিক গ্রাহ্য-গ্রাহকের ভেদ উদ্ভূত হয়।[২]

১। 'তত্র স্বর্পকাদ্যুপাধেস্তদাকারত্বং চিত্তত্বস্য তু নিজৈশ্বর্য্যাৎ।'

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৬৪ শ্লোকের পরবর্ত্তী শ্লোকে জয়রথভাষ্যে শ্রীপ্রত্যভিজ্ঞাবচন

'নাথ ত্বয়া বিনা বিশ্বং স্বচ্ছে স্বাত্মনি দর্শিতম্।

প্রসেনা দর্পণেনৈব প্রভাবাৎ ভাবমণ্ডলম্॥' —ঐ অনুপ্রত্যভিজ্ঞাবচন

'অন্তর্বিভাতি সকলং জগদাত্মনীহ

যদ্বদ্বিচিত্ররচনা মকুরান্তরালে।

বোধঃ পুনর্নিজবিমর্শনসারবৃত্ত্যা

বিশ্বং পরামৃশতি নো মকুরস্তথাতু॥'

—তন্ত্রালোক : ৩য় আহ্নিক—৬৫ শ্লোকের জয়রথভাষ্যে উদ্ধৃত শ্লোক

২। 'অত এবান্তরং কিঞ্চিৎ ধীসংজ্ঞং ভবতু স্ফুটম্।

যত্রাস্য বিচ্ছিদা ভানং সংকল্প-স্বপ্নদর্শনে॥' ৬৪

—তন্ত্রালোক : তৃতীয় আহ্নিক—৬৪ শ্লোক

'অতএব—পরসংবিদপেক্ষয়া বিচ্ছেদাসম্ভবাৎ হেতোঃ কিঞ্চিৎ-সঙ্কুচিত-প্রমাত্রাত্ম সুস্ফুটং নির্বিকল্পরূপং জ্ঞানসংজ্ঞমান্তরং পরসংবিৎপ্রমেয়য়োর্মধ্যবর্ত্তি ভবতু, যত্রাস্য প্রতিবিম্বস্য, বিচ্ছিদা ভেদেন, সঙ্কল্পস্বপ্নাদৌ ভানং ভবেৎ—বিরহিণো হি সঙ্কল্পাদাবপি বিম্বাভাবাৎ তীব্রতরস্মরণাদিনিমিত্তান্তরসংনিধাপিতমেব কান্তাপ্রতিবিম্বং ভায়াৎ ইতি ভাবঃ॥' ৬৪

—ঐ জয়রথভাষ্য

প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয় সম্বন্ধে এই তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অনুরূপ-বিষয়-সম্পর্কীয় বেদান্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যযুক্ত। বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহে শ্রীমৎ ভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্য মুনীশ্বর মন্তব্য করছেন :

বেদান্ত প্রতিপাদিত প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয়

'সর্ব্বগতং চিদাত্মানমাবৃত্য স্থিতা ভাবরূপাঽবিদ্যা বিবিধজগদাকারেণ বিবর্ত্ততে। তত্র শরীরমধ্যে স্থিতোঽন্তঃকরণাখ্যোঽবিদ্যাবিবর্ত্তো ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রেষিতো নেত্রাদিদ্বারা নির্গত্য যথোচিতং ঘটাদিবিষয়ান্ ব্যাপ্য তত্তদাকারো ভবতি। যথা লোকে পূর্ণতটাকস্থং উদকং সেতুগতচ্ছিদ্রান্নির্গত্য কুল্যাপ্রবাহরূপেণ কেদারান্ প্রবিশ্য চতুষ্কোণত্বেন ত্রিকোণত্বেন বর্ত্তুলত্বেন বা তত্তৎকেদারানুসারি অবতিষ্ঠতে তদ্বৎ। ন হ্যুদকবদন্তঃকরণং পরিস্পন্দতে যেনাতিদূরবর্ত্তি চন্দ্রনক্ষত্রধ্রুবাদিপ্রাপ্তি-র্ঝটিতির্ন সিধ্যেৎ। কিং তর্হি সূর্য্যরশ্মিবত্তৈজসত্বাদ্দীর্ঘপ্রভাকারেণ পরিণমতে। অতএব রশ্মিবৎ সহসা সঙ্কোচোঽপ্যুপপন্নঃ। উপপন্নশ্চান্তঃকরণস্য ক্ষীরাদিবৎ সাবয়বত্বাৎ পরিণামঃ। তচ্চ পরিণতমন্তঃকরণং দেহাভ্যন্তরে ঘটাদৌ চ সম্যগ্ ব্যাপ্য দেহঘটয়োর্মধ্যদেশেঽপি দণ্ডায়মানমবিচ্ছিন্নং ব্যবতিষ্ঠতে। তত্র তত্র দেহাবচ্ছিন্নান্তঃকরণভাগোঽহঙ্কারাখ্যঃ কর্ত্তা ইত্যুচ্যতে। দেহবিষয়মধ্যবর্ত্তির্দণ্ডায়-মানস্তদ্‌ভাগো বৃত্তিজ্ঞানাভিধা ক্রিয়া ইত্যুচ্যতে। বিষয়ব্যাপকস্তদ্‌ভাগো বিষয়স্য জ্ঞানকর্ম্মত্বসংপাদকমভিব্যক্তিযোগ্যমিত্যুচ্যতে। তস্য চ ত্রিভাগস্যান্তঃকরণ-স্যাতিস্বচ্ছত্বাৎ চৈতন্যং তত্রাভিব্যজ্যতে। তস্যাভিব্যক্তস্য চৈতন্যস্য একত্বেঽপি অভিব্যঞ্জকান্তঃকরণভাগভেদাৎ ত্রিধা ব্যপদেশো ভবতি। কর্ত্তৃভাগাবচ্ছিন্নশ্চিদংশঃ প্রমাতা, ক্রিয়াভাগাবচ্ছিন্নশ্চিদংশঃ প্রমাণং, বিষয়গতযোগ্যত্বভাগাবচ্ছিন্নঃ চিদংশঃ প্রমিতিরিতি প্রমাতৃপ্রমাণপ্রমিতীনামসাঙ্কর্য্যম্। ভাগত্রয়েঽপি অনুগতস্যৈবান্তঃ-করণাকারস্য প্রমাতৃপ্রমেয়-সম্বন্ধ-রূপত্বাৎ ময়েদমবগতমিতি বিশিষ্টব্যবহারোঽপি উপপদ্যতে। ব্যঙ্গ্যব্যঞ্জকয়োশ্চৈতন্যান্তঃকরণয়োরৈক্যাধ্যাসাৎ অন্যোন্যস্মিন্ অন্যোন্যধর্ম্মাদিব্যবহারো ন বিরুধ্যতে।'

—বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড

'চিদাত্মা সর্ব্বগত, তাহাকে আবরণ করিয়া অবস্থিত যে ভাবরূপ অবিদ্যা, তাহাই বিচিত্র জগদাকারে পরিণত হইয়া থাকে। সেই সকল পরিণামের মধ্যে শরীরের মধ্যে অবস্থিত যে অন্তঃকরণরূপ অবিদ্যাপরিণাম, তাহা ধর্ম্ম বা অধর্ম্মের

দ্বারা প্রেরিত হইয়া নেত্রাদি দ্বারা বাহিরে নির্গত হয় এবং যথাসম্ভব ঘটাদি-বিষয়কে প্রাপ্ত হইয়া, সেই সেই ঘটাদি বিষয়াকারে পরিণত হইয়া থাকে। যেমন লোকে পরিপূর্ণ জলাশয়ের মধ্যে অবস্থিত যে জল, তাহা সেতুমধ্যস্থিত ছিদ্র হইতে নির্গত হইয়া কুল্যাপ্রবাহরূপে অর্থাৎ কৃত্রিম-প্রণালী-মধ্যস্থিত স্রোতের আকার ধারণ করিয়া ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেই ক্ষেত্রের যেরূপ আকার—ত্রিকোণ, গোল বা চতুষ্কোণ, সেই আকারেই আকারিত হইয়া অবস্থিত হয়, অন্তঃকরণেরও সেই প্রকার অবস্থা হইয়া থাকে। এস্থলে বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে, জল যে প্রকার ক্ষরিত হয়, অন্তঃকরণ সে প্রকার হয় না। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সেই অন্তঃকরণের দ্বারা অতিদূরবর্ত্তী চন্দ্র, নক্ষত্র ও ধ্রুবাদির প্রাপ্তি অত শীঘ্র সম্ভবপর হইত না। কিন্তু সূর্য্যরশ্মি যে প্রকার তৈজস, অন্তঃকরণও সেই প্রকার তৈজস বলিয়া তাহা দীর্ঘপ্রভাকারে পরিণত হইয়া থাকে। সেই কারণে রশ্মির যেরূপ সঙ্কোচ হইয়া থাকে, অন্তঃকরণেরও সেই প্রকার সঙ্কোচ উপপন্ন হয়। ক্ষীরাদির ন্যায় অন্তঃকরণ যেহেতুক সাবয়ব, সেই কারণে তাহার বিচিত্র আকারে পরিণতিও সম্ভবপর হয়। এইভাবে পরিণতিযুক্ত যে অন্তঃকরণ তাহা দেহের মধ্যে এবং বাহিরের ঘটাদি বস্তুতেও সম্যক্‌ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া দেহ ও ঘটের মধ্যদেশেও দণ্ডের ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত হয়। তন্মধ্যে বিশেষ এই যে, দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট যে অন্তঃকরণভাগ, তাহাকে অহঙ্কার বলা যায় এবং তাহাই কর্ত্তা বলিয়া অভিহিত হয়। দেহ ও বিষয়ের মধ্যবর্ত্তী দণ্ডের ন্যায় অবস্থিত যে অন্তঃকরণভাগ, তাহাকেই বৃত্তিজ্ঞান বা ব্যাপাররূপ ক্রিয়া বলা যায়। ঘটাদিবিষয়ের ব্যাপার যে অন্তঃকরণভাগ, তাহাই বিষয়ে জ্ঞানকর্ম্মত্বের অর্থাৎ জ্ঞেয়ত্বের সম্পাদক হয় এবং তাহাই বিষয়ের অভিব্যক্তির অনুকূল হইয়া থাকে।

এইরূপে ভাগত্রয়ব্যবস্থিত যে অন্তঃকরণ, তাহা অতি স্বচ্ছ বলিয়া চিদাত্মা তাহাতেই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সেই অন্তঃকরণে অভিব্যক্ত চিদাত্মা এক হইলেও অভিব্যঞ্জক অন্তঃকরণ তিন ভাগে বিভক্ত বলিয়া তিন প্রকারে ব্যপদিশ্যমান হয়। তাহার মধ্যে পূর্ব্ব-কথিত কর্ত্তৃভাগের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চিদংশ, তাহাকেই প্রমাতা বলা যায়। ক্রিয়াভাগের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চিদংশ, তাহাকে প্রমাণ বলা যায়। আর বিষয়গত যোগ্যত্বরূপ যে

ভাগ, সেই ভাগের দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চিদংশ, তাহাকেই প্রমিতি (প্রমেয়) বলা যায়।

এইরূপ ব্যবস্থার দ্বারা প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমিতি (প্রমেয়) এই তিনের পরস্পর অসঙ্কীর্ণতাও সিদ্ধ হইয়া থাকে। আরও দ্রষ্টব্য এই যে, এই ভাগত্রয়ে অনুগত যে অন্তঃকরণাকার, তাহাই প্রমাতা ও প্রমেয়ের সম্বন্ধরূপতাকে পাইয়া থাকে। এইভাবে 'আমি ইহা জানিতেছি' এইরূপ যে বিশিষ্ট ব্যবহার, তাহাও উপপন্ন হইয়া থাকে। ব্যঙ্গ যে চৈতন্য, আর ব্যঞ্জক যে অন্তঃকরণ, এই দুইয়ের মধ্যে পরস্পর ঐক্যের অধ্যাস হয় বলিয়া অন্তঃকরণে চৈতন্যধর্ম্মের এবং চিদাত্মাতে অন্তঃকরণধর্ম্মের ব্যবহারও বিরুদ্ধ হয় না।'

—উক্ত অংশের মহামহোপাধ্যায় শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ-কৃত অনুবাদ

প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয়
শক্তিমান—শক্তি

প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয় সম্বন্ধীয় তান্ত্রিক সিদ্ধান্তটি তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দে এইভাবে প্রকাশিত করা হয়: প্রমাতা কর্ত্তৃক বিষয়-জ্ঞানের পরাংশ প্রমাতা শক্তিমান ছাড়া আর কিছুই নয়। পরাপরাংশ প্রমাণই শক্তি। অপরাংশ প্রমেয় শক্তিমানের স্বরূপ।[১] শক্তিমান ও শক্তির অভেদের দিক দিয়ে প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয় একক সত্তা।[২]

মীমাংসকমত

কুমারিলমতাবলম্বী মীমাংসকগণ বলে থাকেন যে, যেহেতু ক্রিয়ামাত্রই ফলের দ্বারা অনুমিত হয়ে থাকে, সেহেতু জ্ঞানরূপ ক্রিয়াও ফলের দ্বারাই অনুমিত হবে। এই জ্ঞানরূপ ক্রিয়ার ফল হ'ল বিষয়ধর্ম্ম বেদ্যতা।

১। 'তথাহি তিস্রো দেবস্য শক্তয়ো বর্ণিতাঃ পুরা ॥ ৭
তা এব মাতৃমানমেয়ত্রৈরূপ্যেণ ব্যবস্থিতাঃ।
পরাংশো মাতৃরূপোঽত্র প্রমাণাংশঃ পরাপরঃ ॥ ৮
মেয়োঽপরঃ শক্তিমাংশ্চঃ শক্তিঃ স্বং রূপমিত্যদঃ।'

—তন্ত্রালোক: দশম আহ্নিক—৮ শ্লোক ও ৭-৯ শ্লোকার্দ্ধ

২। 'ত্রিবিধং চৈতন্যং প্রমাতৃচৈতন্যং প্রমাণচৈতন্যং বিষয়চৈতন্যং চেতি। তত্র ঘটাদ্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং, বিষয়চৈতন্যম্, অন্তঃকরণবৃত্ত্যবচ্ছিন্নং চৈতন্যং প্রমাণচৈতন্যম্, অন্তঃকরণাবচ্ছিন্নং চৈতন্যং প্রমাতৃচৈতন্যম্ ॥'

—বেদান্তপরিভাষা: প্রত্যক্ষপরিচ্ছেদ

এই মত খণ্ডন করার জন্য তন্ত্রাচার্য্যগণ নিম্নরূপ যুক্তির অবতারণা করেছেন :

'বেদ্যতা চ স্বভাবেন ধর্ম্মো ভাবস্য চেৎ ততঃ।
সর্ব্বান্ প্রত্যেব বেদ্যঃ স্যাৎ ঘটনীলাদিধর্ম্মবৎ ॥' ২১

—তন্ত্রালোক : দশম আহ্নিক—২১ শ্লোক

যদি বেদ্যতা বিষয়ের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, তাহ'লে বিষয়ের সন্নিবেশ বা রূপ বা কার্য্যত্ব কারণত্ব ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য সকলেরই জ্ঞানের বিষয়ীভূত হবে, অর্থাৎ সকলেই সর্ব্বজ্ঞ হবে।

এখন যদি পূর্ব্বপক্ষ করা হয় : যেহেতু বিষয়-ধর্ম্ম বেদ্যতা প্রমাতার বুদ্ধির দ্বারা উৎপন্ন, সেহেতু যখন যে প্রমাতার বুদ্ধি বেদ্যতাকে উৎপন্ন করবে তখন সেই প্রমাতার প্রতিই বেদ্যতার উদ্ভব হবে এবং এইভাবে সকলে সর্ব্বজ্ঞ হতে পারবে না।

এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন হ'ল : তন্তুবায়ের দ্বারা উৎপাদিত বস্ত্র একমাত্র তন্তুবায়ের কাছেই বস্ত্র বলে প্রতিভাত হবে, অন্যের কাছে হবে না—এরকম তো কোন নিয়ম নাই। সুতরাং বিষয়-ধর্ম্ম বেদ্যতা যে প্রমাতার বুদ্ধির দ্বারা উৎপাদিত, একমাত্র সেই প্রমাতার কাছেই বেদ্যতার স্ফুরণ হবে, অন্যের কাছে হবে না—এ-কথা বলাও অযৌক্তিক।[১]

বেদ্যতা বিষয়-ধর্ম্ম এই মতের খণ্ডনকারী আরো যুক্তি হ'ল :

'বেদ্যতাখ্যস্তু যো ধর্ম্মঃ সোঽবেদ্যশ্চেৎ খপুষ্পবৎ।
বেদ্যশ্চেদস্তি তত্রাপি বেদ্যতেত্যনবস্থিতিঃ ॥ ২৩
ততো ন কিংচিৎ বেদ্যং স্যান্মূর্চ্ছিতং তু জগৎ ভবেৎ।'

—তন্ত্রালোক : দশম আহ্নিক—২৩ শ্লোক ও ২৪ শ্লোকার্দ্ধ

বিষয়-ধর্ম্ম এই বেদ্যতা অবেদ্য? না বেদ্য? যদি বেদ্যতা আকাশকুসুমের মতো অবেদ্য হয়, তাহ'লে সেই বেদ্যতার মূল্য কি? যে বস্তু সংবিদে আরূঢ় নয়, তা সম্পূর্ণরূপেই অসৎ। আর এই বিষয়-ধর্ম্ম বেদ্যতা যদি বেদ্য হয়, তাহ'লে এক্ষেত্রেও আর একটি বেদ্যতার পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে,

১। 'অথ বেদকসংবিত্তিবলাৎ বেদ্যত্বধর্ম্মভাক্।
ভাবস্তথাপি দোষোঽসৌ কুবিন্দকৃতবস্ত্রবৎ ॥' ২২
তন্ত্রালোক : দশম আহ্নিক—২২ শ্লোক

তারও আরো একটি বেদ্যতা, এভাবে অনবস্থাদোষ অপরিহার্য্য হয়। এই প্রকারে কোন কিছুই বেদ্য না হওয়ার জন্য সমস্ত লোকব্যবহার লোপ পেতে বসে।

এই অবস্থায় মীমাংসকগণ যদি বলেন, প্রমাতার উপাধির দ্বারা উপস্কৃত বেদ্যতাই বিষয়-ধর্ম্ম, তাহ'লে তন্ত্রাচার্য্যগণ সেই মতের এইভাবে খণ্ডন করবেন :

'এবং হি বাহ্যস্যার্থস্য তত্তন্নিয়তোপাধ্যুপস্কৃতরূপত্বাৎ জ্ঞানবৎ ভেদঃ প্রসজ্যেত, চৈত্রবেদ্যোঽন্যোঽন্যশ্চ মৈত্রবেদ্যোঽর্থ ইতি। ন হি তদেব নীলজ্ঞানং ভূত্বা পীতজ্ঞানং ভবিতুমর্হাত, ন চৈতদিষ্টং বঃ, সর্ব্বস্যার্থস্য বহিরেকত্বেনৈব সত্ত্বাভ্যুপগমাৎ॥'

—তন্ত্রালোক : দশম আহ্নিক—২৪-২৫ শ্লোকার্দ্ধ[১] দ্বয়ের জয়রথভাষ্য

প্রমাতার উপাধি দ্বারা উপস্কৃত বেদ্যতা যদি বিষয়ের ধর্ম্ম হয়, তাহলে বাহ্যবিষয়ের রূপও বিশেষ বিশেষ উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে, এই বিষয় চৈত্রের জ্ঞেয়, এই বিষয় মৈত্রের জ্ঞেয়—এইরূপে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ জ্ঞানের মতো বাহ্যবিষয়গুলিও বিশেষ বিশেষ রূপ ধারণ করে থাকে। এক্ষেত্রে, যেমন একই জ্ঞান নীলজ্ঞান হয়ে পীতজ্ঞান হতে পারে না, তেমনি একই বাহ্যবিষয় একবার চৈত্রের দ্বারা বেদ্য হয়ে আবার মৈত্রের দ্বারা বেদ্য হতে পারে না। কিন্তু প্রাত্যহিক অভিজ্ঞায় দেখা যায় যে, সকল বাহ্যবিষয়ই একই রূপে সকলেরই দ্বারা পরিজ্ঞাত হচ্ছে

তাছাড়া, প্রমাতার উপাধি দ্বারা উপস্কৃত বেদ্যতা যদি বিষয়ের ধর্ম্ম হয়, তাহ'লে এক প্রমাতার উপাধি দ্বারা উপস্কৃত বেদ্যতা বিষয়ের ধর্ম্ম ? না অনেক প্রমাতার উপাধি দ্বারা উপস্কৃত বেদ্যতা বিষয়ের ধর্ম্ম ?

যদি এক প্রমাতার উপাধি দ্বারা উপস্কৃত বেদ্যতা বিষয়ের ধর্ম্ম হয়, তাহ'লে অন্য প্রমাতার কাছে এই বেদ্যতার স্ফুরণ কি করে হবে ?

১। 'ননু বিজ্ঞাত্রুপাধ্যংশোপস্কৃতং বপুরুচ্যতাম্॥ ২৪
ভাবস্যার্থপ্রকাশাত্ম যথা জ্ঞানমিদং তৃসৎ।'
—তন্ত্রালোক : দশম আহ্নিক—২৪-২৫ শ্লোকার্দ্ধ

আর যদি অনেক প্রমাতার উপাধি দ্বারা উপস্কৃত বেদ্যতা বিষয়ের ধর্ম্ম হয়, তাহ'লে এককভাবে কোন প্রমাতার কাছেই এই বেদ্যতার স্ফূরণ হতে পারে না। ফলে সমস্ত জগৎ ব্যাপারই প্রবিলুপ্ত হবে।[১]

অতএব সিদ্ধান্ত হল :

'তস্মান্ন বেদ্যতা নাম ভাবধর্ম্মোঽস্তি কশ্চন ॥' ২৬

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—২৬ শ্লোকার্দ্ধ

উপরোক্ত যুক্তি অনুযায়ী বেদ্যতা নামক কোন পদার্থধর্ম্ম নাই।

বেদ্যতা পদার্থের ধর্ম্ম নয়, কিন্তু যখন পদার্থবোধ উদ্ভূত হচ্ছে তখনই পদার্থ বেদ্য হচ্ছে।

'ভাবস্য বেদ্যতা সৈব সংবিদো যঃ সমুদ্ভবঃ।'

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—২৭ শ্লোকার্দ্ধ

পদার্থ-বিষয়ক বোধের উৎপত্তিই সেই পদার্থের বেদ্যতা।

এখন পূর্ব্বপক্ষ হ'ল : পদার্থ-বিষয়ক বোধ প্রমাতৃনিষ্ঠ, কিন্তু বেদ্যতা পদার্থনিষ্ঠ। সুতরাং পদার্থ-বিষয়ক বোধ যখন প্রমাতায় উদ্ভূত হবে, তখন কিভাবে পদার্থে বেদ্যতারও উদ্ভব সম্ভব? ঘট উৎপন্ন হ'লে তার সঙ্গে সঙ্গে পটেও কোন বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না। তাছাড়া, বোধ হিসাবে যে-কোন পদার্থেরই বোধ একরকম, এই কারণে প্রমাতায় বিশেষ বিশেষ পদার্থের বোধ উদ্ভূত হ'লে যে সেই সেই পদার্থই বেদ্য হয়ে উঠবে—এমন নিয়মই বা কিভাবে সম্ভব?

এই প্রশ্নের সমাধান হ'ল : পদার্থ-বিষয়ক বোধ পদার্থনিষ্ঠ বেদ্যতার গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বোধ ও বেদ্যতা সব সময় একই সঙ্গে দেখা

১। 'এবং চ কিময়মেকপ্রমাতৃবেদ্যতোপরক্ত উত সর্ব্বপ্রমাতৃবেদ্যতোপরক্তঃ? তত্রৈক-প্রমাতৃবেদ্যতোপরক্তত্বেন অন্যস্য প্রমাতুঃ অসৌ অবেদ্যঃ স্যাৎ, অনেক-প্রমাতৃবেদ্যতোপরক্ত-ত্বেঽপি একৈকশ্যেন ন কস্যচিদপীতি সর্ব্বাত্মনা মূর্চ্ছিতমেব জগৎ ভবেৎ।' ২৪

—তন্ত্রালোক : দশম আহ্নিক— ২৪ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

তদাহ—

'একবিজ্ঞাতৃবেদ্যত্বে ন জ্ঞাত্রন্তরবেদ্যতা ॥ ২৫

সমস্তজ্ঞাতৃবেদ্যত্বে নৈকবিজ্ঞাতৃবেদ্যতা।'

—তন্ত্রালোক : দশম আহ্নিক—২৫-২৬ শ্লোকার্দ্ধ

যায়। সুতরাং যখন আত্মায় পদার্থনিষ্ঠ বেদ্যতার বোধ উদ্ভূত হয়, তখনই সেই বিশেষ পদার্থটি বেদ্য হলো, এ-কথা বলা হয়।

'অর্থগ্রহণরূপং হি যত্র বিজ্ঞানমাত্মনি ॥ ২৭
সমবৈতি প্রকাশ্যোঽর্থস্তং প্রত্যেবৈব বেদ্যতা।'

—তন্ত্রালোক : ১০ আহ্নিক—২৭-২৮ শ্লোকার্দ্ধ

যখন আত্মায় বিষয়গ্রহণরূপ বোধ উদ্ভূত হয়, তখনই বিষয় বেদ্য হয় সেই বোধবিশিষ্ট আত্মার কাছে।

এখানেও এরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত হতে পারে :

'অত্র ব্রূমঃ পদার্থানাং ন ধর্ম্মো যদি বেদ্যতা ॥ ২৮
অবেদ্যা এব তে সংস্যুর্জ্ঞানে সত্যপি বর্ণিতে।'

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—২৮-২৯ শ্লোকার্দ্ধ

এখানে আমরা এই কথা বলবো : বেদ্যতা যদি পদার্থের ধর্ম্ম না হয়, তাহ'লে আত্মায় পদার্থ-বিষয়ক বোধ উদ্ভূত হ'লেও পদার্থ অবেদ্যই থেকে যাবে। জ্ঞান বিষয়ের দ্বারা জাত, অতএব বিষয় প্রকাশ করুক—এ-কথাও বলা চলে না। কারণ, ধূম বহ্নির দ্বারা উৎপন্ন অথচ বহ্নির অপ্রকাশক। বরঞ্চ ধূম বহ্নির জ্ঞাপক। জ্ঞান ও বিষয়ের মধ্যে অবিনাভাব সম্বন্ধ-ও বলা চলে না, কারণ রজ্জুতে সর্পভ্রমের ক্ষেত্রে সর্প না থাকলেও সর্পজ্ঞান থাকে।[১]

যে পদার্থের ধর্ম্ম বেদ্যতা নয়, সে পদার্থ কখনই বেদ্য হতে পারে না—এ সম্বন্ধে তন্ত্রাচার্য্য অভিনবগুপ্ত দৃষ্টান্ত দিয়েছেন :

'যথাহি পৃথুবুধ্নাদিরূপে কুম্ভস্য সত্যপি ॥ ২৯
অতদাত্মা পটো নৈতি পৃথুবুধ্নাদিরূপতাম্।'

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—২৯-৩০ শ্লোকার্দ্ধ

কুম্ভ গোলাকার হ'লেও যেহেতু কাপড় কুম্ভ নয়, সেহেতু কাপড় আকারে গোল হতে পারে না।

১। 'অর্থগ্রহণরূপেঽপ্যাত্মসমবেতে জ্ঞানে সতীত্যর্থঃ। এবমপি হ্যর্থস্য ন কিঞ্চিৎ, ন হি জ্ঞানার্থয়োরেকরূপত্বমেকাধিকরণত্বং বা গ্রাহ্যগ্রাহকাত্মতয়ানয়োঃ স্বরূপভেদাৎ, জ্ঞানস্য চার্থগ্রহণাত্মকত্বেঽপি জ্ঞাতৃসমবেতত্বাৎ, যদভিপ্রায়মেব চ '— ......পরাবস্থা হি ভাসনম্।' ইত্যাদ্যন্যৈরুক্তম্। ন চাস্যাতিশয়েঽন্যস্য কিঞ্চিৎ স্যাৎ, অথার্থজন্যত্বাৎ জ্ঞানমর্থস্য প্রকাশ

অতএব তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হ'ল :

'তথা সত্যপি বিজ্ঞানে বিজ্ঞাতৃসমবায়িনি ॥ ৩০
অবেদ্যধর্ম্মকা ভাবাঃ কথং বেদত্বমাপ্নুয়ুঃ।'

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক, ৩০—৩১ শ্লোকার্দ্ধ

যমন কুম্ভের গোলত্ব কাপড় পেতে পারে না, তেমনি প্রমাতার জ্ঞান বিষয় পতে পারে না। অর্থাৎ, যেমন কুম্ভ থেকে পৃথক বলে কাপড় কুম্ভধর্ম্ম গোলত্ব ায় না, তেমনি প্রমাতৃনিষ্ঠ জ্ঞান থেকে পৃথক বলে অবেদ্যধর্ম্মক বিষয়ও বেদ্য বে না।

তাছাড়া, বেদ্যতাকে পদার্থের ধর্ম্ম না বললে আরো অসুবিধা হয়।

প্রকাশিত না হওয়াই যদি পদার্থের ধর্ম্ম হয়, তাহ'লে পদার্থ-জ্ঞানও বেদ্যই অপ্রকাশাত্মক হবে। কারণ, পদার্থ-জ্ঞানের ক্ষেত্রে এইটি পদার্থ আর ইটি জ্ঞান, এরূপ আলাদা আলাদা প্রতীতি হয় না। পদার্থ-জ্ঞানের আশ্রয় মাতা, তার মন ও চক্ষু ইত্যাদি ইন্দ্রিয়—এগুলি পরোক্ষ বলে অপ্রকাশাত্মক তা বটেই। দীপ যেমন অপরের ও নিজের প্রকাশক, প্রমাতৃনিষ্ঠ জ্ঞানও তমনি বিষয় ও নিজের প্রকাশক—এরূপ কথাও বলা চলে না। যেহেতু মরা শুধু যে বিষয়ের বেদ্যতা বিচার করতে বসেছি তা নয়, জ্ঞানের বেদ্যতা রও আমাদের লক্ষ্য। সুতরাং বেদ্যতাকে পদার্থের ধর্ম্ম স্বীকার না ালে, পদার্থ-জ্ঞানের যাবতীয় উপকরণই অবেদ্য হয়ে উঠে—সমস্ত জগৎই গভীর ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।[১]

ত চৈন্নৈতৎ, ন হি যো যজ্জন্যঃ স তস্য প্রকাশো ভবতি বহ্নেরিব ধূমঃ স পরং তদ্‌গতো লিঙ্গং ৎ। যত্ত্ববিনাভাবো নিশ্চীয়েত, ন চেহ তন্নিশ্চয়োঽস্তি বিনাপ্যর্থং ভ্রান্ত্যাদৌ তৎপ্রকশাত্মনো াস্তোদয়াৎ, অতশ্চ যুক্তমুক্তম্ 'অবেদ্যা এব পদার্থ স্যুঃ' ইতি ॥ ২৮

—তন্ত্রালোক : ২৮ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

'অনর্থঃ সুমহাংশ্চৈষ দৃশ্যতাং বস্তু যৎ স্বয়ম্ ॥ ৩১
প্রকাশাত্ম ন তৎসংবিচ্চাপ্রকাশা তদাশ্রয়ঃ।
অপ্রকাশো মনোদীপচক্ষুরাদি তথৈব তৎ ॥ ৩২
কিং তৎপ্রকাশতাং নাম সুপ্তে জগতি সর্ব্বতঃ॥'

তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক, ৩১—৩৩ শ্লোকার্দ্ধ ও ৩২ শ্লোক

এখন যদি এরূপ পূর্ব্বপক্ষ করা যায় : প্রদীপ যেমন রূপকে প্রকাশিত করে জ্ঞানও তেমনি বিষয়কে প্রকাশিত করে।

জ্ঞানের প্রদীপসাম্য পূর্ব্বপক্ষ

'জ্ঞানস্যার্থপ্রকাশত্বং নন্নু রূপং প্রদীপবৎ ॥' ৩৩[১]

'অপূর্ব্বমত্র বিদিতং নরীনৃত্যামহে ততঃ।
অর্থপ্রকাশো জ্ঞানস্য যদ্রূপং তন্নিরূপ্যতাম্ ॥ ৩৪
অর্থঃ প্রকাশশ্চেদ্রূপমর্থো বা জ্ঞানমেব বা।
অথার্থস্য প্রকাশো যস্তদ্রূপমিতি ভণ্যতে ॥' ৩৫

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—৩৩ শ্লোকার্দ্ধ ও ৩৪-৩৫ শ্লোক

যেমন প্রদীপের রূপ-প্রকাশ, তেমনি জ্ঞানের অর্থ-প্রকাশ অর্থাৎ বিষয়-উদ্ভাসন এখন প্রশ্ন হ'ল : জ্ঞানের অর্থ-প্রকাশ এই কথাটির তাৎপর্য্য কি ? অর্থ প্রকাশ শব্দটির তিন রকম তাৎপর্য্য হতে পারে :

'কিমর্থশ্চাসৌ প্রকাশশ্চেতি সামানাধিকরণ্যম্
অথার্থশ্চপ্রকাশশ্চেতি সমুচ্চয় আহোস্বিদর্থস্য প্রকাশ ইতি সংবন্ধমাত্রম্ ॥' ৩৫

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—৩৫ শ্লোকের

এটি অর্থও বটে আবার প্রকাশও বটে, এইভাবে অর্থত্ব ও প্রকাশত্বের এক ক্ষেত্রে অবস্থিতি, অথবা অর্থ এবং প্রকাশ এইরূপে অর্থ ও প্রকাশের সম্মিলন অথবা অর্থের প্রকাশ, এই আকারে অভিব্যক্ত একটি নিছক সম্বন্ধ।

জ্ঞানকে অর্থত্ব ও প্রকাশত্বের এক অধিকরণ অথবা অর্থ ও প্রকাশে সম্মিলনাত্মক হিসাবে বর্ণনা করা কখনও পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায় হতে পারে না তাই অর্থ-প্রকাশ কথাটি একটি নিছক সম্বন্ধকে বোঝাচ্ছে—এইটিই পূর্ব্বপক্ষে আসল বক্তব্য।

এক্ষেত্রে তন্ত্রাচার্য্যের সমালোচনা হ'ল :

'ষষ্ঠী কর্ত্তরি চেদুক্তো দোষ এব তুরুদ্ধরঃ।
অথ কর্ম্মণি ষষ্ঠ্যেষা ণ্যর্থস্তত্র হৃদি স্থিতঃ ॥' ৩৬

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—৩৬ শ্লোক

১। 'ইহো চৈত্রো জীবতি ইতি যথা চৈত্রস্যৈব জীবনাখ্যোঽতিশয়ো ন পরস্য তথা প্রকাশতে ইত্যর্থস্যৈব কশ্চিদতিশয়ো ন জ্ঞানস্যেত্যাশয়েনৈতদেবোপহাসপুরঃসরং সদনেকপক্ষোট্টঙ্কনক্রমেণ সমাধত্তে—অপূর্ব্বমত্র বিদিতমিত্যাদি'

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—৩৪ শ্লোকের ভূমিকা

অর্থস্য প্রকাশ—অর্থের প্রকাশ এই ক্ষেত্রে অর্থ শব্দে কর্ত্তায় ষষ্ঠী হয়েছে—যদি আমরা এই কথা বলি তাহলে প্রকাশন-ক্রিয়ার কর্তৃত্ব অর্থেরই হবে, অতএব এই প্রকাশন ক্রিয়ায় জ্ঞানের কোন ভূমিকাই থাকা সম্ভব নয়। আর যদি বলি অর্থ শব্দে কর্ম্মে ষষ্ঠী, তাহ'লে পুর্ব্বপক্ষের বক্তব্য দাঁড়ায়—জ্ঞানমর্থং প্রকাশয়তি, জ্ঞান অর্থকে প্রকাশিত করে। এস্থলে প্রকাশয়তি ণিজন্ত ক্রিয়া, অণিজন্ত অবস্থার কর্ত্তা অর্থ ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম্ম হওয়ায় প্রযোজ্য-প্রয়োজক ব্যাপার প্রতীতিগম্য হচ্ছে।

এই প্রযোজ্য-প্রয়োজক ব্যাপারের ফলে এই অবস্থা দাঁড়ায়: নিজে থেকে প্রকাশমান অর্থ জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু অর্থ যদি নিজে থেকেই প্রকাশিত হয়, তাহ'লে জ্ঞান কিভাবে তার প্রয়োজক কর্ত্তা হয়? আর যদি বলি, প্রকাশযোগ্য অর্থ জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হচ্ছে, তাহ'লেও এই অসুবিধা দেখা দেয়—কালোকে যেমন সাদা করা যায় না, তেমনি স্বয়ং অপ্রকাশমান অর্থও প্রকাশযোগ্য হলেও জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত হতে পারে না।[১]

আসল কথা হ'ল, লৌকিক জগতে ণিজন্ত ক্রিয়ার দ্বারা দুটি চেতন পদার্থের মধ্যেই প্রযোজ্য-প্রয়োজক ভাব বোঝা যায়। যেমন চৈত্র স্বয়ং গমন-ক্রিয়ায় সক্ষম হ'লেও তার প্রভুর অধীন বলে সে উক্তি করে, প্রভু আমাকে গমন করালেন। আবার তার প্রভু যদিও ভালো করেই বোঝেন যে, চৈত্রের স্বাধীনভাবে গমন করার শক্তি রয়েছে তথাপি আদেশ ব্যতীত চৈত্র গমন করবে না এরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে বলেন, আমি চৈত্রকে গমন করালাম। এইভাবে ণিজন্ত ক্রিয়ার মূল প্রতিপাদ্য প্রযোজ্য-প্রয়োজক ব্যাপার আমাদের প্রতীতিগম্য হয়।

১। 'তথা চেদং দর্শয়ামঃ কিং প্রকাশঃ প্রকাশতে।
অপ্রকাশোঽপি নৈবাসৌ তথাপি চ ন কিঞ্চন ॥' ৩৭

—তন্ত্রালোক: ১০ম আহ্নিক—৩৭ শ্লোক

তত্র প্রকাশঃ কিং প্রকাশতে বৈয়র্থ্যান্ন প্রকাশতে ইত্যর্থঃ, অপ্রকাশোঽপ্যসাবসামর্থ্যান্নৈব প্রকাশতে ইতি সংবন্ধঃ। এবং সতি প্রকাশ্যো বাহ্যোঽর্থঃ প্রকাশকং চ জ্ঞানং ন কিঞ্চিৎ স্যাদিত্যুক্তং তথাপি চ ন কিংচন ইতি ॥' ৩৭

—তন্ত্রালোক: ১০ম আহ্নিক—৩৭ শ্লোকের জয়রথভাষ্য

যেখানে দুটি পদার্থের মধ্যে একটি চেতন ও আর একটি অচেতন বা যেখানে দুটিই অচেতন, সেখানে প্রযোজ্য-প্রয়োজকভাব উপচারের জন্য সিদ্ধ হয় যেমন শরং গময়তি শরকে নিক্ষেপ করছে, এক্ষেত্রে শরে বেগক্রিয়া আধান করার জন্য ধনুর্দ্ধরকে প্রযোজক বলা হচ্ছে গৌণভাবে—আসলে সে প্রয়োজক নয়। আবার বায়ুরদ্রিং পাতয়তি, বায়ু পর্ব্বতকে পাতিত করছে, এক্ষেত্রে দুটি জড় পদার্থ, বায়ু ও পর্ব্বত, প্রয়োজক ও প্রযোজ্য বলে কল্পিত হচ্ছে।[১]

নৈয়ায়িকমত জ্ঞান অচেতন

নৈয়ায়িকদের মতে জ্ঞান বাহ্য পদার্থের মতো জ্ঞেয় বলে অচেতন। কিন্তু তার যোগে আত্মা চেতন হয়।

এই মত অনুযায়ী জ্ঞান অর্থকে প্রকাশিত করে এই বাক্যটি বায়ু অদ্রিকে পাতিত করে এই বাক্যের সদৃশ। অতএব অদ্রির পতন যেমন স্বব্যাপার তেমনি প্রকাশও অর্থের স্বব্যাপার হোক।[২]

১। 'তর্হি লোকে কথং ণ্যর্থঃ উচ্যতে চেতনস্থিতৌ।
মুখ্যো ণ্যর্থস্য বিষয়ো জড়েষু ত্বৌপচারিকঃ॥ ৩৮
তথাহি গন্তুং শক্তোঽপি চৈত্রোঽন্যায়ত্ততাং গতেঃ।
মন্যান এব বক্ত্যস্মি গমিতঃ স্বামিনেতি হি॥ ৩৯
স্বাম্যপ্যস্য গতৌ শক্তিং বুদ্ধ্বা স্বাধীনতাং স্ফুটম্।
পশ্যন্নিবৃত্তিমাশঙ্ক্য গময়ামীতি ভাষতে॥ ৪০
প্রেষ্যপ্রেরকয়োরেবংমৌলিকী ণ্যর্থসংগতিঃ।
তদভিপ্রায়তোঽন্যোঽপি লোকে ব্যবহরেত্তথা॥ ৪১
শরং গময়তীত্যত্র পুনর্বেগাখ্যসংক্রিয়াম্।
বিদধৎ প্রেরকম্মন্য উপচারেণ জায়তে॥ ৪২
বায়ুরদ্রিং পাতয়তীত্যত্র দ্বাবপি তে জড়ৌ।
দ্রষ্টৃভিঃ প্রেরকপ্রৈষ্যবপুষা পরিকল্পিতৌ॥' ৪৩
—তন্ত্রালোক: ১০ম আহ্নিক, ৩৮—৪৩ শ্লো

২। '...যথা প্রযোজ্যস্য অদ্রেঃ স্বব্যাপারঃ পতনং তাত্ত্বিকসিদ্ধমেবমিহ প্রযোজ্যস্যার্থ প্রকাশনমভ্যুপগন্তব্যম্' —তন্ত্রালোক: ১০ম আহ্নিক—৪৫ শ্লোকার্দ্ধের জয়রথ-ভা

'অর্থে প্রকাশনা সেয়মুপচারস্ততো ভবেৎ।
অস্তু চেৎ ভাসতে তর্হি স এব পতদদ্রিবৎ॥ ৪৫
উপচারে নিমিত্তেন কেনাপি কিল ভূয়তে।
বায়ুঃ পাতয়তীত্যত্র নিমিত্তং তৎকৃতা ক্রিয়া॥ ৪৬
গিরৌ যেনৈষ সংযোগনাশাৎ ভ্রংশং প্রপদ্যতে।
ইহ তু জ্ঞানমর্থস্য ন কিঞ্চিৎ-করমেব তৎ॥ ৪৭

এখানে তন্ত্রাচার্য্যদের উত্তর হ'ল: উপচারের কোন-না-কোন কারণ থাকতে বাধ্য। বায়ু অদ্রিকে পাতিত করছে এই ক্ষেত্রে বায়ুর বেগ পৃথিবীর সঙ্গে অদ্রির সংযোগ নষ্ট করে অদ্রিকে পাতিত করছে। বায়ুকৃত ক্রিয়া এখানে উপচারের কারণ। কিন্তু জ্ঞান অর্থকে প্রকাশিত করে এই বাক্যে জ্ঞান তো অর্থের কিছু করে না। সুতরাং এক্ষেত্রে উপচারের কারণ কি?

তাছাড়া, জ্ঞান অর্থকে প্রকাশিত করে এই বাক্যে উপচার স্বীকার করলেই বা কি আসে যায়? মাণবকের উপর বহ্নি ধর্ম্মের উপচার করলেই কি মাণবক বহ্নির দাহাদি ক্রিয়ায় সক্ষম হয়? সুতরাং অপ্রকাশস্বভাব অর্থের উপর প্রকাশত্বের উপচার করলেই কি সেই অর্থ প্রকাশিত হবে? তাৎপর্য্য হ'ল: যে পদার্থ স্বভাবতঃই জ্ঞেয় নয়, তার উপর জ্ঞেয়তার আরোপ করলেই কি তা

উপচারঃ কথং নাম ভবেৎ সোঽপি হ্যবস্তুসন্।
অপ্রকাশিত এবার্থঃ প্রকাশত্বোপচারতঃ ॥ ৪৮
তাদৃগেব শিশুঃ কিং হি দহত্যগ্ন্যুপচারতঃ।
শিশৌ বহ্ন্যুপচারে যদ্বীজং তৈক্ষ্ণ্যাদি তচ্চ সৎ ॥ ৪৯
প্রকাশত্বোপচারে তু কিং বীজং যত্র সত্যতা।
সিদ্ধো হি চেতনে যুক্ত উপচারঃ স হি স্ফুটম্ ॥ ৫০
অধ্যারোপাত্মকঃ সোঽপি প্রতিসন্ধানজীবিতঃ।
ন চাস্ত্যাপি কিমপ্যস্তি চেতনং জ্ঞানমপ্যদঃ ॥ ৫১
অপ্রকাশং তদন্যেন তৎপ্রকাশোঽপ্যয়ং বিধিঃ।'

—তন্ত্রালোক: ১০ম আহ্নিক, ৪৫—৫১ শ্লোক ও ৫২ শ্লোকার্দ্ধ

'ভবন্মতে চ প্রতিসন্ধাতা কশ্চিন্নাস্তি স হি চেতনো বা স্যাৎ আত্মা, চৈতন্যং বা জ্ঞানং, ন তাবৎ অত্রাপি চেতন আত্মা সিদ্ধস্তস্য স্বতোঽচেতনস্য জ্ঞানযোগে তথাত্বোপগমাৎ, জ্ঞান-যোগশ্চ সমবায়েন যথাত্মনস্তথা হ্যন্যত্রা অর্থেন্দ্রিয়াদেরেকার্থসমবায়েন চ সুখাদেরপি সম্ভবতী-ত্যর্থাদয়শ্চেতনাঃ স্যুঃ। ন চাত্র নিয়মনিমিত্তমুৎপশ্যামো যেন সমবায়াচ্চেতনত্বং নৈকার্থ সমবায়াদেরিতি। যৎ পুনঃ সম্বন্ধাবিশেষেঽপি বস্তুভাবকৃত এবায়ং বিশেষঃ,—ইত্যুচ্যতে তৎপলায়নপ্রকারাস্ত্রণম্। তদাহ ন চাস্ত্যাপি কিমপ্যস্তি চেতনম্ ইতি। নাপি চৈতন্যরূপে জ্ঞান এব চেতন ইতি ব্যবহারস্তস্য ধর্ম্মরূপেত্বেন ধর্ম্মিব্যপদেশাযোগাৎ, তদপি চ জ্ঞানং যদি স্বয়ং-প্রকাশরূপং ভবেৎ তদৈতদ্ব্যুচ্যেত, ন চৈবমিত্যাহ জ্ঞানমপ্যেতদপ্রকাশমিতি। .... যথা হ্যর্থস্যান্যেন জ্ঞানেন প্রকাশত্বে প্রযোজ্যপ্রযোজকভাবঃ প্রসক্তঃ স চ ন মুখ্যো গৌণো বা কথঞ্চন ব্যবতিষ্ঠতে, ইত্যর্থস্য প্রকাশনমেবাসিদ্ধম্, এবং জ্ঞানস্য জ্ঞানান্তরবেদ্যত্বেঽপি মুখ্যাণার্থসংগত্যভাবাৎ প্রকাশনমেব ন সিদ্ধ্যেৎ ন চাপ্রকাশাত্মনো জড়স্য প্রতিসন্ধাতৃত্বং যুজ্যতে প্রতি-সন্ধানাভাবে তজ্জীবিতাধ্যারোপানুপপত্তাবুপচারঃ কথংকারমত্র ব্যবতিষ্ঠেতেত্যলং বহুনা ॥'

তন্ত্রালোক: ১০ম আহ্নিক, ৫০—৫২ শ্লোকার্দ্ধের জয়রথ-ভাষ্য

জ্ঞেয় হয়? মাণবকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকার জন্যই তার উপর বহ্নি ধর্ম্মের উপচার করা হচ্ছে। এখানে উপচারের বাস্তব কারণ রয়েছে। কিন্তু অর্থের উপর প্রকাশত্বের উপচারের ক্ষেত্রে কোনই বাস্তব কারণ নাই।

আসল কথা হ'ল, উপচারের মূলে আছে আরোপ। কোন চেতন আরোপকর্ত্তা না থাকলে আরোপ ও কাজেকাজেই উপচার সম্ভব হতে পারে না। নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আত্মা স্বভাবতঃই অচেতন, জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হলেই সে চেতন হয়। অতএব জ্ঞানযোগের পূর্ব্বে অচেতন আত্মার পক্ষে আরোপকর্ত্তা হওয়া সম্ভব নয়। জ্ঞান যেহেতু চৈতন্য, সেহেতু তাকেও চেতন আরোপকর্ত্তা বলা চলে না। অবশ্য জ্ঞান যদি স্বয়ং-প্রকাশ হতো, তাহ'লে তাকে চেতন আরোপকর্ত্তা বলা চলতো। কিন্তু নৈয়ায়িক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেহেতু বিষয় প্রতিভাসকালে জ্ঞানের প্রতিভাস হয় না, সেহেতু জ্ঞান স্বয়ং-প্রকাশ নয়। যদি এক্ষেত্রে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপিত করা যায়ঃ বিষয়গ্রহণের পর আত্মমনঃ-সংযোগজাত জ্ঞানান্তরের দ্বারা জ্ঞান জানা যায়, অতএব এই জ্ঞানের পক্ষে চেতন আরোপকর্ত্তা হতে কোন বাধা নাইঃ—তাহ'লে জবাব হবে—যেমন অর্থের জ্ঞান-প্রকাশ্যের ক্ষেত্রে কোন উপায়েই প্রযোজ্য-প্রযোজক-ব্যাপারের সঙ্গতি না হওয়ার জন্য প্রকাশনই প্রমাণ করতে পারা যায় না, তেমনি জ্ঞানের জ্ঞানান্তর-প্রকাশ্যের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য-প্রযোজকভাব প্রমাণিত না হওয়ার জন্য প্রকাশনই অসিদ্ধ থেকে যাবে। সুতরাং নৈয়ায়িকদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোন ক্রমেই অপ্রকাশস্বভাব জড় জ্ঞানকে চেতন আরোপকর্ত্তা বলা চলে না এবং এইরূপে আরোপ সম্ভব না হওয়ার জন্য আরোপভিত্তিক উপচারও সম্ভব হতে পারে না।

তাছাড়া, প্রদীপ যেমন রূপকে প্রকাশিত করে, জ্ঞানও তেমনি বিষয়কে প্রকাশিত করে—এরূপ পূর্ব্বপক্ষও করা যায় না। কারণ, প্রদীপ যে রূপে রূপকে প্রকাশিত করে, সেই রূপেরও একটি স্বতন্ত্র প্রকাশ আছে। কিন্তু জ্ঞান যেরূপে বিষয়কে প্রকাশিত করে, সেই রূপের কোন স্বতন্ত্র প্রকাশ নাই। তাছাড়া, প্রদীপ আপনার প্রভা বিচ্ছুরণ করে বস্তুতে প্রকাশত্ব আধান করে। প্রকাশত্ব বা ভাস্করতার এই আধান ব্যতীত প্রদীপ কোন বস্তুকেই প্রকাশিত করতে পারে না। জ্ঞানের দ্বারা বিষয় প্রকাশের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রদীপের দ্বারা বিষয় প্রকাশের

ক্ষেত্রের মতো প্রভাবিচ্ছুরণরূপ ব্যাপারের মতো কোন ব্যাপার দেখা যায় না। জ্ঞান বিষয়কে প্রকাশিত করছে তা প্রতীতিগম্য, কিন্তু জ্ঞান কর্তৃক বিষয়ে প্রকাশত্বের আধান প্রতীতিগম্য নয়। সুতরাং অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধান্ত হ'ল যে, বিষয় ও প্রকাশের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই।

'অতশ্চ প্রকাশ এব স্বশক্তিবিস্ফারসারতত্তদর্থবপুষা পরিস্ফুরতীতি'

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—৫৫ শ্লোকার্দ্ধের জয়রথ-ভাষ্য

অতএব সিদ্ধান্ত হ'ল—প্রকাশই আপনার শক্তি বলে প্রসিদ্ধ বাহ্যবস্তুগুলির আকারে শোভা পাচ্ছে।

শেষ সিদ্ধান্তে আমরা পূর্ব্বোল্লিখিত সত্যেই আবার ফিরে যাচ্ছি :

'তস্মাৎ প্রকাশ এবায়ং পূর্ব্বোক্তঃ পরমঃ শিবঃ। ৫৫
যথা যথা প্রকাশেত তত্তদ্ভাববপুঃ স্ফুটম্।'

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—৫৫-৫৬ শ্লোকার্দ্ধ

এই প্রকাশই পূর্ব্ববর্ণিত পরম শিব। যেগুলিকে আমরা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলে অভিহিত করে থাকি, সেগুলি শিবের ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়।

বেদ্যতা বস্তুরই ধর্ম্ম। প্রকাশস্বরূপ পরম শিব যখন আপন শক্তিবিস্ফারে একটি বিশেষ বস্তু-প্রকাশ একটি বিশেষ খণ্ডচৈতন্যে উদ্ভাসিত করে তোলেন, তখন সেই বিশেষ বস্তুটি গ্রাহ্য প্রমেয় ও সেই বিশেষ খণ্ডচৈতন্যটি গ্রাহক প্রমাতা এই আখ্যা পেয়ে থাকে।[১]

১। 'এবং চ নীলতা নাম যথা কাচিৎ প্রকাশতে ॥ ৫৬
তদ্বচ্চকাস্তি বেদ্যত্বং তচ্চভাবাংশপৃষ্ঠগম্।'

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—৫৬-৫৭ শ্লোকার্দ্ধ

'যচ্চোক্তং বেদ্যতাধর্ম্মাভাবঃ সর্ব্বানপি প্রতি। ৬১
স্যাদিত্যেতৎ স্বপক্ষঘ্নং দুষ্প্রয়োগাস্ত্রবত্তব।
অস্মাকং তু স্বপ্রকাশশিবতমাত্রবাদিনাম্ ॥ ৬২
অন্যং প্রতি চকাস্তীতি বচ এব ন বিদ্যতে।
সর্ব্বান্ প্রতি চ তন্নীলং স ঘটশ্চেতি যদ্বচঃ ॥ ৬৩
তদপ্যবিদিতপ্রায়ং গৃহীতং মুগ্ধবুদ্ধিভিঃ।
ন হি কালাগ্নিরুদ্রীয়কায়াবগতনীলিমা ॥ ৬৪
তব নীলঃ কিং নু পীতো নৈবং ভূয়স্তু নীলকঃ।
ন কঞ্চিৎ প্রতি নীলোঽসৌ নীলো বা যং প্রতি স্থিতঃ ॥ ৬৫

এই বেদ্যতারূপ ধর্ম্মযোগেই বস্তু বেদ্যতা পায় অর্থাৎ বেদ্য হয়। বস্তু বেদ্য হবার জন্য বেদ্যতারূপ ধর্ম্মের অপেক্ষা রাখে, বেদ্যতা কিন্তু আপনিই বেদ্য।

তং প্রত্যেব স বেদ্যঃ স্যাৎ স কল্পনারকোঽন্ততঃ।
যথা চার্থপ্রক'শ্য'ত্মজ্ঞান সংগীযতে তথা॥ ৬৬
তথা তজ্জ্ঞাতৃবেদ্যত্বং ভাবীয়ং রূপমুচ্যতাম।
ন চ জ্ঞাতাত্র নিযতঃ কশ্চিজ্জ্ঞানে যথা তব॥ ৬৭
অর্থে জ্ঞাতা যদা যো যস্ত'দ্বদ্যং বপুরুচ্যতাম্।
তত্তদ্বিজ্ঞাতৃবেদ্যত্বং সর্বান্ প্রত্যেব ভাসতাম॥ ৬৮
ইত্যেবং চোদয়ন মন্যে ব্যক্তং বধিরধুর্য্যতাম্।
ন হ্যন্যং প্রতি বৈ কঞ্চিৎ ভাতি সা বেদ্যতা তথা॥' ৬৯

—তন্ত্রালোক: ১০ম আহ্নিক, ৬১—৬৯ শ্লোক

'বেদ্যতা কিন্তু ধর্ম্মোঽসৌ যদ্যোগাৎ সর্বধর্ম্মবান্॥ ৭১
ধর্ম্মী বেদ্যত্বমভ্যেতি স সত্তাসমবায়বৎ।
রূপে যথা হি কুরুতে সত্তা সত্যসতঃ সতঃ॥ ৭২
সমবায়োঽপি সংশ্লিষ্টঃ শ্লিষ্টানশ্লিষ্টতাজুষঃ।
অন্ত্যো বিশেষো ব্যাবৃত্তিরূপো ব্যাবৃত্তিবর্জ্জিতান্॥ ৭৩
ব্যাবৃত্তান্ শ্বেতিমা শুক্লমশুক্লং গমনং তথা।
তদ্বন্নালাদিধর্ম্মাংশযুক্তো ধর্ম্মী স্বয়ং স্থিতঃ॥ ৭৪
অবেদ্যো বেদ্যতারূপাদ্ধর্ম্মাদ্বেদ্যত্বমাগতঃ।'

—তন্ত্রালোক: ১০ম আহ্নিক, ৭২—৭৪ শ্লোক ও ৭৫ শ্লোকার্দ্ধ

'তত্র যথৈব দ্রব্যাদয়স্ত্রয়ঃ স্বরূপেণ ন সন্তো নাসন্তঃ সত্তাসমবায়ত্তু সন্তঃ, সত্তা তু স্বরূপেণৈব সত্ত্বাৎ ন সত্যসতী বেতি পর্য্যানুযোগপাত্রম্। অনেন অপরমপি সামান্যমুপলক্ষিতম্। যতো গৌঃ স্বরূপেণ না গৌঃ নাগৌঃ গাত্বাভিসম্বন্ধাৎ তু গৌঃ, গোত্বং তু স্বত এব তথাত্বাৎ ন জাত্যন্তরযোগমানয়তি। যথা চ কার্য্যং না কারণে সামান্যং বা বিশেষে স্বয়মবৃত্তিরূপং সমবায়বৃত্ত্যা বর্ত্ততে, সমবায়শ্চ স্বাশ্রয়ে বর্ত্তমানঃ স্বয়মেব বৃত্তিরূপত্বান্ন সমবায়াদিবৃত্ত্যন্তরমপেক্ষতে। যথা চ ভাবানামনুবৃত্তিপ্রত্যয়হেতুসামান্যযোগদ্বারকসংশয়প্রতিপক্ষতযা গুণকর্ম্মাদয়ো ধর্ম্মা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধিহেতবো বিশেষা ইহ, তেষামপি তথৈব সামান্যযোগেন সংশযবীজভূতত্বে প্রলয়ে বা নিত্যদ্রব্যেষু সজাতীয়বিজাতীযবৈলক্ষণ্যাধায়িনোঽত্যন্তব্যাবৃত্তি-বুদ্ধিহেতবো মাদৃশামন্যথানুপপত্ত্যা যোগিনাং তু প্রত্যক্ষেণ সিদ্ধা অন্ত্যা বিশেষা উপগম্যন্তে। ভাবাশ্চ স্বরূপেণ ন ব্যাবৃত্তা নাপ্যব্যাবৃত্তা ব্যাবৃত্তিযোগাৎ তু ব্যাবৃত্তা ইতি ভঙ্গ্যা বিশেষৈরেব ব্যাবৃত্ত্যন্তে, বিশেষাস্তু স্বযং ব্যাবৃত্তিরূপত্বাৎ ন ব্যাবৃত্তা অব্যাবৃত্তা বেতি বিকল্পনীয়াঃ যথা চ পটঃ স্বরূপাৎ ন শ্বেতো নাপ্যশ্বেতঃ শ্বেতগুণসম্বন্ধাত্তু শ্বেতঃ, শ্বেতগুণস্তু শ্বেতরূপত্বাদেব ন স্বসমবায়িশ্বেতান্তরমুপযাচতে। যথা চ গন্তা ন স্বয়ং গন্তা নাপ্যগন্তা গমনক্রিয়াযোগাত্তু গন্তা, গমনক্রিয়া তু গমনাত্মকত্বাদেব ন স্বাত্মনি গমনমন্যদর্থয়তে। এবং সকলধর্ম্মযুক্তোঽপি ভাবঃ স্বয়ং ন বেদ্যো নাবেদ্যো বেদ্যতাসম্বন্ধাত্তু বেদ্যঃ, বেদ্যতা পুনঃ স্বাত্মনৈব বেদ্যত্বান্নাবেদ্যা বেদ্যা বেত্যনুযোক্তৃঃ যুক্তেত্যুপরম্যতে॥'৭৩

—তন্ত্রালোক: ৭৩—৭৫ শ্লোকের জয়রথ-ভাষ্য

উদাহরণ হিসাবে বলতে পারা যায় যে, বস্তু স্বরূপে শ্বেত নয় আবার অশ্বেতও নয়, শ্বেতগুণযোগেই শ্বেত—শ্বেতগুণ কিন্তু তার শ্বেতরূপের জন্য স্বভাবতঃই শ্বেত। এক্ষেত্রে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত হ'ল :

'এবং সকলধর্ম্মযুক্তোঽপি ভাবঃ স্বয়ং ন বেদ্যো নাবেদ্যো বেদ্যতাসম্বন্ধাত্তু বেদ্যঃ, বেদ্যতা পুনঃ স্বাত্মনৈব বেদ্যত্বাৎ নাবেদ্যা বেদ্যা বেত্যনুযোক্তুং যুক্তেত্যুপরম্যতে ॥'

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক, ৭৩—৭৫ শ্লোকের জয়রথ-ভাষ্য

এই প্রকারে সকল ধর্ম-যুক্ত হয়েও বস্তু স্বরূপতঃ জ্ঞেয়ও নয়, অজ্ঞেয়ও নয়—বেদ্যাতাধর্মযোগেই জ্ঞেয় হয়ে উঠে। বেদ্যতাধর্ম্ম কিন্তু স্বরূপতঃই জ্ঞেয় বলে জ্ঞেয় কি জ্ঞেয় নয়, এরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করাই অনুচিত।

বস্তুনিচয়ের বহুপ্রমাতৃবেদ্যতা স্থাপন করার জন্য তন্ত্রাচার্য্য দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন :

'তথা হ্যেকাগ্রসকলসামাজিকজনঃ খলু।
নৃত্যং গীতং সুধাসারসাগরত্বেন মন্যতে ॥ ৮৫
তত এবোচ্যতে মল্লনটপ্রেক্ষোপদেশনে।
সর্ব্বপ্রমাতৃতাদাত্ম্যং পূর্ণরূপানুভাবকম্ ॥ ৮৬[১]

—তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—৮৫-৮৬ শ্লোক

প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠীয়মান নৃত্যগীত সকল দর্শকই চাক্ষুষ করে। অথচ প্রত্যেক দর্শকই সেই নৃত্যগীতকে সুধাসমুদ্র অর্থাৎ পরম আস্বাদনীয় বলে মনে করে। অতএব যেহেতু মল্ল বা অভিনেতার হাবভাব সকল দর্শকই একরকম দেখে, সেহেতু এই দিক দিয়ে সকল প্রমাতারই ঐক্য। আবার মল্ল বা অভিনেতার সেই হাবভাব প্রত্যেক দর্শকই পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করতে পারে।

যেহেতু সংবিৎ স্বরূপ শিবতত্ত্ব প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয় সিদ্ধ হবার আগেই সিদ্ধ সেহেতু শিবতত্ত্বসাধনে প্রমাণ প্রযুক্ত হতে পারে না।

শিবতত্ত্বে প্রমাণের অনুপযোগ

'অপহ্নুতৌ সাধনে বা বস্তুনামাদ্যমীদৃশম্।
যৎ তত্র কে প্রমাণানামুপপত্ত্যুপযোগিতে ॥' ৫৭

—তন্ত্রালোক : ১ম আহ্নিক ৫৭ শ্লোক

১। 'তং তং ঘটাদিমর্থমেকদেশব্যবস্থিতাঃ প্রমাতারঃ সমং সংবেদয়মানাস্তাবত্যংশে তদৈক্যমুপযান্তি।' —তন্ত্রালোক : ১০ম আহ্নিক—৮৬ শ্লোকের জয়রথ-ভাষ্য

সংবিন্ময় শিবতত্ত্ব প্রমাতা-প্রমাণ-প্রমেয়ের মূলীভূত আদিসিদ্ধ তত্ত্ব। সুতরাং এই তত্ত্বের অস্তিত্ব সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করার জন্য কোন প্রমাণ প্রয়োগ করার প্রশ্নই উঠে না বা তার দরকারও নাই।

কামিকতন্ত্রেও এই বিষয় উক্ত হয়েছে:

'কামিকে তত এবোক্তং হেতুবাদবিবর্জ্জিতম্।
তস্য দেবাতিদেবস্য পরাপেক্ষা ন বিদ্যতে॥ ৫৯
পরস্য তদপেক্ষত্বাৎ স্বতন্ত্রোঽয়মতঃ স্থিতঃ।'

—তন্ত্রালোক: ১ম আহ্নিক—৫৯ শ্লোক ও ৬০ শ্লোকার্দ্ধ

এই কারণেই কামিকতন্ত্রে শিবতত্ত্বকে হেতুবাদ-বিবর্জ্জিত তত্ত্ব বলা হয়েছে। সেই দেবাদিদেব পরমশিব স্বাতন্ত্র্যশক্তির বলে কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না। কিন্তু তিনি ছাড়া বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ তাঁরই উপর নির্ভরশীল।[১] এই কারণে পরমশিব স্বতন্ত্র অর্থাৎ যুক্তি ব্যতীতই তিনি সিদ্ধ।

এই শিবকেই শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ রুদ্র এই আখ্যায় ভূষিত করেছেন:

'একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুর্য ইমাঁল্লোকানীশত ঈশনীভিঃ।'

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ: তৃতীয় অধ্যায়—২ শ্লোকার্দ্ধ

একমাত্র রুদ্রই আছেন, দ্বিতীয় কেউ নেই। তিনি এই সমস্ত লোককে ঈশনী অর্থাৎ স্বীয় শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করেন।

রুদ্র নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নিরুক্তে যাস্কের উক্তি:

'রুদ্রো রৌতীতি সতঃ। রোরূয়মাণো দ্রবতীতি বা রোদয়তের্বা। যদরুদৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্ ইতি কাঠকম্।'

১। 'বহুশক্তিত্বমস্যোক্তং শিবস্য যদতো মহান্।
কলাতত্ত্ব-পুরার্ণাণুপদাদির্ভেদবিস্তরঃ॥ ৭৮
সৃষ্টিস্থিতিতিরোধান-সংহারানুগ্রহাদি চ।
তুর্য্যমিত্যপি দেবস্য বহুশক্তিত্বজৃম্ভিতম্॥ ৭৯
জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তানি তদতীতানি যান্যপি।
তান্যপ্যমুষ্য নাথস্য স্বাতন্ত্র্যলহরীভরঃ॥ ৮০
মহামন্ত্রেশমন্ত্রেশমন্ত্রাঃ শিবপুরোগমাঃ।
অকলঃ সকলশ্চেতি শিবস্যৈব বিভূতয়ঃ॥' ৮১

—তন্ত্রালোক: ১ম আহ্নিক, ৭৮—৮১ শ্লোক

রুদ্র শব্দটি রুদ্ ধাতুর উত্তর ণিচ্ প্রত্যয়যোগে নিষ্পন্ন। বেদে রুদ্ ধাতুর অর্থ ক্রন্দন করা নয়, গর্জ্জন করা। যিনি গর্জ্জমান অবস্থায় ধাবিত হন অথবা যিনি গর্জ্জন করান, তিনিই রুদ্র। কাঠকে উক্ত আছে যে, গর্জ্জন করাই রুদ্রের স্বভাব।

বৈদিকসূক্তে বর্ণিত রত্নধাতম ধনদাতা 'অধ্বরাণাং গোপা' যজ্ঞ-রক্ষক অগ্নির স্বভাব গর্জ্জন করা। স্ফুলিঙ্গের বিচ্ছুরণে, লেলিহান শিখার বিস্তারে ও আগ্নেয় মরুৎরথের কেতু ধূমকদম্বের উচ্ছ্বাসে যে শব্দগাম্ভীর্য্যের উৎপত্তি, তাই হ'ল অগ্নির গর্জ্জন। এই কারণেই অগ্নি রুদ্র এই আখ্যা পেয়েছেন।[১] নিরুক্তে যাস্ক বলছেন:

'অগ্নিরপি রুদ্র ইতি উচ্যতে তস্যৈবং ভবতি।'

অগ্নিকেও রুদ্র বলা হয়। এটি (গর্জ্জন করা) তাঁর স্বভাব।

কিন্তু প্রাকৃতিক রাজ্যে অগ্নি ছাড়াও গর্জ্জন-স্বভাব আরো পদার্থ আছে। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঝঞ্ঝাচালিত বিদ্যুৎগর্ভ জলপূর্ণ মেঘ। ঋগ্বেদীয় যুগের কর্ষণকারী মনুষ্য-সমাজের কাছে এই জাতীয় মেঘের মূল্য ছিল অপরিসীম। কারণ, এই মেঘই রুক্ষ মাটিকে জলধারায় সিঞ্চিত করে তাকে কর্ষণক্ষম করে তুলতো। সুতরাং কৃষিজীবী সভ্যতায় এই ঝঞ্ঝা-প্রেরিত বিদ্যুৎগর্ভ জলবর্ষণক্ষম মেঘ দৈবসত্তাহিসাবে কল্পিত ও রুদ্র আখ্যায় অভিহিত হয়েছিল। এইরূপ মেঘকে রুদ্র বলায় রুদ্র নামে অভিহিত অগ্নিরও মর্য্যাদা অক্ষুন্ন থাকল। কারণ এই মেঘের মধ্যেও বৈদ্যুতী শক্তি হিসাবে অগ্নি বিরাজমান।

১। 'ত্রিপাদূর্দ্ধ্ব উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ।
তত্তো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি॥ ৪ —পুরুষ সূক্ত—৪ ঋক্
তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশুংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যান্ গ্রাম্যাশ্চ যে॥ ৮
তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাৎ অজায়ত॥' ৯ —ঐ, ৮ ও ৯ ঋক্
'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥' ১২ —পুরুষ সূক্ত—১২ ঋক্
উপরি-বর্ণিত 'সহস্রশীর্ষা সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ' পুরুষই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের রুদ্র।

ঋগ্বেদে বাত্যারূপী মরুৎগণ রুদ্রপুত্ররূপে কল্পিত হয়েছে ; 'রুদ্রস্য সূনবঃ রুদ্রস্য পুত্রাঃ' এই উক্তিগুলি মরুৎ সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

শুক্ল যজুর্বেদ

শুক্ল যজুর্বেদে শিবতত্ত্বের পরিকল্পনা আরো সুস্পষ্ট আকারে আত্ম-প্রকাশ করেছে। শুক্ল যজুর্বেদে আছে :

'ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনম্।
উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোর্মুক্ষীয় মামৃতাং॥'

যিনি সুগন্ধি অর্থাৎ যাঁর কীর্ত্তি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত, যিনি পুষ্টিবর্দ্ধন অর্থাৎ যিনি উপাসকগণের দেহ মন সবই পরিপুষ্ট করেন, সেই ত্র্যম্বকের আমরা আরাধনা করি। যতদিন পর্য্যন্ত না আমাদের সাযুজ্যমুক্তি হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কর্কোটী ফল যেমন আপনিই ফেটে যায় তেমনি ভববন্ধন থেকে আমাদিগে মুক্ত করুন।

শুক্ল যজুর্বেদে কৃত্তিবাস, নীলগ্রীব, শিতিকণ্ঠ, বিলোহিত, সহস্রাক্ষ, রুদ্র, শম্ভু, শঙ্কর, ঈশান, দরিদ্র, ক্রিবি, পশুপতি ইত্যাদি সংজ্ঞা পাওয়া যায়। এগুলি আমাদের ধ্যানের মহাদেবমূর্ত্তিকে আমাদের কল্পনানেত্রে সুপ্রকট করে তোলে। তাছাড়া, শিবকে ভিষক্ ও 'ক্ষেত্রাণাং বৃক্ষাণাং ওষধীনাং অরণ্যানাং' শস্যক্ষেত্র, বৃক্ষলতা, ওষধি ও বনের অধিপতি বলা হয়েছে। তিনি মুজাবৎপর্ব্বতবাসী, তাঁর বাহন মূষিক।

শুক্ল যজুর্বেদে শিবচরিত্রের দুটি দিক সুস্ফুট। তিনি একাধারে 'ভয়ং ভয়ানাং ভীষণং ভীষণানাং', ভয়েরও ভয়জনক, ভীষণেরও ভীষণ এবং পরমশিব পরমমঙ্গলময় পরমকল্যাণাস্পদ। তিনি একাধারে মৃত্যু-করাল মহাকাল ও স্বচ্ছন্দবাহী অমৃতধারা।

শুক্ল যজুর্বেদে রুদ্রকে ব্রাতপতি বলা হয়েছে। ব্রাত শব্দের অর্থ হ'ল ঝাঁক বা দল। কৃষক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, স্থপতি, তক্ষণ অর্থাৎ যারা সভ্যতার ধারক ও বাহক, যাদের তিল তিল আত্মদানেই বিশ্ব-জীবনস্রোতের প্রবহমানতা সংরক্ষিত হয়ে আসছে—তাদের দলই ব্রাত। শিব এই মূঢ় মূক ম্লান মেহনতী মানুষেরই অধিপতি।

'নমো রুদ্রায়ততায়িনে ক্ষেত্রাণাং পতয়ে নমো
নমঃ সূতায়াহন্ত্যে বনানাং পতয়ে নমঃ।

ওঁ নমস্তক্ষভ্যো রথকারেভ্যশ্চ বো নমো
নমো কুলালেভ্যঃ কর্ম্মকারেভ্যশ্চ বো নমো।
নমোঽস্তু রুদ্রেভ্যো যে পৃথিব্যাং যেষামন্নমিষবস্তেভ্যো
নমো ব্রাত্যেভ্যো ব্রাতপতিভ্যশ্চ বো নমঃ॥' —রুদ্রাধ্যায়

বিশ্বব্যাপী রুদ্র যিনি শস্যক্ষেত্রের ও অরণ্যের অধিপতি তাঁকে নমস্কার। তন্তুবায়, দারুকর্ম্মকারী, কুম্ভকার ও কর্ম্মকারকে নমস্কার। রুদ্র, বিশ্ববাসী, বিশ্ববাসীর অন্নপ্রস্তুতকারক, সকলকে নমস্কার। ব্রাত্য ও ব্রাতপতিকে নমস্কার।

অথর্ব্ববেদ

অথর্ব্ববেদেও এই ব্রাত্যবোধ সুস্পষ্ট। সেখানে বিশ্ব-জীবনধারার প্রবহমানতার আলেখ্য বলা হয়েছে—দেবগণ, যজ্ঞ, যজমান, পশু, ভূমি, অগ্নি, ওষধি, বনস্পতি, লতা, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা নারাশংসী, সভাসমিতি, সেনা, দিন, রাত্রি সকলেই চলার পথের পথিক, একই মহাতীর্থের যাত্রী।[১]

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ

তান্ত্রিক শিবতত্ত্ব শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে যেরূপ সুস্পষ্ট, সেরূপ আর কোথাও নয়। শিবের বিশ্বময় ও বিশ্বোত্তীর্ণ এ দুটি রূপই এখানে সুব্যক্ত হয়েছে।

শিব 'সর্ব্বাননশিরোগ্রীবঃ'—সমস্ত মুখ, মস্তক ও গ্রীবা তাঁরই। তিনি সর্ব্বভূতগুহাশয়, সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত। তিনি সর্ব্বব্যাপী ও ষড়ৈশ্বর্য্য-বিশিষ্ট। 'তস্মাৎ সর্ব্বগতঃ শিবঃ' এই কারণে শিব বিশ্বময়। সর্বত্র তাঁর কর, চরণ, চক্ষু, মস্তক, মুখ, কর্ণ। সকল ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি ও বিষয়রূপে তিনিই

১। 'স উত্তীষ্ঠম্ স......ব্যহচলন্॥
তং বৃহচ্চ রথন্তরং চাদিত্যাশ্চ বিশ্বে চ দেবা অনুব্যহচলন্॥
তং যজ্ঞায়জ্ঞিয়ং চ বামদেব্যং চ যজ্ঞশ্চ যজমানশ্চ পশবশ্চানুব্যহচলন্॥
তং ভূমিশ্চাগ্নিশ্চৌষধয়শ্চ বনস্পতয়শ্চ বানস্পত্যাশ্চ বীরুধশ্চানুব্যহচলন্॥
তং ঋতং চ সত্যং চ সূর্য্যশ্চ চন্দ্রশ্চ নক্ষত্রাণি চানুব্যহচলন্॥
তং ইতিহাসশ্চ পুরাণঞ্চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যহচলন্॥
তং সভাসমিতিশ্চ সেনা চ সুরা চানুব্যহচলন্॥
অহ্না প্রত্যঙ্‌ ব্রাত্যো রাত্র্যাপ্রাঙ্‌ নমো ব্রাত্যায়॥' —ব্রাত্যসূক্ত—অথর্ব্ববেদ

প্রকাশিত। তিনি নবদ্বারযুক্ত শরীরে বিজ্ঞানাত্মরূপে অবস্থিত হয়েও বহির্বিষয়ে লীলা করে থাকেন।[১]

কিন্তু শিব বিশ্বময় হ'লেও 'স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্' তিনি সর্ব্বতোভাবে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত থেকেও ভুবন অতিক্রম করে দশাঙ্গুলি অর্থাৎ অনন্ত অসীম স্থানে অবস্থিত।

এই শিবই অর্দ্ধনারীশ্বর, একাধারে শিবশক্তি। তাই

'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।'

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : চতুর্থ অধ্যায়—৩ শ্লোকার্দ্ধ

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমি কুমারী—অর্থাৎ তুমি শিবও আবার শক্তিও।

এই শিবই মায়াধীশ, তাঁর শক্তিই মায়া।[২] এই শক্তিই শিবের সর্ব্বস্ব। এ বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের উক্তিতে তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট :

'ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।

১। 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ ॥ ১৭
নবদ্বারে পুরে দেহী হংসো লেলায়তে বহিঃ।
বশী সর্ব্বস্য লোকস্য স্থাবরস্য চরস্য চ ॥' ১৮
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : তৃতীয় অধ্যায়, ১৬—১৮ শ্লোক
'অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ।
স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥ ১৯
অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুঃ পশ্যতি বীতশোকো ধাতুঃ প্রসাদাৎ মহিমানমীশম্ ॥' ২০
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : ৩য় অধ্যায়—১৯-২০ শ্লোক

২। 'মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥' —শ্বে. উ : ৪ অধ্যায়, ১০ শ্লোক

পরাঽস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥' ৮

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : ৬ অধ্যায়—৮ শ্লোক

তাঁর কোন ক্রিয়া বা ক্রিয়ার সাধন নাই। তাঁর সমকক্ষ বা তাঁর চেয়ে বড় কাউকে দেখা যায় না। তাঁর পরাশক্তি বহুরূপ বলেই শোনা যায়—তাঁর এই শক্তি সহজসিদ্ধ প্রকাশ, প্রযত্ন ও ব্যাপারস্বরূপ।

তাই ঋষির কামনা হ'ল :

'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্ ॥'

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : ৬ অধ্যায়—৭ শ্লোক

সেই ঈশ্বরদের অর্থাৎ নিয়ন্তাদের পরম মহেশ্বর বা মহান নিয়ন্তা, দেবতাদের পরম দেবতা, প্রভুগণের পরম প্রভু, অবিদ্যার পারে বিরাজমান পূজ্য স্বয়ংপ্রকাশ জগদীশ্বরকে যেন আমরা জানতে পারি।

অদ্বিতীয় ও নামরূপহীন যিনি অজ্ঞাত কারণে বহুবিধ শক্তিসহায়ে সৃষ্টি-কালে জগৎরূপ হন, স্থিতিকালে নামরূপব্যাকৃত জগৎকে ধারণ করেন ও প্রলয়কালে তার বিনাশ করেন, সেই মহেশ্বরের কাছ থেকে শুভবুদ্ধিও কামনা করে ঋষি প্রার্থনা করছেন :[১]

'অজাত ইত্যেবং কশ্চিৎ ভীরুঃ প্রপদ্যতে।
রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্ ॥'

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : ৪ অধ্যায়—২১ শ্লোক

যেহেতু একমাত্র তুমিই অজাত অর্থাৎ জন্মজরাক্ষুৎপিপাসাদি-বর্জ্জিত, সেহেতু সংসারভয়ে কাতর হয়ে আমি তোমার শরণাপন্ন হচ্ছি। হে রুদ্র, তোমার যে

১। 'য একোঽবর্ণো বহুধা শক্তিযোগাদ্ বর্ণাননেকান্ নিহিতার্থো দধাতি।
বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ চ দেবঃ স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু ॥'
—শ্বে. উ. : ৪ অধ্যায়—১ শ্লোক

দক্ষিণ মুখ—যা ধ্যান করলে আনন্দ ও উৎসব জন্মায়—তার দ্বারা আমাকে সর্বদা রক্ষা কর।

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের এই রুদ্র-শিব পরিকল্পনায় আমরা রুদ্র-শিবের দুটি তনুর পরিচয় পাচ্ছি—একটি ঘোরা তনু ও অপরটি অঘোরা তনু। ঘোরা তনুতে তিনি প্রলয়ঙ্কর দেবতা, আর অঘোরা তনুতে তিনি ক্ষেমঙ্কর দেবতা। এই কল্যাণকর রূপে রুদ্র-শিবের প্রকাশই ঋষির ঐকান্তিক আকূতি :

'যা তে রুদ্র শিবা তনুরঘোরাঽপাপকাশিনী।
তয়া নস্তনুবা শন্তময়া গিরিশন্তাভিচাকশীহি॥'

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : ৩ অধ্যায়—৫ শ্লোক

হে রুদ্র, হে গিরিশন্ত (পর্ব্বতে অবস্থিত ও সুখপ্রদ), তোমার যে মঙ্গলময়, প্রসন্ন ও পাপবিনাশক তনু, সেই সুখময় তনু ধারণ করে আমাদের কাছে প্রকাশিত হও।

মুমুক্ষু ঋষি এই রুদ্র-শিবেরই শরণ গ্রহণ করেছেন—'মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে'।[১] শেষে আত্মসমাহিত ঋষির আত্মপ্রত্যয়বলিষ্ঠ উক্তি ও দৃপ্ত অসংশয়িত মোক্ষমার্গঘোষণা :

'বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়॥'

—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ : ৩ অধ্যায়—৮ শ্লোক

আমি পরিপূর্ণ, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, স্বয়ংপ্রকাশ ও অবিদ্যার পারে অবস্থিত এই সত্তাকে জেনেছি, একমাত্র তাঁকে জানতে পারলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারা যায়। সাধকরা তা করেছেন, সংসার থেকে উত্তরণের আর অন্য কোন পথ নাই।

মহাভারতীয় রুদ্র-শিব

মহাভারতে রুদ্র-শিবপরিকল্পনায় মূলীভূত প্রাকৃতিক পদার্থটি ইঙ্গিতে আভাসিত হয়েছে :

'ত্বমেব মেঘসংঘাশ্চ বিদ্যুৎ' —৭ পর্ব্ব : ২০১ অধ্যায়—৫৬ শ্লোক

তুমিই মেঘমালা ও বিদ্যুৎ।

১। 'যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥'

—শ্বে. উ. : ৬ অধ্যায়—১৮ শ্লোক

রুদ্র-শিবের ত্র্যম্বক, শিব, ব্যোমকেশ, বৃষাকপি, হর ও রুদ্র এই নামগুলির ব্যাখ্যা মহাভারতে পাওয়া যায়। তিন দেবী রুদ্র-শিবকে ভজনা করার জন্য তিনি ত্র্যম্বক। মনুষ্য-সমাজের মঙ্গলকামনায় সতত যজ্ঞে রত, এইজন্য তিনি শিব। চন্দ্র সূর্য্যের উজ্জ্বল দীপ্তিই তাঁর কেশ, এইজন্য তিনি ব্যোমকেশ। কপিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম তাঁর বৃষ, এইজন্য তিনি বৃষাকপি। যেহেতু ব্রহ্মা, ইন্দ্র, বরুণ, যম কুবেরকে তিনি নিগ্রহ করে হরণ করেন, সেহেতু তিনি হর।[১] তাঁকে রুদ্র আখ্যায় অভিহিত করার কারণ :

'যন্নির্দহতি যত্তীক্ষ্ণো যদুগ্রো যৎ প্রতাপবান্।
মাংসশোণিতমজ্জাদো যত্ততো রুদ্র উচ্যতে ॥'

—৭ পর্ব্ব : ২০১ অধ্যায়—১৪৪ শ্লোক

যেহেতু তিনি দহনকর্ত্তা, উৎপীড়ক, উদ্বেজক ও পরাক্রমযুক্ত ও মাংসরক্তমজ্জার ভক্ষক সেহেতু তিনি রুদ্র।

মাংসশোণিতমজ্জাদ এই বিশেষণটি শিবের শ্মশানচারিত্বের ইঙ্গিত দেয়। মহাভারতে শিবকে স্পষ্ট ভাষায় শ্মশানচারী বলা হয়েছে।

'এষ চৈব শ্মশানেষু দেবো বসতি নিত্যশঃ।'

—৭ পর্ব্ব : ২০১ অধ্যায়—১.৭ শ্লোক

দেবতা শিব সর্ব্বদা শ্মশানেই বাস করে থাকেন।

---

[১] 'তিস্রো দেবীর্যদা চৈব ভজতে ভুবনেশ্বরঃ।
দ্যামপঃ পৃথিবীঞ্চৈব ত্র্যম্বকশ্চ ততঃ স্মৃতঃ ॥
স মেধয়তি যন্নিত্যং সর্ব্বার্থান্ সর্ব্বকর্ম্মসু।
শিবমিচ্ছন্ মনুষ্যাণাং তস্মাদেষঃ শিবঃ স্মৃতঃ ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসোর্লোকে প্রকাশন্তে রুচশ্চ যাঃ।
তাঃ কেশসংজ্ঞিতাস্ত্র্যক্ষে ব্যোমকেশস্ততঃ স্মৃতঃ ॥
কপিশ্রেষ্ঠ ইতি প্রোক্তো ধর্ম্মশ্চবৃষ উচ্যতে।
স দেবদেবো ভগবান্ কীর্ত্ত্যতেঽতো বৃষাকপিঃ ॥'

—৭ পর্ব্ব : ২০১ অধ্যায়—১৩০-১৩১-১৩৪-১৩৬ শ্লোক

'ব্রহ্মাণমিন্দ্রং বরুণং যমং ধনদমেব চ।
নিগৃহ্য হরতে যস্মাত্তস্মাদ্ধর ইতি স্মৃতঃ ॥' —৭ পর্ব্ব : ২০১ অধ্যায়—১৩৭ শ্লোক

শিবের লীলাভূমি শ্মশান মহাভারতীয় বর্ণনায় বাস্তব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে :

'কেশাস্থিকলিলে ভীমে কপালঘটসঙ্কুলে।
গৃধ্রগোমায়ুবহুলে চিতাগ্নিশতসঙ্কুলে ॥
অশুচৌ মাংসকলিলে বসাশোণিতকর্দ্দমে।
বিকীর্ণান্ত্রাস্থিনিচয়ে শিবানাদবিনাদিতে ॥'

—১৩ পর্ব্ব : ১৪১ অধ্যায়—১৪ (

শ্মশানে কেশ, অস্থি, নরকপালপাত্র, শকুনি, শৃগাল, অসংখ্য জ্বলন্ত চিতা, ম চর্ব্বি, রক্ত ও বিচ্ছিন্ন অন্ত্র বিরাজিত। এরূপ ভয়ানক অপবিত্র শ্মশান শৃগা রবে শব্দিত।

পূর্ব্বতন রুদ্র-শিবপরিকল্পনার শিবের প্রাকৃতিক জগতের ও পশুরা অধীশ্বরস্বরূপ বৈশিষ্ট্য মহাভারতে প্রযুক্ত পর্জ্জন্যপতি, ভূতপতি, বৃক্ষপতি, পতি, বনস্পতীনাং পতি, অপাং পতি ইত্যাদি বিশেষণে সংরক্ষিত হয়ে শিবের পশুপতি সংজ্ঞার মহাভারতে একটি ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে :

'সর্ব্বথা যৎ পশূন্ পাতি তৈশ্চ যদ্রমতে পুনঃ।
তেষামধিপতির্যচ্চ তস্মাৎ পশুপতি স্মৃতঃ ॥'

—৭ পর্ব্ব : ২০১ অধ্যায়—১২৩ (

যেহেতু শিব পশুদিগে সর্ব্বতোভাবে পালন করেন, তাদের সঙ্গে বিহার ব ও তিনি তাদের অধিকর্ত্তা, সেহেতু তাঁকে পশুপতি বলা হয়।

শিবের পূর্ব্ব, উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ এই চারিদিকে অভিনিবিষ্ট চা মুখের ক্রিয়াকারিতা এইভাবে বর্ণিত হয়েছে :

'পূর্ব্বেণ বদনেনাহমিন্দ্রত্বমনুশাস্মি হ।
উত্তরেণ ত্বয়া সার্ধং রমাম্যহমনিন্দিতে ॥
পশ্চিমং মে মুখং সৌম্যং সর্ব্বপ্রাণিসুখাবহম্।
দক্ষিণং ভীমসঙ্কাশং রৌদ্রং প্রহরতি প্রজা. ॥'

—১৩ পর্ব্ব : ১৪১ অধ্যায়—৫-৬ (

পূর্ব্বদিকস্থিত মুখ দিয়ে আমি ইন্দ্রত্ব অর্থাৎ দেবতাদের অধিপতিত্ব করে থা হে অনিন্দনীয় পার্ব্বতি! উত্তরের মুখে আমি তোমার সঙ্গে মধুর আলাপ

াকি। আর পশ্চিমদিকস্থিত সৌম্য মুখ সকলপ্রাণীর সুখকর। আমার ক্ষিণদিকস্থিত ভয়ানক রৌদ্র মুখ প্রাণিকুলের সংহারক।

মহাভারতে শিবের করাল ধনুর্ধারী রূপ বিবৃত হয়েছে। পাশুপত অস্ত্র াভের জন্য পর্ব্বতে তপস্যারত অর্জ্জুনের সঙ্গে কিরাতের ছদ্মবেশধারী শিবের ধ যুদ্ধের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা পরবর্ত্তী কালে মহাকবি ভারবিকে তাঁর ামের কাব্য কিরাতার্জ্জুনীয়ম্ লিখতে প্রেরণা দিয়েছে। শিবের ত্রিপুরদাহ-ত্তান্তেও শিবের যোদ্ধরূপ সুস্পষ্ট।[১]

পরম শিবই যে সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব এই তান্ত্রিক সিদ্ধান্তটি মহাভারতে সুস্পষ্ট াষায় উল্লিখিত হয়েছে। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের কাছে শিবস্বরূপ ব্যাখ্যা করছেন:

'আদিরেষ হি ভূতানাং মধ্যমন্তশ্চ ভারত।
বিচেষ্টতে জগচ্চেদং সর্ব্বমস্যৈব চেষ্টয়া॥'

—১০ পর্ব্ব: ১৭ অধ্যায়—৯ শ্লোক

হে ভারত, এই শিব ভূতসমূহের আদিতে অবস্থিত সৃষ্টিকর্ত্তারূপে, মধ্যে বিরাজ-ান পালনকর্ত্তারূপে এবং অন্তে স্থিতিমান সংহারকর্ত্তারূপে। উক্ত শিবেরই ালামাহাত্ম্যে সমস্ত জগতের চেষ্টিত অর্থাৎ লোকব্যবহার স্ফুরিত হয়।[২]

তাছাড়া,

'সর্ব্বা বৈ দেবতা হ্যস্মিন্ গাবো গোষ্ঠ ইবাসতে।...
ভগবান্ কারণং কার্য্যং ক্রিয়া করণমেব চ।
অসতশ্চ সতশ্চৈব তথৈব প্রভবাপ্যয়ৌ॥'

াষ্ঠ যেমন সমস্ত গরুগুলির বিশ্রামভূমি, পরমশিবও তেমনি সমস্ত দেবতাদের ংপত্তিক্ষেত্র, অর্থাৎ এক-একটি মাহেশ্বরী শক্তিই এক-একটি দেবতারূপে

১। 'বিশ্বরূগ্ যত্র গোবিন্দ পৃতনানীস্তথার্জ্জুনঃ।
তত্র কস্য বলং ক্রামেদন্যত্র ত্র্যম্বকাৎ প্রভোঃ॥'

—৭ পর্ব্ব: ৩২ অধ্যায়—১১ শ্লোক

'মহাত্মনা শংকরেণ ত্রিপুরং নিহতং যদা।
তদৈতদস্ত্রং নির্মুক্তং যেন দগ্ধা মহাসুরাঃ॥' —৩ পর্ব্ব: ৪১ অধ্যায়—৩৯ শ্লোক

'প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষোভয়িত্বা স্বতেজসা।
ব্রহ্মাণমসৃজত্তস্মাদ্দেবদেবঃ প্রজাপতিঃ॥' —১৩ পর্ব্ব: ১৪ অধ্যায়—৬ শ্লোক

প্রকাশিত। শিব ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত ভগবান ; কারণ, কার্য্য, ক্রিয়া, ক্রিয়ার সাধকতম করণ সব কিছুই। যা কিছু অসৎ ও যা কিছু সৎ—সবই তাঁর থেকে উৎপন্ন হচ্ছে এবং তাতেই লয় পাচ্ছে।

শিবের এই যুগ্মরূপই মহাভারতের মহাকবির ধ্যেয় :

'ঘোরা চান্যা শিবা চান্যা তে তনূ।' —৭ পর্ব্ব : ২০১ অধ্যায়—১০৭ শ্লোক

হে শিব, তোমার দুই তনু—একটি ঘোরা বা উগ্রা, অন্যটি শিবা বা মঙ্গলকরী

ঘোরতনুবিশিষ্ট শিবই অন্তকারী কাল। মহাভারতের উক্তি :

'কালো হি ভগবান রুদ্রস্তস্য সংবৎসরো ধনুঃ।
তস্মাদ্রৌদ্রী কালরাত্রির্জ্যা কৃতা ধনুষোঽজরা॥'

—৮ পর্ব্ব : ৩৪ অধ্যায়—৩৭ শ্লো

ষড়ৈশ্বর্য্যযুক্ত ভগবান রুদ্র-শিবই কাল। সংবৎসর তাঁর ধনু। কালরাত্রি সে রুদ্র সম্বন্ধীয় ধনুর ক্ষয়রহিত জ্যা।

কালের তন্ত্র-প্রতিপাদিত জগৎ-সংহারকরূপ মহাভারতে সুস্পষ্ট :

'স রুদ্রঃ সংহরন্ কৃৎস্নং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্॥
কালো ভূত্বা মহাতেজাঃ সংবর্ত্তক ইবানলঃ।
যুগান্তে সর্ব্বভূতানি গ্রসন্নিব ব্যবস্থিতঃ॥
এষ দেবো মহাদেবো জগৎ সৃষ্ট্বা চরাচরম্।
কল্পান্তে চৈব সর্ব্বেষাং স্মৃতিমাক্ষিপ্য তিষ্ঠতি॥'

সেই রুদ্র-শিব স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎকে সংহার করেন। যুগের শে শিব কালরূপ ধারণ করে মহাশক্তিবিশিষ্ট সংবর্ত্তক অগ্নির মতো সম ভূতসমূহকে যেন গ্রাস করে বিরাজিত থাকেন। এই মহাপ্রকাশশালী দেব চরাচর সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করে যুগান্তে তাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত করে থাকেন।

তন্ত্র-প্রতিপাদিত শিবশক্তির যামলতত্ত্ব মহাভারতের প্রণতিতে স্পষ্ট :

'নমঃ শ্যামায় গৌরায়, অর্দ্ধপীতার্দ্ধপাণ্ডবে।
নারীনরশরীরায় স্ত্রীপুংসায় নমোঽস্তুতে॥
মণিভূষিতমূর্দ্ধায় নমশ্চন্দ্রার্দ্ধভূষিণে।
......স্ত্রীপুংসায় স্ত্রীরূপধরায়...... ।'

—১৩ পর্ব্ব : ১৪ অধ্যায়—২৯৮, ৩০২, ৩০৮, ৩১০ শ্

নীলকণ্ঠ হিসাবে শ্যামবর্ণ, পার্ব্বতী হিসাবে গৌরবর্ণ, শিব হিসাবে শুভ্রবর্ণ, পার্ব্বতী হিসাবে পীতবর্ণ, অর্দ্ধশিব, অর্দ্ধশক্তি, একাধারে পুরুষ ও নারী, মস্তকের একার্দ্ধে মণিভূষণবিশিষ্ট, অন্যার্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট, শিবশক্তিস্বরূপ হ'লেও শক্তিরূপে প্রকাশমান অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবকে নমস্কার।

রুদ্র-শিবের ঘোরা ও শিবা তনু তাঁর ধ্যানমন্ত্রে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে :

ধ্যানমন্ত্রে শিবরূপ

'মহাকালং যজেৎ দেব্যা দক্ষিণে ধূম্রবর্ণকম্।
বিভ্রতং দণ্ডখট্বাঙ্গৌ দংষ্ট্রাভীমমুখং শিশুম্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃতকটিং তুন্দিলং রক্তবাসসম্॥
ত্রিনেত্রমূর্দ্ধকেশঞ্চ মুণ্ডমালাবিভূষিতম্।
জটাভারলসচ্চন্দ্রখণ্ডমুগ্রং জ্বলন্নিভম্॥'

—দক্ষিণাকালিকার মহাকালভৈরবের ধ্যান

দেবী দক্ষিণাকালিকার দক্ষিণে মহাকালভৈরবের যজনা করবে। তাঁর বর্ণ ধূম্রের মতো, তিনি দণ্ড ও খট্বাঙ্গ ধারণ করে আছেন, তাঁর মুখবিবর দন্তের দ্বারা করাল, তিনি শিশুর মতো ব্যবহাররত, তাঁর কটিদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত, তিনি আয়তনে স্থূল, তাঁর অঙ্গাচ্ছাদন বস্ত্র রক্তবর্ণ, তাঁর তিনটি চক্ষু, তাঁর কেশ উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, তিনি মুণ্ডমালা ধারণ করে আছেন, তাঁর জটাকলাপের উপর অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত, তিনি উগ্রস্বভাব ও তিনি অগ্নির মতো দীপ্যমান।

এই তাঁর প্রলয়ঙ্কর রুদ্ররূপ। তাঁর শিবরূপের ধ্যান :

'ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।
পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥'

সর্ব্বদা মহেশ্বরকে এইভাবে ধ্যান করবে—তিনি রৌপ্য পর্ব্বতের মতো শুভ্রবর্ণ, তাঁর মাথায় সুদর্শন অর্দ্ধচন্দ্রের মুকুট, রত্নময় আভরণে তাঁর দেহ উজ্জ্বল, তিনি চার হাতে কুঠার, মৃগমুদ্রা, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা ধরে আছেন, তিনি সৌম্যমূর্ত্তি। তিনি পদ্মের উপর উপবিষ্ট, দেবতারা চারদিক থেকে তাঁর স্তব করছেন, পরিধানে তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম্ম, তিনি বিশ্বের আদিপুরুষ, তিনি বিশ্বের পরমকারণ,

তিনি বিশ্ববাসীকে যাবতীয় ভয় থেকে ত্রাণ করেন। তাঁর পাঁচটি মুখ ও প্রতি মুখে তিনটি করে চক্ষু রয়েছে।[১]

মঙ্গলকাব্যে শিবরূপ

মঙ্গলকাব্যে দেবাদিদেব মহাদেবের পরমব্যক্তিত্ব-ভাস্বর ষড়ৈশ্বর্য্যমণ্ডিত ক্ষেমঙ্কর রূপটিই স্তবস্তুতিতে চিত্রিত হয়েছে :

'অভক্তি তোমার পদে বিপদ নিদান।
ব্রহ্মার তনয় দক্ষ তাহাতে প্রমাণ॥
কালকূট পান করি মৃত্যু কৈলে জয়।
যে জন শঙ্কর ভজে তার কোথা ভয়॥
তোমার চরণে যার আছয়ে ভকতি।
ত্রিভুবন জিনে সেহ অন্তেতে মুকতি॥
জন্ম-জরা-মৃত্যু-শোক-দৈন্যরূপী দোষ।
তাবৎ যাবৎ নহে তোমার সন্তোষ॥'

—মুকুন্দরাম : চণ্ডীমঙ্গল—ইন্দ্র কর্তৃক শিবের স্তব

মঙ্গলকাব্যের শিবায়ন অংশে শিবের যে চিত্র ফুটেছে, তাতে শিব একাধারে দেবতা ও মানব। দেবতা হিসাবে—

'অণিমা লঘিমা আদি যার অষ্টসিদ্ধি।
যাহার ষোড়শ অংশ না ধরিলা বিধি॥

১। শিবরূপের অন্য ধ্যান :

'মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিস্ত্র্যক্ষৈরঞ্জিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দু-কোটিপ্রভম্।
শূলং টঙ্ককৃপাণবজ্রদহনান্নাগেন্দ্রঘন্টাঙ্কুশান্ পাশং ভীতিহরং দধানমমিতাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে॥'

অর্দ্ধনারীশ্বর শিবরূপ :

'বন্ধূকাভং ত্রিনেত্রং শশিশকলধরং স্মেরবক্ত্রং বহন্তং হস্তৈঃ শূলং কপালং বরদমভয়দং-চারুহাসং নমামি।
বামোরুস্তম্ভগায়াঃ করতলবিলসচ্চারুরক্তোৎপলায়াঃ হস্তেনাশ্লিষ্টদেহং মণিময়বিলস-ভূষণায়াঃ প্রিয়ায়াঃ॥
বন্দে সিন্দুরবর্ণং মণিমুকুটলসচ্চারুচন্দ্রাবতংসং ভালোদ্যন্নেত্রমীশং স্মিতমুখকমলং দিব্য-ভূষাঙ্গরাগম্।
বামোরুন্যস্তপাণেররুণকুবলয়ং সংদধত্যাঃ প্রিয়ায়াঃ বৃত্তোত্তুঙ্গস্তনাগ্রে নিহিতকরতলং বেদটঙ্কেষ্টহস্তম্॥'

ত্রিভুবন রক্ষিলা করিয়া বিষপান।
মৃত্যুঞ্জয় বিনে বর কেবা আছে আন॥
ব্রহ্মা যার বাঞ্ছিত করেন পদধূলি।
ইন্দ্র আদি দেব যারে করে কৃতাঞ্জলি॥'

—মুকুন্দরাম: চণ্ডীমঙ্গল—হরগৌরীর কথোপকথন

মানুষরূপে তিনি যখন ভিক্ষোপজীবী তখন—

'হাতে শোভে লাউ থাল গলেতে হাড়ের মাল
আনন্দে ভ্রময়ে পঞ্চানন॥'

আর তাঁর ভিক্ষাও অতিবাস্তব ভিক্ষা—

'ফিরয়ে উজান-ভাটি চৌদিকে কোচের পটী
কোচ বধূ ভিক্ষা দেয় থালে।
থালা হইতে চালগুলি পুরিয়া রাখেন ঝুলি
কান্ধেতে লম্বিত ঝুলি দোলে॥
কেহ দেয় চাল কড়ি কেহ দেয় ডাল বড়ি
কূপী ভরি তৈল দেয় তেলী।
লবণিয়া দেয় লোণ ঘৃত দধি গোপগণ
বেন্যা দেয় ভাঙ্গের পুটুলী॥
ময়রা মোদক দেই সূত্রধর সূত্র দেই
তাম্বূলীতে দেয় গুয়া পান।'

এবং ভিক্ষান্তে গৃহপ্রত্যাবর্ত্তনের পরও আমরা নিখুঁত গৃহস্থালীরই চিত্র পাই:

'বেলা হৈলা দুই প্রহর মহাদেব আইলা ঘর
কার্ত্তিক গণেশ আগুয়ান॥
মহেশ ঝাড়েন ঝুলি চাল পাইল কতগুলি
নানা দ্রব্য রাখে নানা ঠাঁইয়ে।
দেখিয়া মোদক খই দুজনে আইলা ধাই
কন্দল লাগিল দুই ভাইয়ে॥
দুজনে প্রবোধ করি বাটিয়া দিলেন গৌরী
রান্ধিলেন আপনি ভবানী।

ভোজন করিলা হর গৌরী গুহ লম্বোদর
সুখে সবে বঞ্চিলা রজনী ॥'

মুকুন্দরাম : চণ্ডীমঙ্গল—শঙ্করের ভিক্ষা[১]

১। রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবসংকীর্ত্তনে শিবের ভিক্ষাবৃত্তির বিস্তৃততর বর্ণনা পাওয়া যায় :

'বন্ধু সিন্ধু-সুতা-পতি ভৃত্য সুরনাথ।
অষ্টসিদ্ধি করে আছে, ঘরে নাই ভাত ॥ ২০৬
কহে দ্বিজ রামেশ্বর শুন সাধু জীব।
হিরণ্যগর্ভের ভাই ভিক্ষা মাগে শিব ॥ ২০৭
ভ্রূকুটি করিয়া ভাল ভাল ভূমিতলে।
ভবন ভবন ভিক্ষা দেহি দেহি বলে ॥ ২০৮
শুনিয়া শিবের শব্দ সীমন্তিনীগণ।
দেখ্যা করে দিগম্বর দিয়া নানাধন ॥ ২০৯
কেহ দেই চালকড়ি কেহ দেই ডালি।
কেহ আমন্ত্রণ করে আস্য আস্য কালি ॥ ২১০
চন্দ্রচূড় চলে অঙ্গীকার করি তাকে।
রহ রহ করা৷ কেহ কির‍্যা দিয়া বাখে ॥ ২১১
বৃষে চড়্যা যায় বুড়্যা নাই মানে কির‍্যা।
গোড়াইল হয়ে কেহ ঘরে আইল ফির‍্যা ॥ ২১২
বেষ্টিত বালকবৃন্দ তরুণ তরুণী।
নাচ্যা গায়্যা ঘরে ঘরে ফিরে শূলপাণি ॥ ২১৩
হয়ে বেড়ি হুলাহুলি হইলেক লোকে।
হরষিতে হারধ্বান সবাকার মুখে ॥ ২১৪
করতালি করি কোন কৈলাসেতে নেই।
এক ভিখ আস্যা তারে তিনবারে দেই ॥ ২১৫
বাটী বাটী টাঠি টাঠি মুঠি মুঠি কর‍্যা।
গুলি গুলি দিতে দিতে ঝুলি আন্যা পুর‍্যা ॥ ২১৬
তখন গোবিন্দ গাইয়া গোয়ালার ঘরে।
গব্য দিল গৌরী গুহ গণেশের তরে ॥ ২১৭
চাষা দিল শশা ফুটি আলু শাক কচু।
করলা কুমড়া কচি কাচকলা কিছু ॥ ২১৮
মোদকের মন্দিরে মহেশ তোলে তোলা।
নাড়ু মুড়ি মুড়কি সোনামতি ছোলা ॥ ২১৯
... ...
... ...
বাজান বিষাণ বুড়া বাড়ীর নিকটে।
শুনে গৌরীগৃহে গুহ গজানন ছুটে ॥ ২৩২

শিবের এই ভিক্ষোপজীবী রূপের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে রয়েছে শিবের যোগীরূপ। দ্বিজ মাধবের মঙ্গলচণ্ডীর গীতে শিব নীলাম্বরকে যে মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞান শিক্ষা দেন, তাও আসলে যোগসাধনার ইঙ্গিত :

'হৃদিপদ্মে বসি হংসে করে নানা কেলি।
কর্ম্মযোগে জানি করে পিণ্ডের বলাবলী॥
কর্ম্মযোগে বহু যোগ আর নাহি আটে।
সে সব কারণ কহি বৈসয় নিকটে॥
শুন শুন কহি তত্ত্ব অয়ে নীলাম্বর।
আপনা শরীর চিন্ত হইতে অমর॥
সুষুম্না প্রধান নাড়ী শরীর মধ্যে বৈসে।
ইঙ্গলা পিঙ্গলা তার বৈসে দুই পাশে॥

বালকে বারণ করে বিশাললোচনী।
কৈর নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি॥ ২৩৩
অন্ত বাছা ভব্য হও সব্য চক্ষু নাচে।
তব বাপ আল্যে দিব বাট্যা থাক কাছে॥ ২৩৪
ক্ষুধিত তনয় সে বিনয় নাহি শুনে।
ধায়্যা গিয়া পথে তাতে আগুলিল গণে॥ ২৩৫
হরমুখ হেরি হাসে নাচে একপায়।
শূলী দিল ঝুলি দোঁহে লুটা কর্য্যা খায়॥ ২৩৬
আঁঠু পাতি কাড়াকাড়ি করে দুই ভাই।
হুড়াহুড়ি হত্যে হত্যে হল্য হাতাতাই॥ ২৩৭
দুটা হাতে দুটা ধরে দুটা হাতে খায়।
শুণ্ডে তার তুণ্ড আচ্ছাদিল গণরায়॥ ২৩৮
চারি হাতে ধরে মুঠা গিলে গজমুখে।
কার্ত্তিক কান্দেন করাঘাত কর্য্যা বুকে॥ ২৩৯
দুর্গা দেখ্যা বলে ডাক্যা শুন গজানন।
কার্ত্তিকের করে কিছু দাও বাছাধন॥ ২৪০
বিনয় মায়ের বুঝ্যা বিনায়ক শূর।
কিছু দিল কার্ত্তিকে কোন্দল হৈল দূর॥ ২৪১
আলুথালু থলি চালু চন্দ্রচূড় হাসে।
শৈলসুতা আস্তা সব সম্বরিল শেষে॥ ২৪২
আশ্রমে চলিলা চণ্ডী পতিপুত্র লয়্যা।
রামেশ্বর রচে হরপদার্পিত হয়্যা॥' ২৪৩

—রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবসংকীর্ত্তন : শিবের ভিক্ষাবৃত্তি ও কার্ত্তিকগণেশের কলহ

জোয়ার ভাটি বহে তাতে অতি খরসান।
ভাটি বন্দী করিয়া জোয়ারে দিব টান ॥
সে জোয়ারে ঠেকি হংস হইব সুস্থির।
কায়াপিণ্ডে হইব দেখা নিশ্চল শরীর ॥
শিরে সহস্রদল পদ্ম বাহি তার তত্ত্ব।
অধোমুখে থাকি কমল বরিখে অমৃত ॥
সে অমৃত রহে ভাল পুরুষের স্থান।
নহি টলিবেক পথ সুস্থির পরাণ ॥
মেরুদণ্ডে ভর করি করিবেক ধ্যান।
নবদ্বার বন্দী কৈলে জিনিবা শমন ॥
হরের চরণ দ্বিজ মাধবে গায়ে।
কমলে ভ্রমর মধু অবিরত পায়ে ॥'

দ্বিজ মাধবের এই বর্ণনা আনন্দ-লহরী-বিবৃত ষট্‌চক্রভেদান্তে শিবশক্তি-সামরস্য-অবস্থাটিকেই স্মরণ করিয়ে দেয় :

'মহীং মূলাধারে কমপি মণিপুরে হুতবহং
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি।
মনোঽপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্ত্বা কুলপথং
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসে ॥'

—আনন্দলহরী : ৯ শ্লোক

হে ভগবতি! তুমি মূলাধারচক্রস্থিত পৃথিবীতত্ত্ব, মণিপুরচক্রস্থিত জলতত্ত্ব ও বহ্নিতত্ত্ব, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত শুধু বহ্নিতত্ত্ব, হৃদয়ে অর্থাৎ অনাহতচক্রে অবস্থিত বায়ুতত্ত্ব, বিশুদ্ধচক্রে অবস্থিত আকাশতত্ত্ব, ভ্রূমধ্য অর্থাৎ আজ্ঞাচক্রে অবস্থিত মনস্তত্ত্ব ও আকাশতত্ত্ব—সকল কুলপথ (সুষুম্না) ভেদ করে সহস্রদল পদ্মে পতি পরমশিবের সঙ্গে একান্তে বিহার কর।

শিবের এই ভিক্ষোপজীবী যোগীরূপ ভারতচন্দ্রের অন্নপূর্ণামঙ্গলে নূতনভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছে। শক্তিদর্শনে যেমন শৈবী লীলার চেয়ে শক্তি লীলার উপরেই অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, অন্নপূর্ণামঙ্গলেও তেমনি অন্নদাত্রী আদ্যাশক্তির মহিমাই প্রধান, শিবমাহাত্ম্য এখানে গৌণ স্থান অধিকার করে

আছে। তান্ত্রিক সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে অন্নপূর্ণামঙ্গলে শক্তির স্তুতি করা হয়েছে :

'বাক্যাতীত গুণ তব, বাক্যে কত কব।
শক্তিযোগে শিবসংজ্ঞা, শক্তিলোপে শব ॥'

অন্নপূর্ণামঙ্গলে পরমান্নের জন্য অন্নপূর্ণার কাছে বিশ্বনাথের আকুল আকুতি শিবশক্তির এই অখণ্ড রূপটিকেই সুস্পষ্ট করেছে :

'বেলা হৈল অন্নপূর্ণা বান্ধ বাড় গিয়া
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া।
তোমার অন্নের বলে
অত্যাবধি আছে গলে
কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।
একহাতে পানপাত্র
আর হাতে হাতামাত্র
দিতে পার চতুর্ব্বর্গ ঈষৎ হাসিয়া।
তুমি অন্ন দেহ যারে
অমৃত কি মিঠা তারে
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া।
পারশিয়া অন্নসুধা
ভারতের হর ক্ষুধা
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া।'

শিবায়নে শিব

ঋগ্বেদীয় রাত্রিসূক্তের বৃক্ষলতাগুল্মাদির চৈতন্যবিধায়িনী ভুবনেশ্বরী রাত্রিদেবীর পতি, পুরুষসূক্তের আরণ্য ও গ্রাম্য পশুর অধিষ্ঠাতা সহস্রশীর্ষা পুরুষ, শুক্লযজুর্ব্বেদের 'ক্ষেত্রাণাং বৃক্ষানাম্ ওষধীনাম্ অরণ্যানাং' অধিপতি ত্র্যম্বক, মহাভারতের পর্জ্জন্যপতি, ভূতপতি, বৃক্ষপতি, 'গবাংপতি, বনস্পতীনাং পতি, অপাং পতি' পশুপতি বাংলা সাহিত্যে কৃষিজীবী শিবে পরিণত হয়েছেন।

যদিও রামেশ্বর তাঁর শিবসংকীর্ত্তনে পার্ব্বতীর মুখ দিয়ে নিম্নমতো শিব-মহিমা কীর্ত্তন করিয়েছেন :

'কুশলার্থে কৃতার্থ করেন কৃপানিধি।
বিভু ব্রহ্ম বিশ্ববীজ বিধাতার বিধি॥ ৬৪৭
চন্দ্রচূড় বিনা চিরজীবী নাহি কেহ।
কাল পায়্যা মরেন ধরেন যত দেহ॥ ৬৪৮
অন্য দেবের দেব শিব জানে নাই যারা।
পণ্ডিতের পাশে কভু বৈসে নাই তারা॥ ৬৪৯
মুক্তিদাতা মাধব মুক্তির মূল জ্ঞান।
জ্ঞানদাতা গঙ্গাধর গুরুরূপে ধ্যান॥ ৬৫০
শৈব শাক্ত বৈষ্ণব সবার সেব্য শিব।
গঙ্গাধরে ঘৃণা করে গুরুদ্রোহী জীব॥ ৬৫১
.. ..
শুদ্ধসত্ত্ব শিবমূর্ত্তি সদানন্দময়।
ঈশ্বর অজরামর অক্ষয় অব্যয়॥ ৬৫৩
অনাদি পুরুষ শিব ব্রহ্মতত্ত্বময়।
শিবসম সুখলেশ সুরে নাই আর॥ ৬৫৪
শিব হৈতে সকল সকলে সদাশিব।
ব্যক্ত দেখ সুবুদ্ধি বুদ্ধি দেয় জীব॥ ৬৫৫
... ...
বাণে কর দিয়া বাণেশ্বর অভিধান।
লোকগুরু কল্পতরু প্রভু ত্রিনয়ন॥ ৬৬০
অমঙ্গলশীল কিন্তু মঙ্গলের মূল।
সেজন সুকৃতি শিব যারে অনুকূল॥ ৬৬১
.. ..
.. ..
মহাপ্রলয়ের কালে হৈল সর্ব্বনাশ।
শিব বিনা কার কোথা নাহি গন্ধবাস॥ ৬৬৫
সেই পরাৎপর যেই সর্ব্বকাল রয়।
মহারুদ্র বলে কেহ মহাবিষ্ণু কয়॥ ৬৬৬

অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি যার করতল।
শুভদাতা সেই শিব সেবক বৎসল ॥' ৬৬৭

—রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য : শিবসংকীর্ত্তন, শিবমহিমাকীর্ত্তন

তথাপি শিবের দারিদ্র্যকে কেন্দ্র করে সেই পার্ব্বতীকে দিয়েই আবার রামেশ্বর শিবের চাষের বিবরণের উপোদ্ঘাত রচনা করিয়েছেন—

'পর্ব্বতপুত্রিকা পুনঃ পাতিল জঞ্জাল।'

'শিবে বলে সেই যে সম্পত্তি দিয়াছিলে।
মনে কর মহাপ্রভু কতকাল খাল্যে ॥ ২০৮৫
গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে।
ফেল্যা দিয়া পুরুষ পাসরে সে কি জানে ॥ ২০৮৬
পুণ্যবান লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী।
উত্তম উদ্‌যোগ কর‍্যা উথলায় গারি ॥ ২০৮৭
অভাগার ঘরে আসে অলক্ষণা মায়্যা।
শতকের গারি দেয় পঞ্চাশে উড়ায়্যা ॥ ২০৮৮
লঙ্কার বাণিজ্য যদি আন্যা দেই ঘরে।
মায়্যা হল্যে উড়ুই উড়ায় আঁখি ঠারে ॥ ২০৮৯
চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন।
নহে দাসদাসী আদি ছাড় পরিজন ॥ ২০৯০
চরণে ধরিয়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়ে সাধে।
নরমে গরমে কয় ভয় নাই বাধে ॥' ২০৯১

—রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য : চাষের বিবরণ

গুণবতী পত্নীর স্বপরামর্শে শিব চাষ করতে মনস্থ করে সর্ব্বপ্রথম ইন্দ্রের কাছ থেকে চাষ ভূমির পাট্টা নিলেন। পরে চাষের সজ্জা প্রস্তুত করে কুবেরের নিকট হতে বীজধান সংগ্রহ করে আনলেন। মাঘ মাসে প্রচুর বারিপাত হ'ল। চৈত্র মাসের মধ্যে শিবের জমিতে কারকিতের কাজ শেষ হ'ল। বৈশাখ মাসে জমিতে বীজ বপন করা হ'ল। শিবের জমিতে প্রচুর ফসল ফললো। নারদের দেওয়া ঢেঁকিতে শিবের অনুচর ধান ভেনে প্রভূত চাল উৎপাদন করলে। এইভাবে শিব-পার্ব্বতীর দারিদ্র্য-দুঃখময় জীবন সুখে পূর্ণ হ'ল।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের এই কৃষক শিবের পরিকল্পনা কবিবর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় নবরূপ লাভ করেছে। সেখানে শিব শুধু কৃষিজীবী নন, তিনি কৃষিজীবীদের অধিষ্ঠাতা প্রেরণাদাতা পরমপ্রিয় দেবতা।

'বহুদিন গত চৈত্তিগাজন
মেঘে মাঠে আজ অম্বুবাচন,
থামাও তোমার পাগুলে নাচন
বেঁধে নাও জটাজুট।
হাতের ত্রিশূল হাঁটুতে ভাঙ্গিয়া
প্রলয়শালায় রাঙ্গিয়া পিটিয়া,
গড়ে নাও ফাল হয়েছে সকাল
ধরো লাঙ্গলের মুঠ॥
আমাদের সাথে চলগো ঠাকুর
ঐ নাচে পোড়া মাঠে।
দুই হাতে চেপে চালাও লাঙ্গল
পাথরও যেন গো ফাটে॥
শঙ্কর হও সঙ্কর্ষণ
মাটিছোঁয়া মেঘে নামে বর্ষণ
শস্যশ্যামল করো ধরাতল
বাঁচুক অন্নপূর্ণা॥' —ত্রিযামা

কিন্তু রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবসংকীর্ত্তনে কৃষক শিবের পাশাপাশি আমরা নারী-লোলুপ শিবের চিত্রও পেয়ে থাকি।

'কোঁচের নগরে হর করিল প্রবেশ।
ধরিল মন্মথ-মথ মন্মথের বেশ॥ ৮৮৮
... ...
ধাইল কোঁচিনী শুনি বিষাণ ঘোষণা।
মুকুন্দ মুরলী রবে যেন গোপাঙ্গনা॥ ৮৯৪
কেহ কার নহে টুটা সবে রূপরাশি।
ইন্দুমুখে বিন্দু ঘর্ম্ম মন্দ মন্দ হাসি॥ ৮৯৫

খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অঞ্জনরঞ্জিত।
কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটি মুরছিত ॥ ৮৯৬
বল্লকী বিশেষ ভাষা নাসা তিলফুল।
কুচকুম্ভ কদম্ব কোরক সমতুল ॥ ৮৯৭
দন্তাবলি কুন্দকলি ওষ্ঠ পক্ক বিম্ব।
ডমরু জিনিয়া মাঝ্যা ডাগর নিতম্ব ॥ ৮৯৮
উন্নত যৌবন যুব জীবনের চোর।
অঙ্গ অঙ্গ অনঙ্গ তরঙ্গ ঘন ঘোর ॥ ৮৯৯
যাহার দেহের দীপ্তি উত্তাপ রবির।
অত্যাবধি তরাসে বিদ্যুৎ নহে স্থির ॥ ৯০০
মুখবিধু দেখ্যা বিধি বিধু কর্‌্যা ক্ষয়।
পুনঃ পুনঃ গঠে তবু তনু নাহি হয় ॥ ৯০১
এমত যুবতিগণ পাইয়া চন্দ্রচূড়।
বেড়িয়া বিহার করে পরম নিগূঢ় ॥ ৯০২
কেহ নাচে কেহ গায় কেহ বায় যন্ত্র।
কেহ করতালি দেই সবে এক তন্ত্র ॥ ৯০৩
কোঁচিনী সকল হইল কুসুম উদ্যান।
শঙ্কর ভ্রমর তায় মধু করে পান ॥ ৯০৪'

উপরি-উদ্ধৃত অংশটিতে নারীরূপ-বর্ণনায় অলঙ্কারপ্রয়োগে কবি রামেশ্বর কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। স্কন্দপুরাণে (মহেশ্বরখণ্ড, কেদারখণ্ড, ৬ অধ্যায়) দেখা যায় যে, ঋষিপত্নীগণ দিগম্বর শিবের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করছেন। সুতরাং শিবের নারী-লোলুপতা বর্ণনায় রামেশ্বর যে খুব অন্যায় কাজ করেছেন, তা বলা যায় না। তাছাড়া, শিবচরিত্র এত সমুন্নত যে, সেই প্রসঙ্গে লোকসমাজে হেয় বলে পরিগণিত কোন চরিত্রবৈশিষ্ট্য বর্ণিত হ'লেও সেই চরিত্রের অভ্রভেদী সমুন্নতিকে কলুষিত করা দূরের কথা, তাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে পারে না। এই কারণেই কুমারসম্ভবের মতো কাব্যেও মহাকবি কালিদাসের অমর লেখনী হরপার্ব্বতীর সম্ভোগশৃঙ্গারের চিত্র অঙ্কিত করতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। অনুরূপ কারণে মহাকবি মধুসূদনও তাঁর মেঘনাদবধ

১৮

কাব্যে মোহিনী পার্ব্বতীর সমক্ষে মহাদেবের শৃঙ্গারবেশ বর্ণনা করে কোন বিকৃত রুচির পরিচয় দেন নাই।

'আদরে ঈশান,
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন আসনে
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল, মকরন্দ লোভে,
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইলা ধাইয়া,
বহিল মলয়বায়ু, গাইল কোকিল,
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে! উমার উরসে
কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে
ইহা হতে! কুসুমেষু, বসি কুতূহলে
হানিলা কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে
শরজাল,—প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী!
লজ্জাবেশে রাহু আসি গ্রাসিল চাঁদেরে,
হাসি ভস্মে লুকাইলা দেব বিভাবসু!'

—মেঘনাদবধ কাব্য : দ্বিতীয় সর্গ

শাক্ত পদাবলীর শিব

শাক্ত পদাবলীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি সাধক রামপ্রসাদের পদে শিবের ঘোর ও অঘোর তনু যুগপৎ পরিস্ফুট হয়েছে :

'হর ফিরে মাতিয়া, শঙ্কর ফিরে মাতিয়া,
শিঙ্গা করিছে ভোঁ ভোঁ ভোঁ বমম্ বমম্,
বব বম্ বব বম্ গাল বাজিয়া॥
মগন হইয়া প্রমথনাথ, ঘটক ডমরু লইয়া হাত,
কোটি কোটি কোটি দানবসাথ শ্মশানে ফিরিছে গাইয়া।
কটীতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় দোলিছে হাড়ের মাল,
নাগ যজ্ঞোপবীত ভাল, গরজে গরব মানিয়া॥'

শিঙ্গা-ডমরু-পাণি শ্মশানচারী কৃত্তিবাস অস্থি-ভূষণ নাগযজ্ঞোপবীতধারী পাগল শিব প্রমথেশের এই রৌদ্ররূপের পাশেই আছে তার শান্তরূপ :

'শশধরকলা ভালে শোভে, নয়ন চকোর অমিয় লোভে
স্থির গতি অতি মনের ক্ষোভে, কেমনে পাইব ভাবিয়া।
আধ চাঁদ কিবা করে চিকিমিকি,
নয়নে অনল ধিকি ধিকি ধিকি,
প্রজ্বলিত হয় থাকি থাকি থাকি, দেখে রিপু যায় ভাগিয়া॥'

এই প্রলয়ঙ্কর ভয়ানক অথচ রিপুদমনকারী শান্ত শিব এক অপূর্ব্ব আত্মানন্দে ভোর সচ্চিৎ তত্ত্ব :

'বিভূতি ভূষণ মোহন বেশ, তরুণ অরুণ অধর দেশ।
শব আভরণ গলায় শেষ, দেবের দেব যোগিয়া॥
বৃষভ চলিছে খিমিকি খিমিকি, বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি।
ধরত তাল দ্রিম্‌কি দ্রিম্‌কি, হরিগুণে হর নাচিয়া॥
বদন ইন্দু ঢল ঢলা ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টলা টল।
লহরি উঠিছে কল কল কল, জটাজূট মাঝে থাকিয়া॥
প্রসাদ কহিছে এ ভব ঘোর, শিয়রে শমন করিছে জোর।
কাটিতে পারিনু করম ডোর, নিজগুণে লহ ভাবিয়া॥'

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কবি রামপ্রসাদ—পৃঃ ৩৫৮

সাধক কবি কমলাকান্তের—

'মন্মথমথনং ভূতেশং সদা, শশিশেখরং ভজে।
ত্রিগুণাকরং ত্রিলোচনসুন্দরং হরং,
গঙ্গাধরং গুরুং গিরিজাবরং ভজে॥
কমলাকান্ত ত্রিতাপবিনাশনং,
বৃষভাসনং, বিভুং শিবশঙ্করং ভজে॥'

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কমলাকান্ত—পৃঃ ১৮৮

এই বন্দনাগীতিতে শিবের শান্তরূপের এবং

'ভৈরোঁ আইল, মায়া পলাইল,
ত্রিশূল ডমরু হাতে।
ঘোরদল পরদল, ভৈগেল সমফল,
মিলিব জননীর সাতে॥

ভৈরোঁ বালা, জগমন আলা
নরশিরমালা সোহে।
সঙ্কট বঙ্কট, বিকট কপট লট,
পরশু দেখাইল মোহে॥
জটাজূট আর, সিন্দূর ভালে,
বম্ বম্ গান বাজাইল।
তাকর পিছে, অম্বা নাচে,
কমল অমলপদ পাইল॥'

—সাধক কমলাকান্ত, ঐ

এই বর্ণনায় ত্রিশূল-ডমরুধারী জটাজূট-শোভিত রুদ্ররূপের বিবৃতি পরিস্ফুট হ'লেও, আসলে তিনি ধ্যান করেছেন শান্তরুদ্ররূপাতীত নিরঞ্জন শিবতত্ত্বকে যিনি তমসার পারে অবস্থিত জ্যোতির্ম্ময় মহান পুরুষ, যাঁকে জানলে মৃত্যুসরণি অতিক্রম করে অমৃতত্ব লাভ করা যায় এবং যাঁর জ্ঞান ছাড়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়'। তাই কমলাকান্তের কাছে শিব—

'যোগী শঙ্কর আদি মহেশ।
পুরুষ পুরুষ-প্রধান ত্রিলোকবাস॥
ত্রিপুরদহন ত্রিনয়ন বিঘ্ননেশ।
ত্রৈলোক্যপাবন ত্রিকাল ত্রিপুরেশ॥
কমলাকান্ত ত্রিতাপবিনাশ।
দাতা দিগম্বর, ভো! আশুতোষ॥' —সাধক কমলাকান্ত

শাক্ত পদাবলীর শিব মূলতঃ যোগীশ্বর, তাই লৌকিক দৃষ্টিতে অকিঞ্চন। এইজন্যই শিবের সঙ্গে শক্তির নিরন্তর দাম্পত্য কলহ। সাধক কবি রামপ্রসাদ তাঁর মতো দরিদ্র মানুষকে জগজ্জননী কেন সংসারী করলেন তার জন্য অনুযোগ প্রকাশের মাধ্যমে অকিঞ্চন শিবের কলহান্তরিতা শক্তির রূপটিকেই মানবায়িত করেছেন:

'আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী॥

অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই, সংসার সবারি।
ওমা তুমিও কোন্দল করেছ, বলিয়ে শিব ভিখারী॥'
—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কবি রামপ্রসাদ—পৃঃ ২৯০

অন্যত্র শিবকে লক্ষ্য করে দারিদ্র্য ও শক্তির এই কলহপরায়ণতার চিত্রই প্রকটিত হয়েছে :

'তার কি বাপের সাধ্য আছে তারা, দশ হাতে খাওয়াতে পারে॥
সদাই বাক্য জ্বালা তারা, দিস্ কেন তুই মোর বাপেরে।'
—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ৩০৯

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় শিবের ভৈক্ষচর্য্যের চিত্র অতিবাস্তব :

'সারাদিন ঘরে ঘরে, ভোলানাথ ভিক্ষা করে,
যথাকালে খায় হলে দিবা অবসান॥
তাহে কি উদর ভরে, পেটের জ্বালায় মরে,
সন্ধ্যাকালে বসে করে, সিদ্ধিরস পান॥'
—ক. বি. শা. প. : আগমনী

শিবের এই দারিদ্র্যকে কেন্দ্র করে উমা-জননী মেনকার নারীহৃদয়ের আকুল আর্তি গিরিশচন্দ্রের লেখনীতে জ্বালাময় রূপ লাভ করেছে :

'ওমা কেমন করে পরের ঘরে,
ছিলি উমা, বল মা তাই।
কত লোকে কত বলে,
শুনে ভেবে মরে যাই।
মার প্রাণে কি ধৈর্য্য ধরে,
জামাই নাকি ভিক্ষা করে।
এবার নিতে এলে, বলবো—হরে,
উমা আমার ঘরে নাই॥' —ঐ

শাক্ত পদাবলীতে শিবের সবচেয়ে বিস্ময়কর যে রূপটি ফুটেছে, তা হ'ল তাঁর নায়করূপ। গিরিরাজ হিমালয় যখন কৈলাসে এসে উমাকে বললেন,

নায়ক শিব

'চল্ মা, চল মা গৌরী, গিরিপুরী শূন্যাগার।
মা হলে জানিতে উমা, মমতা পিতামাতার ॥
তব মুখামৃত বিনে, আছে রাণী ধরাসনে,
অবিলম্বে চল অম্বে, বিলম্ব সহে না আর ॥'

—কালীনাথ রায়: ক. বি. শা. প.—আগমনী

তখন উমা শিবের কাছে পিত্রালয়-যাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করলেন

'গঙ্গাধর হে শিব শঙ্কর, কর অনুমতি হর, যাইতে জনকভবনে!
ক্ষণে ক্ষণে মম মন হইতেছে উচাটন, ধারা বহে তিন নয়নে ॥
সুরাসুর নাগ নরে আমারে স্মরণ করে,
কত না দেখেছি স্বপনে—যোগনিদ্রা ঘোরে
বিশেষে জননী আসি, আমার শিয়রে বসি,
মা দুর্গা বলে ডাকে সঘনে ॥
মায়ের ছল ছল দুটি আঁখি, আমারে কোলেতে রাখি,
কত না চুম্বয়ে বদনে।
জাগিয়ে না দেখি মায়, মনোদুঃখ কব কায়,
বল প্রাণ ধরি কেমনে ॥
হউক নিশি অবসান, রাখ অবলার মান, নিবেদন করি চরণে।
কমলাকান্তেরে, দেহ নাথ, অনুচর—
বোলে যাই আসিব ত্রিদিনে।'

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য: ক. বি. শা. প.—আগমনী

কিন্তু 'আসিব ত্রিদিনে' এই অঙ্গীকারেও শিব উমার পিত্রালয়-যাত্রায় অনুমতি দিতে প্রথমে ইতস্ততঃ করেন। কারণ—

'বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণি,
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা মারে।
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি পরে।
সে কেন পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে ॥
রাখি অমরের মান হরের গরল পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে।

উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া,
সে অবধি শিব জায়া বিচ্ছেদ না করে ॥'

—কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য : ক. বি. শা. প.—আগমনী

উমাকে পিত্রালয়-যাত্রার অনুমতি লাভের জন্য শিবকে পুনরায় সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাতে হয় :

'ওহে হর গঙ্গাধর, কর অঙ্গীকার, যাই আমি জনক ভবনে।
কি ভাবিছ মনে মনে, ক্ষিতি নখ-লেখনে, হয় নয় প্রকাশ বদনে ॥
জনক আমার গিরিবর আসি উপনীত, আমারে লইতে আর তব দরশনে।
অনেক দিবস পর, যাইব জনকঘর, জননীরে দেখিব নয়নে ॥
দিবানিশি অবিরত জননী কান্দিছে কত হে! তৃষিত চাতকীর মত
রাণী চেয়ে পথ পানে।
না দেখে মায়ের মুখ, কি কব মনের দুখ, না কহিলে যাইব কেমনে ॥
নাথ, পূর মন আশ, না করহ উপহাস, বিদায় করহ হর, সরল বচনে হে।
কমলাকান্তেরে দেহ নাথ অনুচর, বলে যাই আসিব তিন দিনে হে ॥' —ঐ

তখন বাধ্য হয়েই শিবকে পিত্রালয়-যাত্রার অনুমতি দিতে হয়। কিন্তু কমলাকান্তকে অনুচর দেওয়া তাঁর পছন্দ হয় না, প্রিয়াবিরহকাতর নায়কের মতো পিত্রালয়-যাত্রায় প্রিয়াসঙ্গ কামনা করে তিনি বলেন :

'জনক ভবনে যাবে, ভাবনা কি তার।
আমি তব সঙ্গে যাব, কেন ভাব আর ॥
আহা আহা, মরি মরি, বদন বিরস করি,
প্রাণাধিকে প্রাণেশ্বরি, কেঁদোনাকো আর।
হৃদয়েশি, অহরহ আমার হৃদয়ে রহ,
নিদয়-হৃদয় কহ, কি দোষ আমার।
যখন যে অনুমতি কর তুমি ভগবতি,
কখনো কি করি আমি অন্যথা তাহার?
সকলি তোমারি ছায়া, তুমি নিজে মহামায়া,
তোমার বিচিত্র মায়া, বুঝে উঠা ভার।

মার মায়া প্রকাশিতে, জন্ম নিলে অবনীতে,
কে তোমার মাতা পিতে কন্যা তুমি কার।
ইচ্ছাময়ী নাম ধর, যাহা ইচ্ছা তাই কর,
তোমার মহিমা জানে, হেন সাধ্য কার।' —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শেষে শিবশক্তির অখণ্ড যামলতত্ত্বের প্রতি ইঙ্গিতগর্ভ উক্তি করে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন :

'প্রাণপ্রিয়ে যাবে যথা, সঙ্গে সঙ্গে যাব তথা,
ক্ষণমাত্র সঙ্গ ছাড়া হব না তোমার॥' —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

শিব ও শ্যামার চরণ

এই প্রিয়াবিচ্ছেদভীরু নায়ক শিবের চিত্রকেই কেন্দ্র করে ভক্তকবির শ্যামাচরণ লাভের আকুল আকূতি কখনো রসাল কৌতুকে কখনো তীব্র হতাশায় কখনো বা অকুণ্ঠ আত্ম-সমর্পণে শাক্ত পদাবলীতে আত্ম-প্রকাশ করেছে। তাই হরহৃদিপরে নৃত্যপরায়ণা শ্যামাকে লক্ষ্য করে সাধক কবি রামপ্রসাদ কৌতুকের সুরে বলছেন :

'বাজ্‌বে গো মহেশের হৃদে, আর নাচিস্‌নে ক্ষেপা মাগি।
মরে নাই শিব বেঁচে আছে, যোগে আছেন মহাযোগী॥
যে দেখি তোর চরণের জোর, নাচতে শিবের ভাঙ্গবে পাঁজর।
বিষখেকো শিব নয়গো সজোর, তোর লেগে ওর মন বিবাগী॥
খেয়ে গরল হয় নাই মরণ, শিব ছল করে মুদেছেন নয়ন।
ফাঁকির মরণ করছেন সাধন, ও চরণ তোর পাবার লাগি॥
ভাঙ্গ খেয়ে ভাঙ্গরের মতি, শিব হয়ে আছেন শবাকৃতি।
দীন রামপ্রসাদ কয় এই মিনতি, নেবে নাচ মা শিবসোহাগী॥'

—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত : সাধক কবি রামপ্রসাদ—পৃঃ ৩৩০

অন্যত্র— 'তোমার ধনের মধ্যে অন্তে পদ, সে ও শিবের সম্পদ পদ।
ভেবে শিব সে সম্পদ, নয়ন মুদে পড়ে আছে॥
খেয়ে ভোলা সিদ্ধিগোসা, নেশাতে ভোর হয়ে আছে।
ডাকলে সাড়া দেয় না তারা, ও সে ধনের ঘড়া ধরে আছে

কৌতুকে রামপ্রসাদ বলে, সে ধনের অংশ দিতে হবে বলে।
চায়না ভোলা চক্ষু মেলে, জেগে ঘুমায়েছে ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ৩০৯

আবার শ্যামার চরণতলে শবাকৃতি শিবকে অশক্ত কল্পনা করে কবি আক্ষেপ করেছেন :

'টেনে ফেল রম্ভাফল, গঙ্গাজল বিল্বদল,
শিব পুজার এই ফল, অশিব ঘটায় ॥
অশিব ঘটায়, এই দনুজ ভটায়, কি কুরব রটায়।
ভব দৈবরূপ শব, মুখে মাত্র নাহি রব, কার ভরসায় রব, হায়।'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৯৮

কখনো পদরত্নভাণ্ডার শিবের করায়ত্ত অনুভব করে দুঃখ-প্রকাশের মাধ্যমে শ্যামার কাছে অনুযোগ করেছেন :

'পদরত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি।
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাবদাতা, তবু জিম্মা রাখ তাঁরি ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গির মাগো, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা মাইনের চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৮৬

শেষে পাষাণহৃদয় কৃপণ হিমালয় ও স্বভাবদাতা আশুতোষ শিবের মধ্যে তুলনামূলক বিচারের সাহায্যে আপন পিতা শিবের দানশীলতার সূত্র ধরে শ্যামাচরণ লাভে আপন দাবিকে সজোরে ধ্বনিত করেছেন :

'যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে তো মা পেতে পারি ॥
প্রসাদ বলে এমন পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মতো পদ পাইতো, সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৮৬

কিন্তু কবি-চিত্তের সংশয়বৃন্তে শরণাগতির শতদল শেষ পর্য্যন্ত পরম রমণীয়তায় বিকশিত হয়ে উঠেছে :

'আমার অন্তরে আনন্দময়ী।
সদা করিতেছেন কেলি ॥
আমি যে ভাবে সেভাবে থাকি, নামটি কভু নাহি ভুলি।
আবার দু আঁখি মুদিলে দেখি, অন্তরেতে মুণ্ডমালী ॥
বিষয়বুদ্ধি হইল হত, আমায় পাগল বোল বলে সকলি।
আমায় যা বলে তাই বলুক তারা, অন্তে যেন পাই পাগলী ॥
শ্রীরামপ্রসাদে বলে, মা বিরাজে শতদলে।
আমি শরণ নিলাম চরণতলে, অন্তে না ফেলিও ঠেলি ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৮৬-২৮৭

এই শরণাগতির সামর্থ্যেই শ্যামাচরণ যে তাঁরই সম্পত্তি, সে সম্বন্ধে কবির দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় পদাবলীতে বলদৃপ্ত বাণীরূপ পরিগ্রহ করেছে :

'আমি কি আটাসে ছেলে।
ভয়ে ভুলব নাকো চোখ রাঙ্গালে ॥
সম্পদ আমার ও রাঙ্গাপদ, শিব ধরে যা হৃদ্‌কমলে।
ওমা আমার বিষয় চাইতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৮৮-২৮৯

শ্যামাচরণে স্বাধিকার সম্বন্ধে কবি একেবারে নিশ্চিন্ত, কারণ সেই অধিকার তো স্বয়ং শিবেরই দ্বারা স্বীকৃত :

'আমার সনদ দেখে যারে।
আমি কালীর সুত, যমের দূত, বল্‌গে যা তোর যম রাজারে ॥
সনদ দিলেন গণপতি, পার্ব্বতীর অনুমতি।
আমার হাজির জামিন ষড়ানন, সাক্ষী আছে নন্দীবরে ॥
সনদ আমার উরস পাটে, যেম্নি সনদ তেম্নি টাটে।
তাতে স্ব অক্ষরে দস্তখৎ, করেছেন যে দিগম্বরে ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৮৭-২৮৮

যেহেতু শ্যামাচরণে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠাপক শিব-স্বাক্ষরিত শ্যামাদত্ত দলিল কবির আয়ত্তে, সেহেতু শ্যামার দরবারে চরণকে কেন্দ্র করে শিবের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হতেও তাঁর কোন সঙ্কোচই নাই, ভক্তকবি এতই নিঃশঙ্ক :

'সনদ পেলাম মায়ের কাছে, এতে কি আর গলদ আছে।
প্রসাদ বলে ভয় দেখালে, যাব রে মায়ের দরবারে ॥':

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৮৮

যেহেতু—

'শিবের দলিল সই মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে।'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৮৯

অতএব—

'এবার করব নালিশ নাথের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৮৯

ফলে—

'জানাইব কেমন ছেলে, মোকদ্দমায় দাঁড়াইলে।
যখন গুরুদত্ত দস্তাবেজ, গুজরাইব মিছিল কালে ॥
মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে।
আমি ক্ষান্ত হব যখন আমায়, শান্ত করে লবে কোলে ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৮৯

মাতৃদত্ত অধিকারের সামর্থ্যে কবি শিবের সঙ্গে প্রত্যক্ষতঃ বোঝাপড়া করতেও পশ্চাৎপদ নন :

'এবার আমি বুঝব হরে।
মায়ের ধরব চরণ লব জোরে ॥
ভোলানাথের ভুল ধরেছি, বলব এবার যারে তারে।
সে যে পিতা হয়ে মায়ের চরণ, হৃদে ধরে কোন বিচারে ?
পিতা পুত্রে এক ক্ষেত্রে, দেখা মাত্রে বলবো তারে।
ভোলা মায়ের চরণ করে হরণ, মিছে মরণ দেখায় কারে ॥
মায়ের ধন সন্তানে পায়, সে ধন নিলে কোন বিচারে ?
ভোলা আপন ভালো চায় যদি সে, চরণ ছেড়ে দিক আমারে ॥
শিবের দোষ বলি যদি, বাজে আপন গার উপরে।
রামপ্রসাদ বলে ভয় করিনে, মায়ের অভয় চরণের জোরে ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৯৫

শ্যামাচরণ লাভই কৌলসিদ্ধি। তখন সাধক শক্তিলাভে আপ্তকাম, কৌলসিদ্ধি সিদ্ধ, শিবস্বরূপ। অমৃতত্বলাভে ধন্য হয়ে তখন তিনি মৃত্যুকে বলতে পারেন :

'ওরে শমন কি ভয় দেখাও মিছে।
তুমি যে পদে ওপদ পেয়েছো, সে মোরে অভয় দিয়েছে ॥
ইজারার পাট্টা পেয়ে, এত কি গৌরব বেড়েছে।
ওরে, স্বয়ং থাকতে, কুশের পুতুল কে কোথা দাহন করেছে ॥
হিসাব বাকী থাকে যদি, দিব নারে তোদের কাছে।
ওরে, রাজা থাকতে কোটালের দোহাই, কোন্ দেশেতে কে দেখেছে ॥
শিব রাজ্যে বসতি করি, শিব আমার পাট্টা দিয়েছে।
রামপ্রসাদ বলে সেই পাট্টাতে ব্রহ্মময়ী সাক্ষী আছে ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃ: ৩০২

তখন তিনি বিশ্বময়ী শক্তি ও বিশ্বোত্তীর্ণ শিব উভয়েরই স্বরূপ উপলব্ধির মাধ্যমে জগৎ-লীলারহস্য উদ্ভেদ করে বলতে পারেন :

'এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।
যার মায়ায় ত্রিভুবন বিহ্বলা ॥
সে যে আপনি ক্ষেপা, কর্ত্তা ক্ষেপা, ক্ষেপা দুটো চেলা ॥
কি রূপ কি গুণভঙ্গী, কি ভাব কিছুই না যায় বলা।
যার নাম করিয়ে কপাল পোড়ে, কণ্ঠে বিষের জ্বালা ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃ: ২৯৯

তখন তিনি সর্ব্বপাশবিমুক্ত সদানন্দ পুরুষ হয়ে বলতে পারেন :

'এ সংসারে ডরি কারে, রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর, খাস তালুকে বসত করি ॥
নাইকো জরীপ জমাবন্দী, তালুক হয়না লাট-বন্দি (মা)।
আমি ভেবে কিছু পাইনে সন্ধি. শিব হয়েছেন কর্ম্মচারী ॥
নাইকো কিছু অন্য লেঠা, দিতে হয় না মাথট বাটা (মা)।
জয় দুর্গার নামে জমা আটা, ঐটা করি মালগুজারি।

বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ, আছে এ মনের সাধ (মা)।
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি, ব্রহ্মময়ীর জমিদারি ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ২৯৯

তখন ষট্‌চক্র ভেদ করে কবি বলেন :

'শমন আসার পথ ঘুচেছে।
আমার মনের সন্ধ দূরে গেছে ॥
ওরে আমার ঘরের নবদ্বারে, চারি শিব চৌকি রয়েছে।
এক খুঁটিতে ঘর রয়েছে, তিন রজ্জুতে বাঁধা আছে ॥
সহস্র দলকমলে শ্রীনাথ অভয় দিয়ে বসে আছে।
দ্বারে আছে শক্তি বাঁধা, চৌকিদারী ভার লয়েছে ॥
সে শক্তির জোরে চেতন করে, তাইতে প্রাণ নির্ভয়ে আছে।
মূলাধারে স্বাধিষ্ঠানে কণ্ঠ মূলে ভুরু মাঝে ॥
এ চারি স্থানে চারি শিব, নবদ্বারে চৌকী আছে।
রামপ্রসাদ বলে এই ঘরে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় আছে ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ৩৫২

তখন যোগ-ভোগ করতলগত করে কবি শক্তি-মাহাত্ম্যের জয়গান করেন :

'গৃহে মুক্তি মূর্ত্তিমতী, রসনাগ্রে সরস্বতী।
শিব শিবা, রাত্রি দিবা, রক্ষা হেতু আছে ॥
যোগী ইচ্ছা করে যোগ, গৃহীর বাসনা ভোগ।
মার ইচ্ছা যোগ ভোগ, ভক্তজনে আছে ॥
আনন্দে প্রসাদ কয়, কালী কিঙ্করের জয়।
অণিমাদি আজ্ঞাকারী, পড়ে থাক পাছে ॥'

—সাধক কবি রামপ্রসাদ : পৃঃ ৩০৭

—— ——০——

গ্রন্থ-পঞ্জী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত (১ম ভাগ—৫ম ভাগ)	শ্রীম কথিত
উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (১ম ভাগ—৩য় ভাগ)	স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত
কুমারসম্ভব	কালিদাস
যুক্তিদীপিকা	পুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী
বৈষ্ণব পদাবলী	৺দীনেশ সেন এবং শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত (ক. বি. ১৯৪৩)
দীক্ষিতের নিত্যকর্ম্ম ও উপাসনা	শ্রীকেবলানন্দ ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত
Shakti and Shakta	Sir John Woodroffe
সাধনা	শ্রীশ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম প্রকাশিত
শ্রীশ্রীচণ্ডী	স্বামী জগদীশ্বরানন্দ সম্পাদিত
Tantrik Text (Vol. XXII) Sataratna Samgraha with Sataratnollekhani	Edited by Pandit Panchanan Sastri Tarka-Sankhya-Vedantatirtha
Tantrik Text (Vol. II) Third Edition Shatchakra nirupana and Padukapanchaka	Revised by Pandit Panchanan Bhattacharya Tarka-Sankhya-Vedantatirtha
তন্ত্রালোক (সমগ্র)	অভিনবগুপ্ত (কাশ্মীর সংস্কৃত-গ্রন্থাবলী)
তন্ত্রসার	শ্রীকৃষ্ণানন্দবাগীশ ভট্টাচার্য্য বিরচিত
রসসমীক্ষা	শ্রীরমারঞ্জন মুখোপাধ্যায়
শাক্তানন্দ তরঙ্গিণী	শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দগিরি সঙ্কলিত ও শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত
সাধক কমলাকান্ত	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
তারাপীঠ ভৈরব	শ্রীসুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
Buddhist Philosophy of Universal Flux	Dr Satkari Mookerjee, M. A, Ph. D.

শ্যামা-রহস্য … … শ্রীমৎ পূর্ণানন্দ পরমহংস বিরচিত ও কালীমোহন বিদ্যারত্ন সম্পাদিত

বেদান্তসার … … পণ্ডিত কালীবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত

The Philosophy of Srimat Bhagavata … Siddheswara Bhattacharya, M. A., Ph. D.

সাধক কবি রামপ্রসাদ … … শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

আনন্দ লহরী … … শ্রীপঞ্চানন শাস্ত্রী তর্কসাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত

পঞ্চোপাসনা … … শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম. এ., পি-এইচ. ডি., এফ. এ. এস্.

তত্ত্বকৌমুদী … … মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র প্রণীত ও শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত

মহানির্ব্বাণ-তন্ত্রম্ … … বসুমতী সাহিত্য মন্দির সংস্করণ

শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব ও সাধনরহস্য … স্বামী যোগানন্দ

স্তবকুসুমাঞ্জলি … … স্বামী গম্ভীরানন্দ

শ্রীমৎ ভগবৎ গীতা … … শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী সম্পাদিত

বাংলা কাব্যে শিব … … ডঃ গুরুদাস ভট্টাচার্য্য

শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্ … … পণ্ডিত দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ সম্পাদিত

ব্রহ্মসূত্র শাঙ্কর ভাষ্যম্ … … নির্ণয়সাগর সংস্করণ

Tantrik Text (Vols. XIX, XVIII, IX) … … Arthur Avalon

প্রপঞ্চসারতন্ত্রম্ ও কর্পূরাদিস্তোত্রম্

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ … … শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ অনূদিত

পাতঞ্জল দর্শনম্ … … জয়কৃষ্ণদাস হরিদাস গুপ্ত প্রকাশিত

তারা রহস্যম্ … … প্রবোধচন্দ্র পাল এণ্ড ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত

রামপ্রসাদী সঙ্গীত … … পশুপতি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত

সাংখ্য দর্শনম্ … … জয়কৃষ্ণদাস হরিদাস গুপ্ত প্রকাশিত

Tantras : Their Philosophy and Occult Secrets … D. N. Bose & Hiralal Haldar

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহ ... ... শ্রীবাসুদেব শাস্ত্রী অভ্যঙ্কর সম্পাদিত
বেদান্ত পরিভাষা ... ... পঞ্চানন শাস্ত্রী সম্পাদিত
ঈশ্বরপ্রত্যভিজ্ঞা ... ... উৎপল দেব (অভিনবগুপ্তের বিমর্শিনী টীকাসহ) কাশ্মীর সংস্কৃত গ্রন্থাবলী
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ... ... বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত
শাক্তপদাবলী ... ... অমরেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ) ক. বি. শা. প. বলে উল্লেখ করা হয়েছে
চণ্ডীমঙ্গল ... ... কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম
অন্নদামঙ্গল ... ... ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর
শিবসঙ্কীর্ত্তন ... ... রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য
দশমহাবিদ্যা ... ... হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
মেঘনাদবধ কাব্য ... ... মাইকেল মধুসূদন
বিসর্জ্জন ... ... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ত্রিযামা .. ... যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
Indian Philosophy ... Dr S. Radhakrishnan
ভাষাপরিচ্ছেদ ... ... বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য
মানমেয়োদয় ... ... নারায়ণাচার্য্য (Edition of C. Kunhan Raja & S. S. Suryanarayan Sastri)
বাক্যপদীয় ... ... নারায়ণচন্দ্র দত্তশর্ম্মা ত্রিপাঠি সম্পাদিত
নিত্যপূজাপদ্ধতি ... ... জগন্মোহন তর্কালঙ্কার
মহাভারত ... ... মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের সংস্করণ
শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ ... ... ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত
ভারতের শক্তিসাধনা ও শাক্তসাহিত্য ঐ
শাক্তপদাবলী ও শাক্তসাধনা ... জাহ্নবীকুমার চক্রবর্ত্তী
রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র ... ... ডঃ মদনমোহন গোস্বামী
বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস ... ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য্য
বামলীলা ... ... শাস্ত্রী শ্রীহরিচরণ গঙ্গোপাধ্যায়
